সিনেমাওয়ালা

সমরেশ মজুমদার



এই উপন্যাসের কাহিনী একটি সাধারণ মেয়েকে নিয়ে। দুর্ভাগ্যের তাড়নায় যাদের আমরা প্রায়শই দেখি বিপর্যস্ত হতে, তেমনই সাধারণ মেয়েদের একজন হল অদিতি। অদিতির জীবনে বৈচিত্র্য হল আকস্মিক এক যোগাযোগে অদিতির ভাগ্যের রুদ্ধদ্বার খুলে গেল সহসা। সরাসরি নায়িকা হয়ে চলে এল পাদপ্রদীপের সামনে। কিন্তু সেখানেই কি সাধারণ মেয়ের জীবনকাহিনী শেষ? না তা হয় না, সাধারণ মেয়ের জীবন তা হবার কথা নয়। এই উপন্যাসের কাহিনী অদিতির উচ্চাবচ জীবনের ক্রমাগত আনন্দ-দুঃখ, সম্পদ-বিপদের কাহিনী। আর অদিতির জীবনকাহিনীর সঙ্গে জড়িয়ে গেছে সিনেমা মহলের একান্ত অন্দরমহলের কথা, যা পাঠকদের কাছে এতাবৎকাল ছিল সম্পূর্ণ অজানা।

সিনেমাওয়ালা

সমরেশ মজুমদার



মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ, পৌষ ১৪০৬
কলিকাতা পুস্তকমেলা, ২০০০

—পঁয়ষট্টি টাকা—

প্রচ্ছদ ঃ অনুপ রায়
প্রচ্ছদের ছবি ঃ সৌমেন চট্টোপাধ্যায়
প্রচ্ছদমডেল ঃ অর্পিতা পাল

CINEMAWALLAH
A novel by Samaresh Mazumder. Published by Mitra & Ghosh Publishers Pvt. Ltd., 10 Shyama Charan Dey Street, Calcutta-700 073

Price Rs. 65/-

I S B N : 81-7293-608-7

শব্দগ্রন্থন
পাইকা ফটোসেটার্স
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০০০৭

মিত্র ও ঘোষ পাব্‌লিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ৭০০ ০৭৩ হইতে এস. এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও চয়নিকা প্রেস, ১নং রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০০৯ হইতে মুদ্রিত

উৎসর্গ

অদিতিদের

এই লেখকের দুটি নতুন উপন্যাস

জলছবির সিংহ

মেয়েরা যেমন হয়

আরও কয়েকটি বৃহৎ গ্রন্থ

উত্তরাধিকার

গর্ভধারিণী

কলিকাল

সর্বনাশের নেশায়

একশো পঞ্চাশ

সিনেমাওয়ালা

[এক]

চিত্রনাট্যটি পড়ে শোনাল মিলন। ওর সামনে টেবিলের উল্টোদিকে যে দু'জন মানুষ এতক্ষণ চোখ বন্ধ করে শুনছিলেন তাঁদের একজন বিখ্যাত প্রযোজক, প্রচুর হিট ছবি করছেন, অন্যজন পরিবেশক, সেই ছবিগুলোকে পশ্চিমবাংলার শহরে গ্রামে দেখাবার ব্যবস্থা করেন। প্রথম ছবি থেকে এঁরা জোট বেঁধেছেন এবং কখনই নতুন ছবি শুরু করার সময় আলাদা গল্প শোনেন না।

চিত্রনাট্য শেষ করে উদগ্রীব হয়ে তাকাল মিলন। এটি তার তৃতীয় ছবি হবে। প্রথম ছবি ভাল চলেছিল, দ্বিতীয়টি চলেনি। অতএব তৃতীয় ছবির ওপর তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এর মধ্যে বেশ কয়েকজন প্রযোজকের সঙ্গে সে যোগাযোগ করেছে, কিন্তু আগের ছবি ফ্লপ হওয়া পরিচালককে দিয়ে কাজ করাতে কেউ উৎসাহী হয়নি। শেষ পর্যন্ত এঁরা সময় দিয়েছেন তাকে, চিত্রনাট্য শুনলেন।

প্রযোজক মুখ ফিরিয়ে পরিবেশককে জিজ্ঞাসা করলেন, কেমন মনে হচ্ছে বল? তোমার মতামত আগে শুনি।

পরিবেশক নস্যির কৌটো বের করে বললেন, 'গল্পটায় টান আছে কিন্তু সেন্টু একটু কম। ওটা বাড়াতে হবে।'

পরিচালক মাথা নাড়লেন, 'ঠিক ঠিক।'

পরিবেশক বললেন, 'আরও গান দরকার। গোটা আটেক না হলে তো ক্যাসেট বের হবে না।'

মিলন না বলে পারল না, 'অত গান থাকলে ছবির গতি নষ্ট হবে না? দর্শক বিরক্ত হতে পারে।'

পরিবেশক হাসলেন, 'শাপমোচন দেখেছেন? উত্তমকুমারের গলায় কটা গান ছিল? কেউ বিরক্ত হয়েছে? ঝড় উঠেছে বাউল বাতাস, আহা এখনও সেসব গান পুরনো হয়নি।'

প্রযোজক বললেন, 'ঠিক ঠিক।'

পরিবেশক বললেন, 'নায়িকাপ্রধান গল্প। ঠিক আছে। কিন্তু ওর মামার বাড়ি কোন এক গ্রামে রাখুন সেই গ্রামে নায়িকা বেড়াতে যাবে।'

'গ্রামে?' চমকে উঠল মিলন। তার গল্পে গ্রামের কোন দৃশ্য নেই।

'মিনিট দশেক। ছবি তো শহরের লোক দেখলে হিট করে না, করে গ্রামের মানুষ দেখলে। তাই গ্রামের দৃশ্য থাকলে তাদের ভাল লাগবে। পুকুরে স্নান করাতে পারেন নায়িকাকে, একটু সেক্সও হল।' পরিবেশক কথাটা বলে চোখ টিপলেন প্রযোজককে।

প্রযোজক সঙ্গে সঙ্গে হা হা করে হেসে উঠলেন, 'আরে ওতে হয় না। আজকাল

হিন্দি ছবিতে ঠোঁটে ঠোঁট লাগিয়ে চুমু খাচ্ছে। ডলাই-মালাই তো আকছার। কিন্তু বাংলা ছবিতে অতটা করা যাবে না। ঘরের ছবিতে অত বাড়াবাড়ি পাবলিক পছন্দ করবে না। তা মিলনবাবু, এসব পরিবর্তন করতে কত দিন লাগবে?'

কোটি টাকার প্রশ্ন।

মিলন চোখ বন্ধ করল। এদের আপাতত তিনটি প্রস্তাব। কাহিনী আরও সেন্টিমেন্টাল করতে হবে, আটখানা গান রাখতে হবে আর গ্রামের দৃশ্য চাই যেখানে নায়িকা পুকুরে স্নান করবে। এই তিনটি প্রস্তাব মেনে নেওয়া মানে গল্পের চেহারা বদলে ফেলা। এই সমঝোতা না করলে এঁরা টাকা ঢালবেন না। তার পক্ষে ছবি করা হবে না। কষ্ট হচ্ছিল মিলনের। তবু বলতে হল, 'মাসখানেক।'

প্রযোজক বললেন, 'গুড, সেটা করলে আমরা আপনাকে দিয়ে ছবি করাবো। কিন্তু এখন একটা প্রশ্ন, নায়িকা কে হচ্ছেন?'

পরিবেশক বললেন, 'নায়িকা-নির্ভর গল্প, কাস্টিংটা খুব জরুরী।'

মিলন এক নায়িকার নাম করল। ইনি ভাল অভিনেত্রী এবং দর্শকরা খুব পছন্দ করেন।

প্রযোজক মাথা নাড়লেন, 'না। ওকে দিয়ে চলবে না।'

মিলন বোঝাবার চেষ্টা করল, 'কিন্তু ও ভাল অভিনেত্রী।'

'সেটা আপনার চেয়ে আমি কম জানি না মিলনবাবু, আমার তিন নম্বর ছবিতে ওকে নিয়েছিলাম। কিন্তু চার নম্বর ছবির সময় ও আমাকে খুব অপমান করেছে। বুঝতেই পারছেন কেন নিচ্ছি না।' প্রযোজক বললেন।

নস্যির টিপটা তখনও দুই আঙুলে চেপে রেখেছিলেন পরিবেশক। বললেন, 'এখানকার কাউকে চলবে না। বাংলাদেশ থেকে আনা উচিত।'

প্রযোজক বললেন, 'সেখান থেকে আনা ঝামেলার ব্যাপার না?'

'একটু আছে। ম্যানেজ হয়ে যাবে। ফ্রেশ মুখ দেখতে পাবে দর্শকরা। লক্ষ্য করে দেখছি আমাদের গ্রামেগঞ্জে বাংলাদেশের নায়িকাদের বেশ চাহিদা আছে। ভিডিও রাইট বিক্রি করতে সুবিধে হবে।' পরিবেশক বললেন।

মিলন আপত্তি করল, 'শুনেছি ওঁরা ওখানে ছবির জন্যে প্রচুর টাকা নেন। আমাদের গোটা ছবির বাজেট তিরিশ লাখ আর ওঁদের বাজেট প্রায় এক কোটি। ওখান থেকে নায়িকাকে নিলে আমাদের বাজেট বেশী হবে না?'

পরিবেশক হাসলেন, 'মিলনবাবু দেখছি কোন খবরই রাখেন না। এখন কলকাতার পঞ্চাশভাগ ছবিতে দেখবেন বাংলাদেশের নায়ক-নায়িকা, পরিচালক, সুরকারের নাম। কলকাতায় এসে ছবি করতে এঁরা ভালবাসেন, টাকা নিয়ে বেশী মাথা ঘামান না।'

প্রযোজক বললেন, 'আসলে আমরা চেঞ্জ চাই, ফ্রেশ মুখ।'

'ফ্রেশ মুখ?' মিলন বিড়বিড় করল।

'হ্যাঁ ভাই, পুরনোদের নিয়ে আর চলবে না। আপনি যদি নতুন ভাল অভিনেত্রী

জোগাড় করতে পারেন তাহলে আমার আপত্তি নেই।'

প্রযোজকের কথা শুনে পরিবেশক বললেন, 'একটু ঝুঁকি থেকে যাবে কিন্তু আইডিয়াটা খারাপ নয়। তবে পাবেন না। এতবড় রোল নতুন মেয়ের পক্ষে করা সম্ভব নয়।'

মিলন বলল, 'আপনারা তো আমাকে এক মাস সময় দিয়েছেন। তার মধ্যে খোঁজার চেষ্টা করব। আমি আশাবাদী।'

পরিবেশক বললেন, 'কিভাবে খুঁজবেন? কাগজে বিজ্ঞাপন দেবেন?'

প্রযোজক বললেন, 'ওরে বাবা, খবরদার ও কাজ করবেন না। হাজার হাজার মেয়ে এসে হাজির হবে। খেঁদি বুঁচি আর কালীরা এসে চাইবে নায়িকা হতে। পাগল করে ছাড়বে।'

মিলন বলল, 'আমি দেখছি।'

স্টুডিওতে মিলনের একটা অফিস আছে। ছোট্ট ঘর। চারটে চেয়ার আর একটা টেবিল। বিকেলে সেখানে যেতেই দেখল সহকারী পরিচালক সামন্ত জমিয়ে আড্ডা মারছে। তাকে ঢুকতে দেখে সামন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি খবর দাদা?' চেয়ার ছেড়ে দিল সে।

নিজের চেয়ারে বসে মিলন বলল, 'ছবি হচ্ছে। কিন্তু নতুন নায়িকা চাই। না হলে বাংলাদেশ থেকে নায়িকা আসবে। আর তিনি এলে কি হবে বুঝতে পারছ সামন্ত?'

'পারছি না? প্রথমে উচ্চারণ ঠিক করতে হবে। ওখানে প্রম্প্ট শুনে সবাই অভিনয় করে, এখানে মুখস্থ করাতে হবে।'

'এসব কোন সমস্যা নয়। বাজেট বেড়ে যাবে। আর সেটা সামলাতে অন্য খরচ কমাতে চাইবে প্রডিউসার। আমাদের বারোটা বেজে যাবে।'

'হ্যাঁ। এটা ঠিক। তাহলে?' সামন্তর মুখ গম্ভীর।

'একটাই রাস্তা, নতুন নায়িকা খুঁজে বের করতে হবে।'

'আপনি সুবর্ণার চরিত্রে নতুন নায়িকা নেবেন?' সামন্ত অবাক।

'এছাড়া উপায় নেই। কলকাতার কাউকে প্রোডিউসার চাইছেন না।'

ঘরে আর যারা ছিল তারা চুপচাপ শুনছিল। এরা ফিল্মের লোক। বিভিন্ন প্রোডাকশনে কাজ করে। একজন বলল, 'তনুদা একটি নতুন মেয়ে পেয়েছেন। খুব সুন্দরী। দেখতে পারেন দাদা।'

সামন্ত বলল, 'অসম্ভব। তনুদা প্রথম নিজের ছবিতে ওকে নামাবেন। তারপর ভাল করলে সে অন্য ছবিতে কাজ করতে পারবে। আচ্ছা, এক কাজ কর। ফটোগ্রাফার তারাদাসকে ডাকো তো।'

একজন ছুটে গেল তারাদাসকে ডাকতে। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'তারাদাস কি করবে সামন্ত?'

‘ওর কাছে প্রচুর স্টক আছে।’

‘থাকলে তারা এতদিন নিশ্চয়ই বসে থাকত না।’

‘বলা যায় না দাদা। অন্যদের হয়তো চোখে পড়েনি।’

তারাদাস এল। সঙ্গে ঢাউস ব্যাগ। সামন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘এই যে, নতুন মেয়ে চাই। ভাল কেউ আছে?’

‘কি রকম বয়স?’ মিলনের দিকে তাকাল তারাদাস।

সামন্তই জবাব দিল, ‘কুড়ি বাইশ।’

‘হবে।’

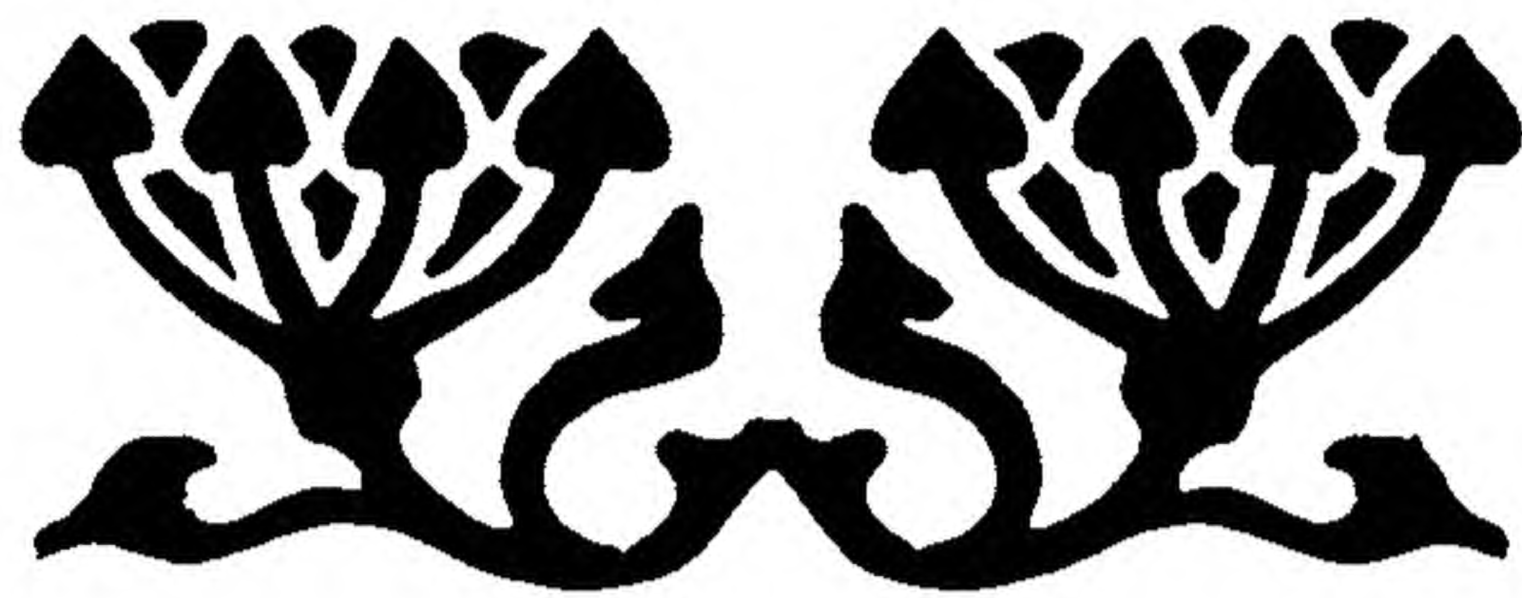
ব্যাগ খুলে দুটো অ্যালবাম বের করে এগিয়ে দিল তারাদাস। সামন্ত তাকে পাতা খুলে খুলে দেখাতে লাগল। অল্পবয়সী মেয়েদের নানান কায়দার ছবি। দ্বিতীয় অ্যালবামের একটি ছবি দেখে সামন্ত লাফিয়ে উঠল, ‘বাঃ। গুড। দাদা, একে দিয়ে হবে না?’

মিলন বলল, ‘দেখতে তো ভালই। অভিনয় করেছে এর আগে?’

তারাদাস বলল, ‘না একদম ফ্রেশ। পাঁচ ফুট চার ইঞ্চি লম্বা, পঁয়ত্রিশ, পঁচিশ, পঁয়ত্রিশ শরীরের সাইজ। ওর বিকিনি পরা ছবি আমার কাছে আছে। দেখবেন?’

মিলন হাত নাড়ল, ‘দরকার নেই। ওকে সামনাসামনি দেখতে চাই। আর এই রকম চেহারার আরও কয়েকজনকে যদি পাও তাহলে কাল বিকেলে নিয়ে এসো।’

তারাদাস বলল, ‘কোন চিন্তা নেই দাদা, কাল বিকেলে এখানে আপনি তিন-তিনজন ডানাকাটা সুন্দরীকে দেখতে পাবেন।’



[দুই]

তারাদাস তিনটে সুন্দরী মেয়েকে পাঠাতে পারেনি। তার বদলে তারাদাসের কাছ থেকে একটা অ্যালবাম নিয়ে এসেছিল সামন্ত। মিলনের মেজাজ ভাল ছিল না। একেই নায়িকা না পেলে ছবি না হওয়ার সমস্যা, তার ওপর আরও পাঁচটা ফালতু ঝামেলা সব সময় তাকে জড়িয়ে থাকে। টালিগঞ্জে যে ডিরেক্টরের হাতে ছবি নেই তার দিকে অন্য সবাই বাঁকা চোখে তাকায়। ছবি থাকা মানে প্রযোজক থাকা, আর তিনি থাকলেই টাকার যোগান অব্যাহত থাকবে। ইউনিটের সবাই নিশ্চিন্ত। কিছু পরিচালক তাই নয় মাসেও ছবি শেষ করতে চান না। উল্টে গোপনে স্টার অভিনেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে বলে আসেন, আমি যখন প্রযোজককে নিয়ে আসব তখন ডেট দেবেন না। দিলেও কম কম করে দেবেন। আবার কিছু পরিচালক আছেন যাঁরা শুধু মহরৎ করে থাকেন। বর্ধমান বীরভূমের কোন সম্পন্ন মানুষকে যোগাড় করে মহরতের দিন ঘোষণা করে দেন। তাঁকে বোঝান, অন্য সবাই যদি পঁচিশ লাখ টাকায় ছবি করার কথা বলে আমি আপনাকে মাত্র তিন লাখ টাকায় করে দেব। কি করে দেব? বোম্বে থেকে স্টার এনে এমন মহরৎ করব যে পরিবেশকরা ছুটে আসবে টাকার বান্ডিল নিয়ে। আপনাকে তিন লাখের বেশি খরচ করতে হবে না। প্রযোজক বুকে আনন্দ চেপে জানতে চান, 'তিন লাখ কেন?'

'বাঃ! স্টুডিও বুক করতে হবে না? ক্যামেরা আছে, ফিল্ম আছে, একদিনের টেকনিশিয়ান পেমেন্ট আছে, এক রাতের ফাইভ স্টার থ্রি স্টার হোটেলের বিল আছে, পাবলিসিটির খরচ আছে। তার ওপর বোম্বে থেকে স্টারের যাওয়া-আসার প্লেনের টিকিটটা যোগ করুন। আমি তো অনেক কমে ম্যানেজ করব।' পরিচালক মনোহরণ হাসি হাসলেন।

'তা তো হল, কিন্তু দু'রকম হোটেল কেন? বোম্বের স্টার তো একজনই আসবে।'

'তিনি তো ফাইভ স্টারে থাকবেন, থ্রি স্টার আপনার জন্যে।'

'আমার জন্যে?' কোনকালে স্টার হোটেলে না থাকা প্রযোজক ঘাবড়ে গেলেন।

'বাঃ। দু-একজন সিলেকটেড মহিলা আর্টিস্ট আপনার সঙ্গে একটু নিভৃতে কথা বলতে চাইলে থ্রি স্টারের নিচে যাবে কেন বলুন!'

'আমার সঙ্গে কথা?'

'বাঃ। আপনি একটু বাজিয়ে দেখবেন না? যে মেয়েকে চান্স দিচ্ছেন তাকে পাবলিক অ্যাকসেপ্ট করবে কিনা তা নিজে দেখবেন না? এটা আপনার একার ওপর ছেড়ে দিচ্ছি। তখন আমরা কেউ থাকব না।'

পরিচালকদের প্রস্তাব শুনে প্রযোজক লজ্জায় আনন্দে নুইয়ে পড়ে বললেন,

'ঠিক আছে, ঠিক আছে।'

মিলন এই শ্রেণীর পরিচালক নয়। তার শিক্ষা, রুচি, ভদ্রতাবোধ তাকে কিছুতেই এত নিচে নামতে দেয়নি। ভাল চাকরি ছেড়ে শিল্প করবে বলে সে সিনেমা লাইনে এসেছিল। সে বিবাহিত, যদিও সন্তান নেই। কিন্তু সংসার আছে। সেই সংসার চালাবার দায়িত্ব তার একার। মহরতের নামে টাকা কামানো বা ছবি ঝুলিয়ে রেখে দুধ দোয়ার মত প্রযোজকের কাছ থেকে টাকা নেওয়া তার পক্ষে সম্ভব নয়। অতএব কাজ না থাকলে সংসার অচল হতে বাধ্য। যা জমানো ছিল তাতে বড়জোর দিন কুড়ি চলবে। এই অবস্থায় কাল বাড়ি গিয়ে সে বেদম রেগে গিয়েছিল।

রাত দশটায় বাড়ি ফিরে টেবিলের ওপর একটা দামী আফটার সেভের নতুন শিশি আবিষ্কার করেছিল সে। বাজারে অন্তত আড়াইশো টাকা দাম। স্ত্রী মন্দিরা এগিয়ে এসে বলল, 'ওটা আমি রাখতে বাধ্য হলাম।'

'রাখতে বাধ্য হলাম মানে?'

'মেয়েটা এমন করে ধরল যে না বলতে পারলাম না।'

'কোন্ মেয়ে? কি করে ধরল?'

'আরে, বাড়ি বাড়ি ঘুরে যেসব মেয়ে জিনিসপত্র বিক্রি করে তাদের একজন এসেছিল। জানো, মেয়েটা দেখতে আদৌ সেল্স-গার্লদের মত নয়। বলল, ভাল বাড়ির মেয়ে, অবস্থার চাপে সদ্য এই চাকরিতে ঢুকেছে। আমি যদি একটা জিনিস না রাখি তাহলে ও খুব বিপদে পড়বে। তা ওর কাছে নানান রকমের পারফিউম ছিল। সেগুলো না রেখে এটা নিয়ে ভাবলাম তোমার আফটার শেভ তো কবে শেষ হয়ে গিয়েছে, দাড়ি কামাবার পর গালে মাখতে তোমার খুব ভাল লাগবে।'

'ছাই লাগবে। আমার মাথা লাগবে! তোমার বাস্তব জ্ঞান কবে হবে বলতে পার? হাতে কাজ নেই, টাকা-পয়সা শেষ হয়ে এসেছে, এখন হুট্ করে তুমি আড়াইশো টাকার আফটার শেভ কিনলে। দাম দিলে কি করে?'

'দিইনি। কাল আসবে বলেছে।'

'দয়া করে এটা ফেরত দিয়ে দিও।'

'নিয়ে ফেরত দেব?'

'হ্যাঁ, দেবে। আমার নাম করে দেবে। আড়াইশো টাকায় কদিনের বাজার হবে তা তুমি জানো না?'

'যদি ফেরত না নেয়?'

'তাহলে কাল বিকেলে আসতে বলবে। আমি তাড়াতাড়ি ফিরব। আমি দেখব কেমন করে ফেরত না নেয়। এ এক অদ্ভুত জ্বালা শুরু হয়েছে।'

•

সামন্ত অ্যালবামটা এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দাদা, প্রযোজক ফোন করেছিলেন।'

'কি বললেন?'

'আগামী মাসেই ছবি শুরু করতে চান। তার মধ্যেই নায়িকা চাই।'

'নায়িকা কি আমার হাতের মোয়া চাইলেই হাজির করব!' অ্যালবাম টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে লাগল মিলন। অদ্ভুত সব ঢঙ-এ দাঁড়িয়ে ছবি তুলিয়েছে বিভিন্ন বয়সের মেয়েরা। মাথার পেছনে চুলের সীমান্তে আলো চিক চিক করছে। সে খিঁচিয়ে উঠল, 'এসব ছবি তারাদাসের তোলা?'

'তাই তো মনে হয়।'

'অসম্ভব। এর বেশিরভাগ মিশির স্টুডিওতে তোলা। খেঁদি পেঁচিকেও ওরা ছবিতে উর্বশী বানিয়ে দেয়। এর একটাকেও আমি নায়িকা বলে ভাবছি না।'

'তাহলে?'

'আমাকে একটু একা থাকতে দাও।'

সামন্ত বেরিয়ে গেল অ্যালবাম নিয়ে। মিলন মাথায় হাত দিল। বম্বে সিরিয়ালে যখন শ'য়ে শ'য়ে নতুন সুন্দরী অভিনেত্রীদের মিছিল তখন টালিগঞ্জে মরুভূমির অবস্থা কেন? কেন এখানে এখনও প্রায় প্রৌঢ়া নায়িকা নিয়ে কাজ করতে হয়? দু'তিনজন অল্পবয়সী মেয়ে, দেখতে সাধারণ হলেও প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসে থিতিয়ে গেল?

সামন্ত ফিরে এল, 'দাদা!' এক ভদ্রমহিলা তার মেয়েকে নিয়ে এসেছেন। দেখা করতে চান।'

মিলন তাকিয়ে থাকল।

সামন্ত বলল, 'মেয়েটা শুনছি অন্য ছবিতেও কাজ পাচ্ছে। দেখবেন?'

'পাঠিয়ে দাও।'

একটি পনের-ষোল বছরের মেয়েকে নিয়ে যিনি ঢুকলেন তিনি নিজেকে খুব সাজিয়েছেন। স্লিভলেস জামা, লো-কাট ব্লাউজ, মুখে গদগদ হাসি। সঙ্গের মেয়েটির পরনে টাইট গেঞ্জি এবং মিনি স্কার্ট। স্কার্টের নিচে দোকানে ঝোলানো খাসির রাঙ্-এর মত উরু দেখা যাচ্ছে।

'বসুন।'

ওরা বসলেন। মহিলা বললেন, 'আপনার নাম এত শুনেছি যে আলাপ করার খুব ইচ্ছে ছিল। আপনি ছবি শুরু করছেন দাদা?'

মিলন মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'এ আমার মেয়ে। ফিল্মের নাম সঞ্জিতা। কি বলব দাদা, জন্ম থেকেই ওর অভিনয়ের ওপর ঝোঁক। নিজের মেয়ে বলে বলছি না, এত স্মার্ট যে আপনাকে কি বলব।' মায়ের প্রশংসায় মেয়ে হাসল।

মিলন মেয়েটির দিকে তাকিয়েই চোখ সরিয়ে নিল। এত উদ্ধত বুকের দিকে তাকানো যায় না।

মহিলা বললেন, 'ক্যামেরায় ওর ছবি দারুণ আসে। আপনাকে দেখাবো বলে আমি দুই ধরনের ছবি এনেছি।' একটা খাম এগিয়ে দিলেন তিনি।

চারটে ছবি। কোনটা বধূ বেশে, কোনটা শার্টপ্যান্ট পরা, কোনটা স্কার্ট। একটি

ছবি শুধু মুখের। মিলনের মনে হচ্ছিল অল্পবয়সী কিশোরীকে জোর করে বড় করার চেষ্টা হয়েছে।

সে বলল, 'সবই ঠিক। কিন্তু ওর বয়স বড় কম।'

'এমন কি কম? ওর বয়সে আগে সবাই মা হয়ে যেত। আমার তো পনের বছর বয়সে বিয়ে হয়েছিল, ষোলয় ও এল।' মহিলা হাসলেন, 'একথা আপনি বলতে পারেন ভেবে ওর কয়েকটা এক্সক্লুসিভ ছবি এনেছি।' মহিলা দ্বিতীয় খামটা বাড়িয়ে দিলেন।

প্রথম ছবি দেখে মাথা ঝাঁ ঝাঁ করতে লাগল মিলনের। বালির ওপর বিকিনি পরে শুয়ে আছে পনের বছরের কিশোরী। উদ্ধত বুক, মুখে হাসি। দ্বিতীয় ছবিটায় গায়ে কোন সুতো নেই, দুটো হাত বুকের ওপর জড়ো করে আড়াল তৈরি, মুখে লজ্জা লজ্জা ভাব।

ছবিগুলো ফেরত দিয়ে অবাক মিলন বলল, 'এসব ছবি তুলিয়েছেন?'

'জানেনই তো দাদা, এ লাইনে সবাই বাজিয়ে দেখে নিতে চায়। সামনাসামনি দেখার চেয়ে ছবিতে দেখুক। তা যাই বলুন, মেয়ে আমার অ্যাডাল্ট হয়ে গিয়েছে। আপনি চান্স দিয়ে দেখুন, আমি তো আছি।' হাসলেন মহিলা।

'আপনি তো আছেন মানে?'

জবাব না দিয়ে চোখের কোণে হেসে ঠোঁট মোচড়ালেন মহিলা। মিলনের ইচ্ছে হচ্ছিল জিজ্ঞাসা করতে, আপনি কি সত্যি সত্যি ওর মা? ওর এখন কলেজে পড়া উচিত আর উনি ওকে নিয়ে বেরিয়েছেন ব্যবসা করতে। মহিলারা চলে গেলেন।

হঠাৎ সোজা হয়ে বসল মিলন। কলেজ। মেয়েদের কলেজে কলেজে ঘুরলে কেমন হয়? উড়াইয়া দ্যাখো ছাই পাইলেও পাইতে পার অমূল্য রতন।

মিলন চিৎকার করল, 'সামন্ত, কুইক!'



[তিন]

সামন্তকে নিয়ে মিলন তার অফিস ঘর থেকে বের হতেই আলিকে দেখতে পেল। আলি এক সময় তার সহকারী ক্যামেরাম্যান হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। ফিল্মে সুবিধে হবে না বুঝতে পেরে ভিডিওতে চলে গেছে। দূরদর্শনের বাংলা সিরিয়ালের ব্যস্ত ক্যামেরাম্যান এখন, ভাল রোজগার করে।

কপালে হাত ঠেকাল আলি, 'নমস্কার দাদা। কেমন আছেন?'

'আর আছি! তোমার খবর কি?' মিলন হাসল।

'ভাল। আজ আমার ডিরেক্টার অসুস্থ হয়ে পড়ায় হাফ শিফটেই প্যাকআপ হয়ে গেল। ক্যামেরা ফেরত দিতে যাচ্ছি।' আলি বলল।

'তুমি কেন? ওদের কেয়ার-টেকার নেই?'

'আছে। কিন্তু বেকার হয়ে আছি আজ তাই যাচ্ছি।' আলি বলল, 'ওরা অবশ্য ফুল শিফটের চার্জ করবে। এখনও ঘণ্টা তিনেক বাকি। বলুন, আপনার যদি ছবি তোলার কিছু থাকে তুলে দিচ্ছি।'

ফিল্মের ক্যামেরা আর ভিডিওর ক্যামেরা আলাদা। ভিডিওতে যে ছবি ওঠে তা ফিল্মে দেখানো যায় না। কিন্তু হঠাৎ মিলনের মাথায় একটা আইডিয়া এল। কিন্তু সেটা বলতে সঙ্কোচ হচ্ছিল তার।

সামন্ত বলল, 'দাদা এখন মেয়েদের কলেজে যাচ্ছেন, যদি নতুন কোন মুখ পাওয়া যায় তার খোঁজে। তুমিও চল না, ভিডিওতে ছবি তুলে নেবে।'

মিলন বলল, 'হলে ভাল হত কিন্তু ওকে খাটিয়ে কোন লাভ নেই। এর জন্যে তো কোন পয়সা দিতে পারব না।'

আলি হাত নাড়ল, 'আরে দূর! আমার তো এখন কোন কাজ নেই। তাছাড়া এক্সট্রা ক্যাসেটও সঙ্গে আছে। ক্যামেরার গাড়িতে উঠে পড়ুন।'

অতএব, দ্বিধা কাটিয়ে মিলন সামন্তকে নিয়ে আলির সঙ্গে ক্যামেরার গাড়িতে উঠল।

আলি জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ কলেজ দাদা?'

মিলন বলল, 'পাক-সার্কাসে চল। ব্রেবোর্ন কলেজটাই নিরিবিলিতে।'

কলেজের গেটের পাশে গাড়ি থামল। সামন্ত ছুটে গিয়ে দারোয়ানকে জিজ্ঞাসা করে জেনে এসে বলল, 'ছুটি হতে আর মিনিট পাঁচেক বাকি।'

মিলন বলল, 'গুড। তুমি গাড়িতে বসেই জানলা দিয়ে ক্যামেরা অন করো। মেয়েরা যখন বের হবে তখন ছবি তুলতে থেকো।'

'এই অ্যাঙ্গেলে ছবি ভাল আসবে না দাদা। আমি ক্যামেরা নিয়ে সোজা গেটের

সামনে দাঁড়াচ্ছি। সামন্তদা, কেউ আপত্তি করলে বলবে আমরা নিউজরীলের জন্যে ছবি তুলছি।'

মিনিট ছয়েক পরে মেয়েরা বেরুতে লাগল। আলি এবং সামন্ত তখন গেটের সামনে দাঁড়িয়ে ছবি তুলছে। গাড়ির দরজায় হেলান দিয়ে মিলন উন্মুখ হয়ে মেয়েদের মুখ দেখছিল। একটু ফর্সা যে তার নাক বোঁচা। নাক যার টিকালো তার চোখ ছোট। কিন্তু এই মেয়েগুলোর বেশিরভাগই লিকলিকে। যেন সদ্য ফ্রক ছেড়ে শাড়ি পড়েছে। হ্যাঙারে ঝোলানো শাড়ি বলা যেতে পারে। এখন শরীর তার পূর্ণতা পায়নি।

হঠাৎ একটা চেঁচামেচি হতেই মিলন মুখ ফেরাল। আলির সামনে দাঁড়িয়ে একজন মহিলা চিৎকার করছেন, 'কার পারমিশন নিয়ে ছবি তুলছেন আপনারা? অধ্যক্ষা আপনাদের অনুমতি দিয়েছেন? মেয়েদের কলেজে ঢুকে যা ইচ্ছে করবেন? কোন ভদ্রতাবোধ নেই আপনাদের?

সামন্ত বলল, 'দিদি, এটা নিউজরীলের জন্যে তোলা হচ্ছে।'

'আমি কোন কথা শুনতে রাজি নই। চলুন আপনারা অধ্যক্ষার কাছে। আপনাদের আমি পুলিশে দেব।' মহিলা আরও গলা তুললেন।

সেই সময়ে নজরে এল মিলনের। মহিলার একটু বাঁ দিকে কৌতূহলী চোখে দাঁড়িয়ে যে মেয়েটি দেখছে তাকে অবশ্যই নায়িকা করা চলে। লম্বায় আর একটু ভাল হলে মন্দ হত না। আলি ওর ছবি তুলছে না কেন? মিলন চিৎকার করল, 'আলি তোমার ডানদিকে ক্যামেরা ঘোরাও। ডান দিকে।'

বাকি মেয়েরা ভিড় করে ওদের ঘিরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। মিলনের চিৎকার শুনে অবাক হয়ে তার দিকে তাকাল। এই সময় দারোয়ানরা ছুটে আসছিল গেটের দিকে। তাই দেখে আলি এবং সামন্ত দৌড়াল। মেয়েরা হৈ চৈ করে উঠতেই মিলন গাড়িতে উঠে বসল। আলি এবং সামন্ত সঙ্গে ভিড় নিয়ে গাড়ির ভেতর শরীর গলিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ড্রাইভার গাড়ি চালাল। তীব্র হর্ন দিতে দিতে মেয়েদের ভিড় কাটিয়ে কোনমতে কলেজের সামনে থেকে চলে আসতে পারল।

বিপদ কেটে গেছে বুঝতে পেরে সামন্ত বলল, 'খুব জোর বেঁচে গেছি। আর একটু হলে আড়ং ধোলাই হত আজ।'

আলি বলল, 'আমাদের উচিত ছিল আগে গিয়ে অনুমতি নেওয়া। যাকগে, দাদা, প্রচুর মেয়ের মুখ দেখতে পাবেন ক্যাসেটে। অনেক ছবি তুলেছি আমি। লাইটটাও ভাল ছিল। বুঝলেন?'

'তুমি কি চোখে কম দ্যাখো আলি?' মিলন নিঃশ্বাস ফেলল।

'কেন? আমার তো চোখে কোন ট্রাবল নেই।'

'আছে। চোখে কম দ্যাখো, কানেও কম শোনো। তোমাকে যে মহিলা ধমকাচ্ছিলেন তার বাঁ দিকে যে মেয়েটা দাঁড়িয়েছিল তার ছবি তুলেছ? আমি চিৎকার করে তোমাকে তার ছবি তুলতে বলছিলাম।'

'ও! আমি শুনলাম আপনি চলে আসতে বলছেন।'

'চমৎকার!'

'কিন্তু বাদ দিইনি। মহিলার বাঁ-ডান সব দিকের ছবি তুলেছি। আপনি এখনই স্টুডিওতে চলুন, দেখিয়ে দিচ্ছি।' আলি আত্মবিশ্বাসী।

স্টুডিও ছাড়া এই ক্যামেরার ক্যাসেটের ছবি দেখা যাবে না। ওরা গাড়ি ঘুরিয়ে স্টুডিওতে গেল। এটা এডিট করার স্টুডিও। সেখানে দেখা গেল আলির বেশ খাতির। একটা ঠাণ্ডা ঘরে ঢুকে আলি মনিটরে ছবি দেখার ব্যবস্থা করল। পর্দায় ব্রেবোর্ন কলেজের গেট। মেয়েরা বেরিয়ে আসছে। সাধারণ চেহারার মেয়ে সব। হাসিখুশী। এরা বাড়ির মেয়ে কিন্তু সিনেমার নায়িকা নয়। এই বয়সে যদিও ওই গ্লামার থাকার কথা নয়, তবু তার ধারে কাছেও এরা নয় এবং সে চেষ্টাও ওরা করেনি। প্রায় শ'খানেক মেয়ে বেরিয়ে যাওয়ার পর ক্যামেরার সামনে সেই মহিলা এলেন। মহিলা চিৎকার করে যাচ্ছেন। মুখ লাল। দজ্জাল শাশুড়ির ভূমিকায় ভাল মানাবে এঁকে। কিন্তু ভদ্রমহিলার ডান দিকের মেয়েদের দেখা গেল পর্দায় কিন্তু ক্যামেরা বাঁ দিকের মেয়েদের ছবি তোলেনি।

খুব হতাশ হল মিলন। তাকে সান্ত্বনা দিতে আলি বলল, 'ছবি দেখে যদি পছন্দ হত তাহলে যে ওকে নায়িকা করতে পারতেন তার তো কোন নিশ্চয়তা নেই। হয়তো মেয়েটার বাড়ি খুব কনজারভেটিভ, সিনেমায় নামতে দিত না।'

মিলন মনে মনে বলল, 'আঙুর ফলকে সবাই টক বলে।'

সে উঠতে যাচ্ছিল এই সময় ওই স্টুডিওর মালিক বললেন, 'আমার মনে হয় মিলনবাবু, এভাবে নায়িকা পাওয়া খুব কঠিন। কলেজে পড়ুয়া মেয়েরা সিনেমায় নামলে পড়াশুনা শেষ হয়ে যাবে বলে রিস্ক নেবে না। বাবা-মাও রাজি হবে না। আমাদের কলকাতার নায়িকাদের দেখুন, বেশিরভাগই কলেজ জীবন শেষ করেনি। কেউ কেউ স্কুলেও ঢোকেনি। এই ভুলটা এখনকার সিরিয়াস মেয়েরা করতে চায় না।'

মিলন মাথা নাড়ল, 'ঠিকই। কিন্তু নতুন নায়িকা না পেলে ছবি হবে না।'

'তাহলে আরও একটু বড় মেয়ে খুঁজুন যাদের কলেজ শেষ হয়ে গেছে। আচ্ছা, এক কাজ করতে পারেন, কলকাতায় এখন বেশ কয়েকটা সংস্থায় মডেল ট্রেনিং চলছে। বিজ্ঞাপনে তো বটেই, ফ্যাশন শোতে এরা অংশ নেয়। এদের সঙ্গে দেখা করতে পারেন।' ভদ্রলোক বললেন।

মিলন টিভিতে দেখেছে। নতুন নতুন ডিজাইনের পোশাক পরে লম্বা লম্বা মেয়েগুলো ভেতর থেকে অদ্ভুত কায়দায় হেঁটে আসে। দর্শকদের মধ্যে ঢুকে রহস্যময়ীর হাসি হেসে আবার ফিরে চলে যায়। বোম্বে দিল্লীতেই এদের বেশ রমরমা বাজার, এখন বাঙালী মেয়েরাও ওই লাইনে ঢুকছে।

ভদ্রলোক টেলিফোন করে তখনই একটি সংস্থার মালিকের সঙ্গে কথা বলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করিয়ে দিলেন। অফিসটা পার্ক স্ট্রিটে। সামন্তকে নিয়ে মিলন তখনই

ছুটল সেখানে।

অফিসের আদবকায়দা দারুণ। রিসেপশনিস্ট মেয়েটাও সুন্দরী। নাম বলতেই মিস্টার গোমেসের ঘরে পৌঁছে গেল মিলন এবং সামন্ত। ভদ্রলোক প্রৌঢ়। হাত মেলানোর পর বললেন, 'বলুন, কি করতে পারি।'

মিলন বলল, 'আমি একজন চিত্রপরিচালক। আমার আগামী ছবির জন্যে নতুন নায়িকা খুঁজছি। শুনেছি আপনার এখানে অনেক মেয়ে—!'

'কোন্ ভাষার ছবি?'

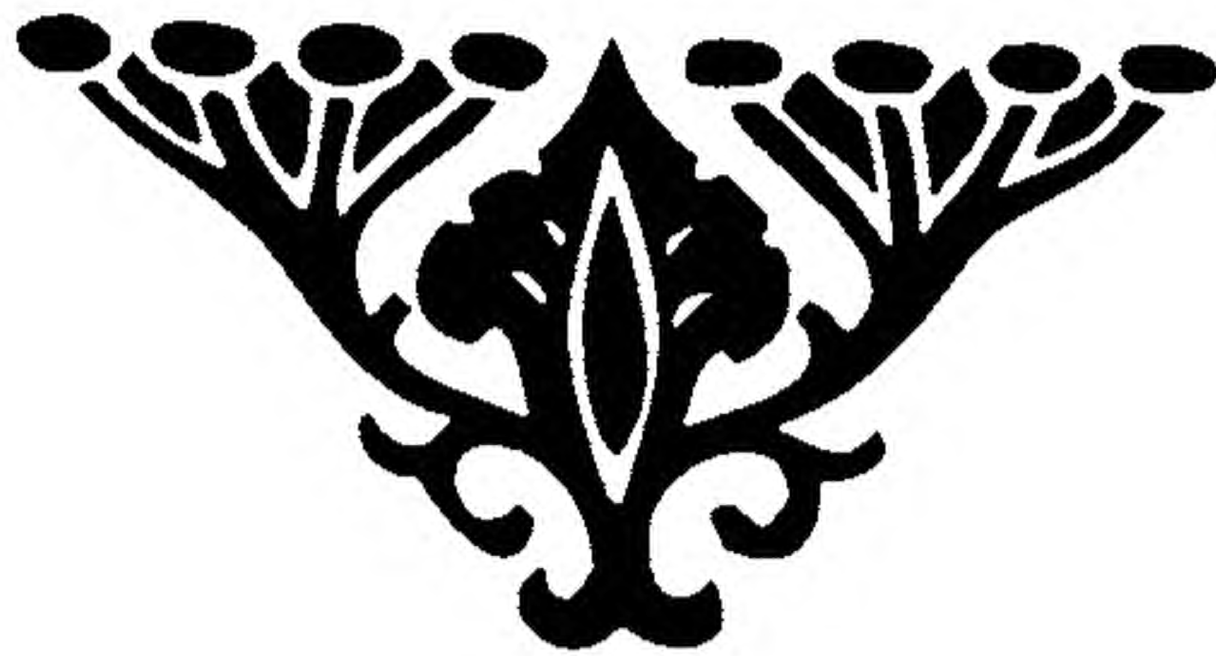
'বাংলা।'

'বিপদে ফেললেন, ইংরেজি বা হিন্দী হলে কোন সমস্যা হত না। আমার কাছে মাত্র চারজন বাঙালী মেয়ে আছে যারা সত্যি ট্যালেন্টেড। আচ্ছা, ওদের দেখুন আগে।' ভদ্রলোক ইন্টারকমে নির্দেশ দিয়ে উঠে দাঁড়ালেন, 'চলুন, প্রজেকশন রুমে যেতে হবে।'

পাশেই সেই ঘর। কয়েকটা চেয়ার। আলো নিভে গেলে পর্দায় যে মেয়েটিকে দেখা গেল সে লম্বায় অন্তত পাঁচ ফুট দশ ইঞ্চি। শরীরে বিন্দুমাত্র মেদ নেই। সবচেয়ে খাটো মেয়েটির উচ্চতা পাঁচ ফুট সাড়ে আট।

সামন্ত কানে কানে বলল, 'দাদা, কেটে পড়ুন। আমাদের হিরো, মানে যার কথা আপনি ভেবেছেন, সে এদের চেয়ে চার ইঞ্চি বেঁটে।'

গোমেজ আলো জ্বালিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বলুন, কাকে পছন্দ হল?'



[চার]

বাংলা ছবির বিখ্যাত নায়িকারা কেউই এক লাখের বেশি নেন না। কেউ কেউ পঞ্চাশের মধ্যেই থাকেন। অথচ একজন মডেল দিনে কুড়ি হাজার টাকা ছাড়া কাজ করবে না। বোম্বে হলে তাদের পারিশ্রমিকের অংক শুনলে চোখ কপালে উঠবে। দশ দিনের কাজের জন্যে একজন মডেলকে দু'লাখ এবং তার এজেন্টকে যদি কমিশন দিতে হয় তাহলে প্রোডিউসার পালিয়ে যাবেন। একজন মডেল সিনেমার দর্শকের কাছে নবাগতা। তাঁর নিজস্ব কোন দর্শক নেই। তাঁর জন্যে অত টাকা খরচ করা স্রেফ পাগলামি ছাড়া কিছু নয়।

মডেলের আশা ত্যাগ করে মিলন ধর্মতলা স্ট্রীটে গিয়ে প্রযোজকের সঙ্গে দেখা করল। সেখানে তখন পরিবেশক মশাই বসেছিলেন। মিলনকে দেখা মাত্র ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি হল মশাই, নায়িকার ছবি দেখান?'

মিলন মাথা নাড়ল, 'এখনও কাউকে পাইনি।'

'সেকি?' প্রযোজক চমকে উঠলেন, 'তাহলে ছবি শুরু হবে কি করে?'

মিলন করুণগলায় বলল, 'আমি খুব চেষ্টা করছি কিন্তু মনের মতন কাউকে পাচ্ছি না। আজ গিয়েছিলাম একটা এজেন্সিতে। ওদের হাতে অনেক সুন্দরী মডেল আছে। কিন্তু ওদের যা টাকার ডিম্যান্ড—।'

'পাগল! মডেল দিয়ে অভিনেত্রী হবে?' প্রযোজক জিজ্ঞাসা করলেন।

এবার পরিবেশক বললেন, 'ওকে বলুন প্রস্তাবটা।'

প্রযোজক মাথা নাড়লেন, 'সীতা রায়ের নাম শুনেছেন?'

মিলন চট করে মনে করতে পারল না।

'কি মশাই, কেমন পরিচালক আপনি? সীতা রায় যখন কিশোরী তখন একটা বাংলা ফিল্মে নায়িকার বোনের চরিত্র করেছিলেন। সেই ছবিতে তাঁর অভিনয় দেখে ম্যাড্রাসের একজন পরিচালক তামিল ছবিতে তাঁকে নিয়ে যান। দশ বছর তামিল ছবিতে চুটিয়ে নায়িকা করে ভদ্রমহিলা অস্ট্রেলিয়ায় চলে যান বিয়ে-থা করে। সেই সাহেবের সঙ্গে বনাবনি না হওয়ায় ডিভোর্স করে আবার ম্যাড্রাসে ফিরে এসেছিলেন। কিন্তু এর মধ্যে এত উঠতি নায়িকা ওখানে নাম করেছে যে আর পাত্তা পাচ্ছেন না। এই সীতা রায় এখন কলকাতায়।'

'আচ্ছা!'

'আপনাকে ধরার চেষ্টা করছি খবরটা পেয়ে। ভাগ্যি ভাল এসে পড়েছেন। আপনি আজই গিয়ে সীতা রায়ের সঙ্গে দেখা করুন।'

'কোথায় উঠেছেন তিনি?'

'নিউ আলিপুরে ওঁর মামীর ফ্ল্যাটে। আমি টেলিফোন করেছিলাম। উঃ, কি

কণ্ঠস্বর, এখনও উনিশ-কুড়ি মনে হবে।'

'কিন্তু ওঁর বয়স কত? যা বললেন তাতে চল্লিশ-টল্লিশ মনে হচ্ছে।'

পরিবেশক খেঁকিয়ে উঠলেন, 'আরে মশাই, বলুন তো উর্বশী রম্ভা মেনকার বয়স কত? বলতে পারবেন না। সুন্দরী মেয়ে যদি ফিগার ঠিক রাখে তাহলে বয়স ধরা যায় না। রেখার কত বয়স? পঞ্চাশ পার হয়ে যায়নি? ও যদি রাজি হত তাহলে আপনি ছবিতে নিতেন না?'

কথাটা মানতে বাধ্য হল মিলন। রেখা এক বিস্ময়। ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম তো নিয়ম নয়। অবশ্য এই ভদ্রমহিলাকে না দেখে কিছুই বলা যাচ্ছে না।

প্রযোজক বললেন, 'প্লাস পয়েন্ট কি জানেন? সীতা রায়ের অ্যাক্টিং ব্যাকগ্রাউন্ড আছে। আপনাকে একটুও খাটতে হবে না।'

ঠিকানা নিয়ে নিউ আলিপুরে হাজির হল মিলন। এ পাড়ায় বেশ ছাড়া ছাড়া তিনতলা বাড়ি, একটু বাগান। শান্ত চারপাশ। নাম্বার মিলিয়ে গেট খুলে ভেতরে ঢুকে বেল বাজাতে একটি কাজের মেয়ে দরজা খুলল। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'সীতা রায় আছেন? আমার নাম মিলন। টেলিফোনে বলা আছে।'

'দিদি এখন ঘুমোচ্ছেন।'

'ঘুমোচ্ছেন? এই সময়ে?'

মেয়েটি মুখ গম্ভীর করে ঘাড় নাড়ল।

'কিন্তু একটু আগে টেলিফোনে কথা হয়েছিল।'

'হ্যাঁ। তারপরেই ঘুমিয়ে পড়েছেন। আপনার যদি খুব জরুরি দরকার থাকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতে পারেন।'

বাইরের ঘরে বসল মিলন। পুরনো ধাঁচের আসবাব, এ বাড়ির কেউ কোনকালে শিকার করতেন নিশ্চয়ই, নইলে দেওয়ালে বাঘের ছাল টাঙানো থাকবে কেন? মিনিট পাঁচেক বাদে এক বৃদ্ধা এলেন। ফর্সা, সুন্দরী ছিলেন একসময়, এখন বয়সের ভারে কাবু।

নমস্কার জানিয়ে মিলন বলল, 'আমি সীতা রায়ের সঙ্গে দেখা করব।'

'আপনার সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলে সে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'তাই শুনলাম। কিন্তু উনি আসতে বলেছেন।'

'আমি কি করতে পারি। প্রায় কুড়ি বছর পরে ও এসেছে। ওর সব কিছু আমি বুঝতে পারছি না। ও এসেছে খবর পেলেন কি করে?'

'আমি ঠিক জানি না। আমার প্রযোজক ফোন করেছিলেন।'

'সীতা আমার কাছে বড় হয়েছিল। ওর মেসোমশাই-এর প্রশ্রয়ে সিনেমায় নেমে জীবনটাকে নষ্ট করল। শুনেছি ম্যাড্রাসে থাকার সময় প্রচুর রোজগার করেছে, কিন্তু সেগুলো কোথায় গেল তা আমাকে বলেনি। এখন আমি এখানে একা থাকি। এইসময়ে ও এসে সমস্যা বাড়িয়ে দিয়েছে।'

ভদ্রমহিলা যে সন্তুষ্ট নন তা ওর কথায় স্পষ্ট।

'তাহলে আমি কি চলে যাব?'

'অ্যাঁ?' বৃদ্ধা মাথা নাড়লেন, 'না। সে যখন টেলিফোনে আসতে বলেছে তখন দেখা করাটা তার কর্তব্য। ভদ্রতা বলে তো একটা জিনিস আছে।'

'ঠিক আছে, আমি অপেক্ষা করছি।'

'কতক্ষণ করবেন?' বৃদ্ধা কাজের মেয়েকে ডেকে কিছু বললেন নিচু গলায়। তারপর মিলনকে বললেন, 'আমার বাতের ব্যথা, তিনতলায় উঠলে বড্ড কষ্ট হয়। আপনি ওর সঙ্গে ওপরে যান। ও ঘুম থেকে তুলে দিচ্ছে।'

মেয়েটির পেছন পেছন মিলন দোতলায় উঠল। সাবেকি আমলের বাড়ি। বোঝা যায় একদা এঁরা অভিজাত এবং অর্থবান ছিলেন। এখন কলসি গড়িয়ে চলছে। তিনতলায় উঠে মেয়েটি একটা ঘর দেখিয়ে বলল, 'ভেতরে বসুন।'

যে ঘরে মিলন ঢুকল সেখানে জিনিসপত্র আগোছালো হয়ে পড়ে আছে, প্রচুর বিদেশি জিনিস ছড়ানো। এগুলো যে সম্প্রতি এসেছে তা বোঝা যাচ্ছিল।

মিনিট দশেক বাদে পাশের দরজা খুলে যিনি দেখা দিলেন তিনি যে মারাত্মক সুন্দরী ছিলেন তাতে কোন ভুল নেই। প্রচণ্ড ফর্সা, একটু চর্বি লাগায় শরীরের বিশেষ বিশেষ জায়গা সামান্য ভারী। পরনে পাতলা নাইটির ওপরে গলায় জড়ানো ওড়না।

মিলন উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করল, 'একটু বিরক্ত করলাম।'

'একটু নয় অনেকটা।' সীতা রায় ঘুম ঘুম চোখে ঘরে ঢুকে সোফায় বসলেন। বাঁ হাতের আঙুল চুলে চিরুনির মত চালিয়ে বললেন, 'বলুন।'

'আপনি এখন কলকাতায় থাকবেন?'

'কলকাতা যদি আমায় রাখে, থাকব।'

'আমার প্রযোজক আপনার সঙ্গে কথা বলেছেন।'

'হুম্। আপনি চা খাবেন।'

'না।'

'ড্রিঙ্ক করেন?'

'এখন করব না।'

'হ্যাঁ। আমাকে আপনার ছবির নায়িকা করবেন, তাই তো?'

'প্রযোজকের সেরকমই ইচ্ছে।'

'আপনার কি মনে হচ্ছে? আপনি তো ডিরেক্টার।'

'আসলে—?'

'আপনার হিরো কে?'

মিলন নাম বলল। সীতা মাথা নাড়লেন, 'আমি নাম শুনিনি। আসলে আমি ম্যাড্রাসে কাজ করেছি রজনীকান্তের সঙ্গে, কামাল হোসেনের সঙ্গে। বুঝতেই পারছেন, নায়ক যেন ভাল হয়।' নাইটির পকেট থেকে সিগারেট বের করে লাইটারের আগুনে ধরিয়ে ধোঁয়া ছাড়লেন সীতা।

'মুশকিল হল, আমার নায়িকার বয়স বাইশ তেইশ।' মিলন বলল।

'সো হোয়াট?'

'আপনার সঙ্গে কেমন মানাবে বুঝতে পারছি না।'

হঠাৎ হাসির ফোয়ারা উঠল। হাসতে হাসতে ভেতরে চলে গেলেন মহিলা। খুব বোকা বোকা লাগছিল মিলনের নিজেকে। না, সে আপোস করতে পারবে না। এই মহিলা মেরে-কেটে নায়িকার দিদি হতে পারেন, নায়িকা ভাবাই যায় না। এঁকে নিয়ে ছবি করতে হলে অন্য গল্প চাই। সেটা এখন সম্ভব নয়।

মিনিট পাঁচেক বাদে খট্‌ খট্‌ আওয়াজ হল। দরজার দিকে তাকিয়ে চমকে উঠল মিলন। সীতা রায় এক ধাক্কায় অন্তত কুড়ি বছর কমিয়ে ফেলেছেন। এখন তার পরনে লাল সর্টস, টাইট গেঞ্জি। চুল কায়দা করে বাঁধা। হঠাৎ তিনি ঘুরে দাঁড়ালেন। মহিলার উঁচু নিতম্বে ঢেউ খেলল। আবার ঘুরলেন তিনি, 'কি মনে হয়? আমাকে বাইশ-তেইশ মনে হচ্ছে না?'

মিলনের গলা শুকিয়ে গেল। তখনই ভদ্রমহিলা একটা অদ্ভুত কাণ্ড করলেন। এগিয়ে এসে মিলনের সামনে হাঁটুমুড়ে নীলডাউন হয়ে বসে দু'হাত জড়িয়ে ধরলেন, 'আমাকে একটা ব্রেক দিন, প্লিজ, একটা ব্রেক। অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে আমার জীবন আমি নষ্ট করে ফেলেছিলাম। আই ওয়ান্ট টু কাম ব্যাক। প্লিজ হেল্প মি। আমি চিরকৃতজ্ঞ থাকব।'

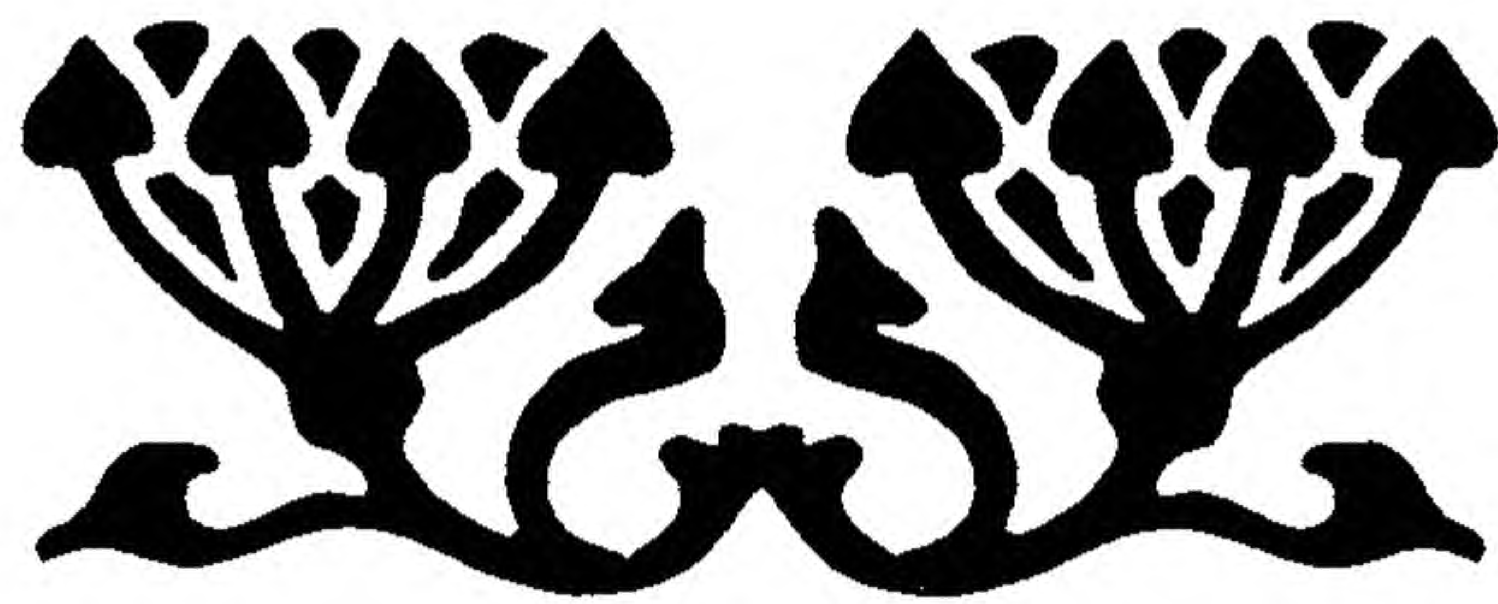
'এভাবে বলবেন না। আমি নিশ্চয়ই চেষ্টা করব।'

'না, চেষ্টা নয়, তোমাকে কথা দিতে হবে। কি যেন নাম?'

'মিলন।'

'বাঃ, গুড। তোমার আমার মিলন হলে ছবি হিট হবেই। আমি জোর দিয়ে বলছি। আচ্ছা, আমাকে কি খুব হ্যাংলা বলে মনে হচ্ছে?'

মিলন কি জবাব দেবে ভেবে পাচ্ছিল না।



[পাঁচ]

বেশ কয়েক বছর এই লাইনে থেকেও মিলন কখনই কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে নিজেকে জড়ায়নি। নানানজনের ব্যাপারে কত গুঞ্জন টালিগঞ্জের হাওয়ায় ভাসে কিন্তু মিলন সম্পর্কে কখনই কেউ কিছু রটাবার সুযোগ পায়নি। কাজের বাইরে মেয়েদের সঙ্গ সে সন্তর্পণে এড়িয়ে গেছে।

আজ সীতা রায়কে দেখে ওর খুব কষ্ট হল। দু'হাত ধরে দাঁড় করিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি এত আপসেট হচ্ছেন কেন?'

ছেলেমানুষের মত মাথা নাড়লেন সীতা রায়, 'আমি একটা ব্রেক চাই। নাহলে আত্মহত্যা করতে হবে। এভাবে চললে কিছুদিন বাদে আমার হাতে সিগারেট কেনার টাকাও থাকবে না। বিশ্বাস করুন।'

'এরকম তো হওয়ার কথা নয়।'

সীতা রায় তাকালেন, কিছু ভাবলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, আপনি আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না?'

মাথা নাড়ল মিলন, না।

সীতা রায় ভেতরে চলে গেলেন। মিনিট পাঁচেক বাদে যখন ফিরে এলেন তখন তাঁর পরনে হালকা নীল পা ঢাকা নাইটি। হাতে গ্লাস এবং সিগারেট। বললেন, 'আমি একটু পান করছি।'

সামনের সোফায় বসে বললেন, 'ছোট্ট করে বলি, ম্যাড্রাসে অভিনয় করতে গিয়ে আমি সফল হয়েছিলাম। প্রচুর ছবি করেছি। শেষ ছবিটার জন্যে আট লাখ পেয়েছিলাম দশ বছর আগে। প্রথম দিকে তামিল তেলেগু বলতে পারতাম না। পরে শিখে নিয়েছিলাম। আসলে আমার ফিগার ওদের আকর্ষণ করত। বাঙালীরা যে ধরনের সৌন্দর্য পছন্দ করে ম্যাড্রাসিরা তা করে না। ওদের নায়িকাদের নিতম্ব, বুক বড় না হলে অচল। আমার ওগুলো থাকা সত্ত্বেও কোমর ছিল খুব সরু।' হাসলেন সীতা, 'একটা রসিকতা মনে পড়ল। ম্যাড্রাসে কোন নতুন মেয়ের স্ক্রিন টেস্ট করার সময় ক্যামেরাম্যান মুখের ছবি তোলে না, নিতম্বের ছবি তোলে।'

এর মধ্যে যে রসিকতা রয়েছে সেটা পছন্দ হল না মিলনের। সে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি ফিল্ম ছাড়লেন কেন?'

'মাথাটা খারাপ হয়ে গিয়েছিল, তাই। মাথা খারাপ না হলে কেউ প্রেমে পড়ে না।' আমি যার প্রেমে পড়লাম সে অস্ট্রেলিয়ায় থাকে। ম্যাড্রাসেই আলাপ। ফিরে গিয়ে রোজ রাত্রে ফোন করত। প্রত্যেক মাসে অন্তত একদিনের জন্যে হলেও অস্ট্রেলিয়া থেকে দেখা করতে আসত। এরকম গুরুত্ব পেলে যে কোন মেয়ের মন গলে যেতে বাধ্য। আমারও গিয়েছিল। ওকে বিয়ে করলে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে থাকতে

হবে, থাকলে ফিল্মে কাজ করতে পারব না জেনেও রাজি হয়েছিলাম। আসলে একটার পর একটা ছবিতে প্রেমের অভিনয় করতে করতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। নিজের জীবনে সেইটি চাইলাম। বিয়ে হয়ে গেল।' গ্লাসে লম্বা চুমুক দিলেন সীতা রায়। বড় নিঃশ্বাস ফেললেন।

'তারপর?'

'বিবাহিত জীবন মানে একটা বড়ধরনের অ্যাডজাস্টমেন্ট তা বুঝতে পারলাম দিনসাতেকের মধ্যেই। মানুষটা আমাকে ভালবাসত। সে ভালবাসা পাগলের মত। কোন পাগল যদি আপনাকে জড়িয়ে ধরে খামচায়, খোঁচা দেয় তাহলে তার ওই ভালবাসাকে আপনি সহ্য করতে পারবেন? সে আমার ঠোঁটে চুমু খেত না, তার সমস্ত আকর্ষণ আমার নিতম্বে। এই নিয়ে আপত্তি করলে প্রথম প্রথম কথা বন্ধ করে দিত, পরে অত্যাচার। না, মারধোর করেনি সে। ওদেশে সেটা করা যায় না। মদ খাওয়া শিখিয়েছিল। আমাকে অলস এবং মোটা করে ফিগার নষ্ট করতে যা যা করার তা করেছিল। প্রথমদিকে আমি এটা বুঝতে পারিনি। যখন পারলাম তখন প্রতিবাদ করলাম। কিন্তু প্রচুর সময় নষ্ট হয়ে গেছে ততদিনে। ওর ছিল এক্সপোর্ট বিজনেস। হঠাৎ ধাক্কা খেল ব্যবসায়। প্রায় কোটি টাকার অর্ডার পাঠানোর পর ক্যানসেল হয়ে গেল। তখন খেপে গেল সে। যে দুর্ব্যবহার শুরু করল তা সহ্য করতে পারলাম না। ব্যবসায় উঠে দাঁড়াবার জন্যে ওর বন্ধুদের সঙ্গে প্রেমের অভিনয় করতে বলত। পারব না বললে ব্যঙ্গ করে বলত, তুমি তো এতকাল অভিনয় করে এসেছ, এটুকু তোমার কাছে জলভাত। বেশি কি হবে, একটু শোওয়াশুয়ি। তারপর শাওয়ারের নিচে দাঁড়ালে সব ধুয়ে যাবে, কেউ টের পাবে না।'

সিগারেট নেভালেন সীতা রায়, 'বাধ্য হলাম ডিভোর্স নিতে। নিয়ে চলে এলাম ম্যাড্রাসে। পুরনো পরিচালকদের সঙ্গে যোগাযোগ করলাম। তারা আমাকে মা-মামীদের চরিত্র দিতে চাইল। ভীষণ আহত হলাম। তারপর চলে এলাম কলকাতায়। মামীর বাড়িতে উঠেছি। এ বাড়িতেই শৈশব কেটেছিল আমার। একজন প্রবীণ সাংবাদিককে ফোন করে বলেছিলাম কাজের কথা। তারপরই আপনাদের ফোন। আচ্ছা বলুন তো, আমাকে কি নায়িকা মানায় না?'

চুপচাপ শুনছিল মিলন। বলল, 'সেটা নির্ভর করছে চরিত্রটা কি রকম, তার বয়স কত, তার ওপর। আমি একটু সময় নিচ্ছি, আপনাকে জানাবো।'

সীতা রায় হাসলেন, 'বিয়ের পাত্রী দেখতে এসে পছন্দ না হলে পাত্রপক্ষ একথা বলে যান। ঠিক আছে, যা ভাল মনে হয় করবেন।'

বাইরে বেরিয়ে মন খারাপ হয়ে গেল মিলনের। ভদ্রমহিলার সব আছে কিন্তু কি যেন নেই যা তার নায়িকা চরিত্রের অভিনেত্রীর থাকা দরকার। হ্যাঁ, বয়স ক্যামেরার সামনে কমানো খুব মুশকিলের ব্যাপার, কিন্তু ইনি হয়তো সেটা পারবেন। তাহলে?

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে গিয়েছিল। ঘরে ঢুকে মিলন বিরক্ত হল। স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি আশ্চর্য, সেই সেলসগার্ল আসেনি?'

'এসেছিল।'

'তাহলে ফেরত দাওনি কেন ওগুলো?'

'কিছুতেই নিল না। বলল, দাদাকে বলুন এবারের মত রাখতে।'

'মামার বাড়ি। রাখলে টাকা দিতে হবে না?'

'আসলে মেয়েটার মন এত নরম যে কঠিন হতে পারলাম না। ও বলেছে কাল সকালে আসবে। তখন তুমিই যা করার করো।' স্ত্রী বলল।

পরদিন সকালে মিলন যখন কাগজ পড়ছে তখন বেল বাজল। সে উঠে দরজা খুলতেই অবাক হল, 'কি চাই?'

ছিপছিপে লম্বা, হলুদ শাড়ি, কাঁধে ব্যাগ, মেয়েটি বলল, 'বউদি—!'

পেছন থেকে স্ত্রীর গলা শোনা গেল, 'ও তুমি। এসো। শোনো, তোমাকে এর কথা বলেছিলাম।'

মিলন সরে আসতেই মেয়েটি ঢুকল। কিন্তু সে চোখ সরাতে পারছিল না। সীতা রায়ের মধ্যে যা নেই তা এই মেয়েটির মধ্যে আছে। একেবারে ডানাকাটা সুন্দরী নয় কিন্তু একবার তাকালে দু'বার তাকাতে হয়।

'দাদা, সত্যি আপনি জিনিসগুলো ফেরত দেবেন?'

সম্বিত ফিরল মিলনের, 'আমার যে ওগুলোর প্রয়োজন নেই।'

'ও।'

'আপনি কবে থেকে সেল্‌সের কাজ করছেন?'

'এই কদিনমাত্র। বিক্রি দেখাতে না পারলে ওরা ছাড়িয়ে দেবে। আসলে আমি তো ঠিক অভ্যস্ত নই—, আচ্ছা, ঠিক আছে।' মেয়েটি মিলনের স্ত্রীর দিকে তাকাল, যেন জিনিসগুলো ফেরত চায়।

'কি নাম আপনার?' মিলন জিজ্ঞাসা করল।

'অদিতি।'

'কতদূর পড়েছেন?'

'বি এ পাস করেছিলাম।'

'অন্য কাজ পাননি?'

অদিতি জবাব দিল না।

'বাড়িতে কে কে আছেন?'

'বাড়িতে? মা বাবা ভাই।

'কোথায় বাড়ি?'

'কৃষ্ণনগরে।'

'সেকি? অতদূর থেকে রোজ কলকাতায় আসেন?'

'না। আমি মানিকতলার একটা মেসে থাকি। মেয়েদের মেস।'

অদিতি বলল, 'প্রত্যেক শনিবারে বাড়িতে যাই।'

'এখানে দৈনিক কত রোজগার হচ্ছে?'

'কালকে কুড়ি টাকা হয়েছিল।'

'কুড়ি? এতে মেসের খরচ চলবে? বাবা টাকা পাঠান?'

'না। আমি দশ দিন হল মেসে গিয়েছি।'

'ঠিক আছে। আপনাকে আমি আজ আড়াইশো টাকা দেব। আজ কোন কাজ করতে হবে না আপনাকে।'

'তাহলে?'

'আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। আমি বদ লোক নই। আমার স্ত্রীর সামনেই বলছি, আপনার একটা স্ক্রিন টেস্ট নেব।'

'স্ক্রিন টেস্ট? কেন?'

সঙ্গে সঙ্গে স্ত্রী বলে উঠলেন, 'আমি তোমাকে ওর কথা বলব বলে ভাবছিলাম। কিন্তু ও অভিনেত্রী নয় শুনে যদি রাগ করো তাই বলিনি।'

'কেউ তো অভিনেত্রী হয়ে জন্মায় না। আপনি রাজি আছেন?'

'আমায় কি করতে হবে?'

'অভিনয়। আমার ছবিতে। আপত্তি আছে?'

'আমি তো কখনও করিনি। যদি না পারি—।'

'সেটা আমার ওপর ছেড়ে দিন। ক্যামেরায় যদি আপনাকে ভাল লাগে তাহলে আপনাকে নিয়েই জুয়ো খেলতে চাই আমি।' মিলন বলল।



[ছয়]

এক সময় টালিগঞ্জে নায়িকার মেলা বসেছিল। তখনও সন্ধ্যারাণী নায়িকার চরিত্রে অভিনয় করে যাচ্ছেন, কানন দেবী অবসর নিয়েছেন। খুব দ্রুত উঠে এসেছেন সুচিত্রা সেন, সাবিত্রী চ্যাটার্জী, অনুভা গুপ্তা, সবিতা চ্যাটার্জী, সুপ্রিয়া চৌধুরী, মালা সিন্‌হা। সুমিত্রা দেবী ও মঞ্জু দে রয়েছেন। কাবেরী বসু এবং সন্ধ্যা রায়দের পেছনে অপর্ণা সেনের আসার সময় হয়েছে। সেই তুলনায় নায়ক ছিলেন খুব কম। উত্তমকুমারকে একাই অনেকটা সামলাতে হত। অসিতবরণ নায়ক করছেন কিন্তু তাঁর গ্ল্যামার বেশী ছিল না। বিকাশ রায় নায়ক থেকে ভিলেনে চলে গেলেন। নির্মলকুমার, প্রবীরকুমার, আশীষকুমারেরা বাকি কাজ কোনমতে সামলাচ্ছেন। সৌমিত্র চ্যাটার্জী সত্যজিতের ছবিতে এসেছেন অন্য ইমেজ নিয়ে। তাঁকে বাংলা ছবির রোমান্টিক নায়ক হিসেবে দর্শকরা কতটা নেবে এ নিয়ে তখনও সংশয় ছিল। বিশ্বজিৎ সবে দেখা দিয়েছেন। কিন্তু লোকে তাঁকে উত্তমকুমারের ডুপ্লিকেট ভাবতে শুরু করেছে। তখনও তিনি অভিনেতা হিসেবে সাফল্য পাননি।

অর্থাৎ বাংলা ছবি তখন একজন উত্তমকুমার নির্ভর কিন্তু অনেক নায়িকা সদর্পে রয়েছেন। এখন পরিস্থিতি আরও খারাপ। উত্তমকুমারের বিকল্প হওয়ার যোগ্যতা এখন কারও নেই। তিনজনের বেশী রোমান্টিক নায়ক নেই যাঁরা সেই আমলে এলে সুযোগ পেতেন কিনা সন্দেহ। আবার এদেরও বয়স হয়েছে, এখনও কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন যদিও বিজ্ঞাপনে নাম দেখে কেউ টিকিট কাটতে প্রেক্ষাগৃহে যায় না। রসিকতা করে বলা হয় তখন ছিল একনায়কতন্ত্র আর এখন গণতন্ত্র।

মেয়েদের অবস্থা আরও করুণ। অপর্ণা সেনের পরে যে দু-তিনজন এসেছিলেন বয়স তাঁদের ছোবল মেরেছে। তাদের পাশাপাশি মাত্র একজন নায়িকাই পায়ের তলায় মাটি পেয়েছেন। বেশিরভাগ ছবিতেই তাই তাঁর মুখ।

সকাল সকাল স্টুডিওতে চলে এসেছিল মিলন। এই সময় তারাদাস এল। ঘরে ঢুকে বলল, 'নমস্কার দাদা। আপনার সমস্যার সমাধান হয়েছে?'

মিলন গম্ভীর গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'তার আগে বল, যখন কথা দিয়ে রাখতে পার না, তখন কথা দাও কেন?'

তারাদাসের কাঁধে সব সময় ক্যামেরার ব্যাগ থাকে। সেটা নামিয়ে বলল, 'আপনার কথা বুঝতে পারছি না দাদা।'

'তুমি কথা দিয়েছিলে দু-তিনটি মেয়েকে নিয়ে আসবে, মনে আছে?'

'এনেছিলাম দাদা। কিন্তু ছিনতাই হয়ে গেছে তারা।'

হতভম্ব হয়ে গেল মিলন, 'ছিনতাই হয়ে গেছে মানে?'

মিলন বলল, 'তিনজন নয়, একজনকেই নিয়ে এসেছিলাম। যেমন লম্বা, তেমন

গড়ন আর তেমনি মুখ। স্টুডিওর দরজায় পালু বাবুর সঙ্গে দেখা। মেয়েটিকে দেখে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন পরিচয়। বললাম ছবিতে নামতে চায়। ব্যাস, তখনই জোর করে ফ্লোরে নিয়ে গিয়ে ভিডিও ক্যামেরায় ছবি তুলে দেখে নিয়ে ওর পরের ছবির সহনায়িকার চরিত্রে সই করিয়ে ফেললেন।'

'তারপর?'

'তখন লক্ষ্য করিনি, পরে দেখলাম চুক্তিপত্রে লেখা আছে এমন কোন ছবিতে কাজ করা চলবে না যে ছবি ওর ছবির আগে রিলিজ করবে।'

'সেকি? ওর ছবি যদি দশ বছর বাদে রিলিজ করে?'

'একি বলছেন দাদা, পালুদার ব্যাপারটা তো আপনিও জানেন। বছরে দুই থেকে তিনটে ছবি রিলিজ করে ওর, একটা সুপারহিট হয়, একটা এমনি হিট আর একটা চলেবল্। এর আগেরবার একই সেটে দুটো ছবির কাজ করেছিলেন, এবার শুনছি একই সেটে তিনটে ছবির স্যুটিং করবেন। ফলে সেটের খরচ তিনটে ছবির মধ্যে ভাগ হয়ে যাবে।'

'এসব গল্প শুনে আমার লাভ কি তারাদাস?'

'দেখুন দাদা, শেখার তো কোন বয়স নেই। ধরুন একটা ড্রইং রুমের সেট পড়ল। ছবি নাম্বার ওয়ানের নায়ক-নায়িকারা সেখানে বসে ডায়ালগ বলল। দু'ঘণ্টার কাজ। তারপরে ওই ড্রইংরুমের সেট ভেঙে ফেলতে হবে। পালুদা সেটা না করে ছবি নাম্বার টু-এর ড্রইং রুম সিনের স্যুটিং করলেন। ওর নায়ক-নায়িকা এক থাকে। আগে পোশাক পাল্টে দিতেন, এখন তাও করেন না। বলেন তিন মাস পরে রিলিজ করলে লোকের মেমরিতে পোশাক থাকবে না। তাছাড়া যারা ছবি দেখতে ঢুকবে তারা চটকদার ডায়ালগ শুনবে, পোশাক দেখবে না।'

'এসব কথা শোনাচ্ছ কেন?'

'না, এরকম করে আপনি ছবির কস্ট্ কমাতে পারেন।'

'দ্যাখো, আমার প্রোডিউসার ভিখিরী নন। ওঁর আসার সময় হল, তুমি এখন তোমার কাজে যেতে পার।' মিলন কথা শেষ করতেই সামন্ত দ্রুত ঘরে ঢুকল, 'দাদা, প্রোডিউসার এসে গেছেন। গাড়ি থেকে নামছেন।'

মিলন উঠে দাঁড়াল। সে তারাদাসকে আবার ইশারা করতেই তারাদাস ব্যাগ তুলে নিয়ে বলল, 'আমার কথা যে শেষ হল না।'

'পরে বলো।'

'একজনকে দেখবেন না?'

'কাকে দেখব?'

'আপনাকে দেখাতে একজনকে নিয়ে এসেছিলাম। আবার যদি ছিনতাই হয়ে যায়?'

'হোক। আমার আর কাউকে দেখার প্রয়োজন নেই।' মিলনের কথা শেষ হওয়ার আগেই প্রযোজক ঘরে ঢুকলেন। নমস্কার করল মিলন, 'আসুন, আসুন।'

চেয়ারে বসে প্রযোজক জিজ্ঞাসা করল, 'ওই মেয়েটির কথা বলছিলেন?'

'কোন্ মেয়েটি?' মিলন অবাক হয়ে গেল।

'আরে! ঢোকার সময় দেখলাম বাইরে একজন দাঁড়িয়ে আছে, সে কে?'

তারাদাস দরজা পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল, সেখান থেকে বলল, 'আজ্ঞে ওর কথাই বলছিলাম। ছবিতে নামতে চায়, যদি দেখে নেন।'

প্রযোজক মিলনকে বললেন, 'ও, আপনি দ্যাখেন নি, দূর থেকে দেখে বেশ ভালই লাগল। ইম্প্রেসিভ চেহারা।'

তারাদাস বলল, 'যদি অনুমতি করেন পাঠিয়ে দিতে পারি।'

মিলন বলতে চাইল তার আর দরকার নেই কিন্তু তার আগেই সে প্রযোজককে ঘাড় নেড়ে হ্যাঁ বলতে দেখল। তারাদাস বেরিয়ে যেতে প্রযোজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি যেন কার কথা বলছিলেন?'

'হ্যাঁ। তাকে আসতে বলেছি—।'

'সে কোথায়? কখন আসতে বলেছেন? টাইম সেন্স যার নেই তার দ্বারা কোন কাজ হওয়া সম্ভব নয়। রাবিশ।' প্রযোজক বলা মাত্রই দরজায় যে এসে দাঁড়াল সে অন্তত পাঁচ ফুট পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, জিনসের ওপর খাটো ব্লাউজ পরেছে সে। মাথার চুল চুড়ো করে বাঁধা, রোদ চশমা কপালের ওপর তোলা, কাঁধে সরু স্ট্রাপের ব্যাগ।

'আসুন।' অনিচ্ছাসত্ত্বেও অনুমতি দিল মিলন। অবশ্য এক্ষেত্রে সে অনুমতি না দিলেও মেয়েটি আসতে পারত, 'বসুন।'

মেয়েটি বসল, বাঁ পায়ের ওপর ডান পা তুলে দিয়ে।

প্রযোজক জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি নাম ভাই?'

'খুশী, খুশী সেন।'

'বাঃ, চমৎকার নাম। আন-ইউজুয়াল নাম। পড়াশুনা কদ্দূর?'

'আমি দিল্লী ইউনিভার্সিটি থেকে গ্রাজুয়েশন করেছি।'

'অভিনয়-টভিনয়?' প্রযোজক চোখ ছোট করল।

'কলেজে করেছি। ওথেলোতে ডেসডিমনা, রক্তকরবীতে নন্দিনী।'

'বাঃ। ও মিলনবাবু, আপনার কিছু জিজ্ঞাসা নেই?'

মিলন কিছু বলার আগে টেলিফোন বেজে উঠল। মেয়েটি ঝট্‌পট্ ব্যাগ খুলে একটা সেলুলার ফোন বের করে কানে চাপল, 'হ্যাঁ, ইয়েস, কখন? না, আমি লেট নাইট করতে পারব না। ওকে!' সেটটাকে অফ করে মেয়েটি বলল, 'সরি।'

প্রযোজক হাসলেন, 'বয়ফ্রেন্ড নাকি?'

মেয়েটি ঠোঁট টিপে হেসে কাঁধ ঝাঁকাল।

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'আপনার সঙ্গে ছবি আছে?'

'সিওর। তারাদাসদা তুলেছেন।' ব্যাগ থেকে একটা চওড়া খাম বের করে সে এগিয়ে দিতে প্রযোজক খপ্ করে সেটা টেনে নিলেন। মিলন মেয়েটির মুখ লক্ষ্য করছিল। বাঙালী মেয়ের মুখ নয়। ইতালিয়ান ফেস। এই সময় প্রযোজক বলে

উঠলেন, 'ফ্যান্টাস্টিক। দেখুন দেখুন মিলনবাবু।'

ছবিটা দেখল মিলন। সম্ভবত ছাদের ওপর তোলা। একটা রবারের গদির ওপর উপুড় হয়ে শুয়ে আছে মেয়েটি, পরনে টু-পিস বিকিনি। মুখ পাশ ফেরানো। ওর ফিগার যে অনবদ্য তা বোঝা যাচ্ছে।

মিলন বলল, 'বাংলা ছবিতে এই ফিগার দেখানো যাবে না।'

'সেন্সর আটকাবে?'

'না আটকালেও দর্শকরা নেবে না।'

'আচ্ছা, এই ছবিটা দেখুন, কী প্রোফাইল!'

এই সময় আবার টেলিফোন বাজল। মেয়েটি সেলুলার বের করল; 'হ্যাঁ, ইয়েস, কখন? না, আমি লেট নাইট করতে পারব না। ওকে।' ফোনটা আবার ব্যাগে ঢুকিয়ে সে বলল, 'সরি।'

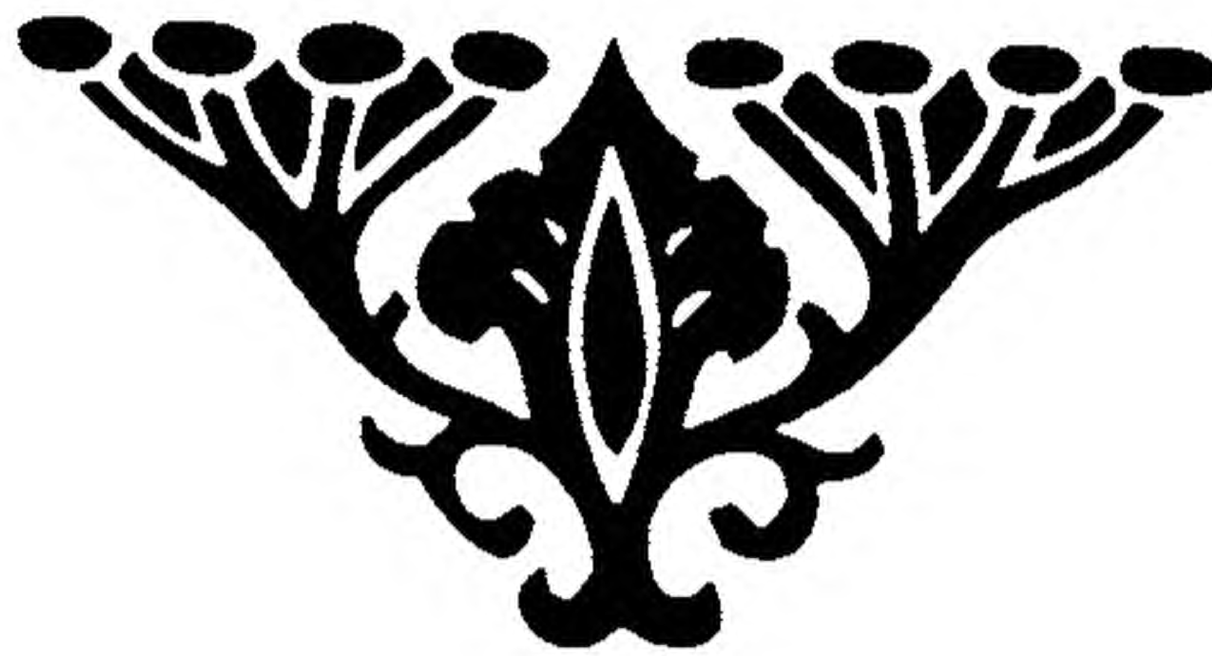
মিলন বলল, 'ঠিক আছে, আমরা তারাদাসের মাধ্যমে আপনাকে খবর দেব। একটু ভাবতে হবে।'

মেয়েটি উঠে দাঁড়াল, 'আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব শুধু লেট নাইট করতে বললে আমি পারব না।'

মিলন অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

'আমার স্বামী পছন্দ করেন না। তাই।' মেয়েটি চলে গেল।

হঠাৎ প্রযোজক যেন খেপে গেলেন, 'কি মশাই, আপনার ক্যান্ডিডেট কোথায়? সবাইকে বলছে লেট নাইট করবে না, সতী লক্ষ্মী! হুঁ।'



[সাত]

সেলস গার্লের চাকরি সুখের নয়। ঘরে ঘরে গিয়ে মানুষকে বুঝিয়ে যদি মাল বিক্রি করতে পার তাহলেই কমিশন বাবদ টাকা পাবে নইলে নয়। সারাদিন ধরে এবাড়ি ওবাড়ি ঘুরেও যদি কিছু বিক্রি না করতে পার তাহলে শূন্য হাতে ফিরতে হবে। যে কোম্পানিতে অদিতি কাজ পেয়েছে সেখানে আরও কিছু মেয়ে রয়েছে। প্রত্যেককে আলাদা এলাকা দেওয়া হয়েছে। এইসব মেয়েরা খুবই সাধারণ, চেহারায়, পোশাকে, শিক্ষায়। পেটের দায়ে কাজ করতে বেরিয়েছে। তবু এদের কাছে কিছু কিছু গল্প শুনেছে অদিতি। দুপুর বেলায় সাধারণত পুরুষ অভিভাবক বাড়িতে থাকে না। জিনিস নিয়ে গেলে মেয়েরাই দ্যাখে, পছন্দ বা অপছন্দ জানায়। এদের কেউ কেউ অনুরোধ করে পছন্দের জিনিস রেখে যেতে যাতে রাতে অভিভাবকের কাছ থেকে কেনার অনুমতি নিতে পারে। বিক্রি হওয়ার আশায় মেয়েরা সেগুলো রেখে যায়। কিন্তু এরকম অভিজ্ঞতাও হয়েছে, পরদিন গিয়ে দাম নেওয়ার বা জিনিস ফেরত পাওয়ার সময় দেখা গেল একটা কম পড়ছে। সেলসগার্ল যতই দাবী করুক গৃহিণী প্রবলভাবে অস্বীকার করেন। ওই একটি জিনিসের দাম হয়তো তিনশো টাকা। গৃহিণী বলেন তিনি যা পেয়েছিলেন তারই দাম দিচ্ছেন। সেলসগার্ল অন্য বাড়িতে সাপ্লাই দিয়ে তার ঘাড়ে চাপাচ্ছে। ফলে ওই জিনিসের দাম কোম্পানি তার কমিশন থেকে কেটে নিয়েছে। যেখানে বিক্রি ক'রে কমিশন পেতে নাভিশ্বাস ওঠে সেখানে দাম কেটে নিলে চোখে অন্ধকার দেখতে হয়। অদিতি তাই ঠিক করেছিল কারও বাড়িতে জিনিস রেখে আসবে না।

এই চাকরি করা ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না অদিতির। এখন স্কুল-কলেজে চাকরি করতে গেলে অনেক পরীক্ষা দিতে হয়। বি এ পাস করলে সেই পরীক্ষার উপযুক্ত হওয়া যায় চাকরি পাওয়া যায় না। অফিস-কাছারিতে চাকরি পেতে গেলে যে মামা-কাকার জোর থাকা দরকার তা তার নেই। বাবা সওদাগরী অফিসে সামান্য কাজ করতেন। অবসর নেওয়ার পরই চোখের অসুখে প্রায় পঙ্গু। একমাত্র ভাই বেকার থেকে থেকে শেষ পর্যন্ত এয়ারফোর্সে নাম লিখিয়েছে। সাধারণ চাকরি। খাওয়া থাকা ইউনিফর্ম পাবে। তারপর মাইনে বাবদ যেটা পায় সেটা বাড়িতে পাঠায়। ওই টাকায় যে তিনজন মানুষের কি কষ্টে মাস কাটে তা তারাই জানে। এবাড়িতে ফিরে আসার মাসখানেকের মধ্যেই অদিতি বুঝেছিল চাকরি না করলে চলবে না। দু-তিনটে অল্পবয়সী ছেলেমেয়েকে সে পড়াতে চেয়েছিল কিন্তু এখন গার্জেনরা টিউটার হিসেবে স্কুলের শিক্ষকদের বেশি পছন্দ করে। হঠাৎ কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে যোগাযোগ করেছিল অদিতি এই কোম্পানির সঙ্গে। ইন্টারভিউ নেওয়ার সময় মালিক জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপনি কতদিন কাজ করবেন?'

'মানে?' বুঝতে পারেনি অদিতি।

'আপনার মত সুন্দরী শিক্ষিতা মহিলা সেলসগার্লের চাকরি করতে আসে না। মাস খানেক বাড়ি বাড়ি ঘুরলেই আপনার শরীর খারাপ হয়ে যাবে। আমার মনে হয় আপনি বাধ্য হয়ে এই চাকরির জন্যে এসেছেন এবং সুযোগ পেলেই ছেড়ে দেবেন। তাই প্রশ্নটি করলাম।'

এই দশদিনে কথাগুলোর মর্ম ভালভাবে বুঝেছে অদিতি। যে বাড়িতে মহিলা নেই সেই বাড়িতে গেলে তাকে দেখামাত্র পুরুষদের চোখ কীরকম লোভী হয়ে ওঠে। রাত্রে মেসে ফিরে যাওয়ার পথে সেই দৃষ্টি ছড়িয়ে যায় অন্য পথচারীর চোখে। বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে মনে হয় শরীরে কোন শক্তি অবশিষ্ট নেই। এই যে মেসে সে আছে এটাও বিজ্ঞাপন দেখে পাওয়া। এক ঘরে পাঁচজন। বাকি চারজন বিভিন্ন সময়ে এই ঘরে থাকে। এক একজন এক এক রকম। সবাই চাকরি করে। বাথরুম কমন। মেসের খাবার খাওয়া যায় না, জোর করে গলা দিয়ে নামাতে হয়। এই জীবনের কোন বর্তমান নেই। ভবিষ্যৎ তো দূরের কথা। এরকম অবস্থায় বাড়ি বাড়ি ঘুরতে ঘুরতে ভদ্রমহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল তার। আটপৌরে সাধারণ মহিলা। কথাবার্তায় আন্তরিকতা আছে। তিনি যখন অনুরোধ করলেন জিনিসগুলো রেখে গেলে স্বামীকে দেখাবেন তখন ভয় পেয়েছিল সে। জিনিস ফেরত দেওয়ার সময় এই ভদ্রমহিলা মিথ্যাচার করবেন না তো! একটু ইতস্তত করলেও সে রাজি হয়েছিল। পরদিন দাম নিতে গিয়ে শুনল আবার যেতে হবে কিন্তু তার জিনিসগুলো ঠিকঠাক টেবিলের উপর রয়েছে। অর্থাৎ ভদ্রমহিলার মনে তাকে ঠকাবার মতলব নেই।

ভদ্রমহিলার স্বামী যে সিনেমার পরিচালক সেটা কালও জানতে পারেনি, পারল আজ। ভদ্রলোক তাকে বলেছেন সিনেমায় নামাবেন। সিনেমায় নামতে হলে তার স্ক্রিন টেস্ট করা দরকার এবং সেটা আজই করবেন। কথাগুলো উনি বলেছেন স্ত্রীর সামনে তাই ধরে নেওয়া যায় ভদ্রলোকের কোন বদ মতলব নেই। অদিতির খুব মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল যখন সে দেখল ভদ্রলোক তার রেখে যাওয়া জিনিসগুলো না কিনে ফেরৎ দিয়ে দিলেন। তার বদলে হাতে ধরিয়ে দিলেন একটা কাগজ, তাতে ঠিকানা লেখা, 'মিলন গুপ্ত, নিউ থিয়েটার্স স্টুডিও নাম্বার ওয়ান, টালিগঞ্জ।' বললেন, 'স্টুডিওর গেটে পৌঁছে এই কাগজটা দেখালেই যে কেউ আমার অফিসে পৌঁছে দেবে। তুমি দুপুরে এসো। আর একদম উগ্র সাজে আসবে না।'

কথাটা শুনে মনে মনে হেসেছিল অদিতি। তার শাড়ি, জামা এমনিতেই কম, অনেকদিন কেনা হয়নি পয়সার অভাবে, উগ্র সাজ সাজার ক্ষমতা কোথায়! সোজা মেসে ফিরে এসেছিল সে। সিনেমায় নামার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি সে। স্কুলের নাটকে কয়েকবার অভিনয় করেছে কিন্তু তার বাইরে কিছু নয়। আর সেই অভিনয় ছিল নেহাতই মজা করার। সুচিত্রা সেন, সুপ্রিয়া, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা সেন হওয়ার স্বপ্ন সে কখনও দ্যাখেনি। এমন কি কমলেন্দুর সঙ্গে যখন তার প্রেম চলছিল, সেই

রোমান্টিক দিনগুলোতেও নিজেকে নায়িকা ভাবতে সাহসই হয়নি তার। আজ প্রস্তাব পেয়েও তার বিশ্বাস হচ্ছে না। সে সিনেমায় নায়িকা হবে এও কি সম্ভব? হ্যাঁ, ছেলেবেলা থেকেই সে শুনে এসেছে তার মত সুন্দরী নাকি কৃষ্ণনগরে নেই। কিন্তু তাই শুনে মনে কোন দাগ পড়েনি। মা বলত, রূপ ক্ষণস্থায়ী। সেটাই বিশ্বাস করে এসেছে এতদিন। কমলেন্দু যখন একরাত্রে মেরে তার মুখ ফুলিয়ে দিয়েছিল তখন ব্যথা নিশ্চয়ই পেয়েছিল কিন্তু দেখতে খারাপ হয়ে যাবে বলে আতঙ্কিত হয়নি।

মেসের খাটে শুয়ে স্বপ্ন দেখতে চাইল অদিতি। সে যদি সুযোগ পায় এবং খুব ভাল অভিনয় করে তাহলে কি হেমামালিনীর মত বিখ্যাত হয়ে যাবে? লোকে তার অটোগ্রাফ নেবে? যেখানে যাবে সেখানেই ভিড় জমবে? চিত্রতারকারা নাম করে গেলে তো এরকমই হয়।

মাথা নেড়েছিল অদিতি আপন মনে। কিছুই হবে না। তার এমন কপাল যে কিছু হওয়ার নয়। কিন্তু আড়াই শো টাকা পাওয়া যাবে। সে আজ কাজে বের হচ্ছে না বলে ক্ষতিপূরণ হিসেবে মিলনবাবু তাকে আড়াই শো টাকা দেবেন বলে কথা দিয়েছেন। এই মুহূর্তে ওটা তার কাছে অনেক দামী।

টালিগঞ্জে কখনও যায়নি অদিতি। সত্যি বলতে কি কলকাতার রাস্তাঘাট তার ভাল করে জানা নেই। যে এলাকায় তাকে বিক্রির জন্যে ঘুরতে হয় সেই এলাকাটা তার চেনা। আজ টালিগঞ্জ ট্রাম ডিপোয় ট্রাম থেকে নেমে সে ফাঁপরে পড়ল। দুজনকে জিজ্ঞাসা করার পর হদিস পেয়ে হাঁটতে শুরু করল অদিতি। নিউ থিয়েটার্স স্টুডিওতে যাবে শুনে যাদের জিজ্ঞাসা করেছিল, তাদের মুখ যে খুব রসালো হয়ে উঠেছিল সেটা লক্ষ্য করেছিল সে।

টিনের বড় গেট খোলা ছিল। ভেতরে ঢোকার সময় কেউ আপত্তি করেনি। বাঁদিকে বিশাল গুদাম ঘর, সামনে রাস্তা। একজন সাধারণ কর্মচারিকে কাগজটা দেখাতেই সে বলল, 'সোজা গিয়ে ডান দিকের দ্বিতীয় ঘর।'

বুকের ভেতরটা কি রকম করছিল। সোজা রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অবাক হয়ে অদিতি দেখল সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় একজনের সঙ্গে দাঁড়িয়ে কথা বলছেন। এত বড় শিল্পীকে এত কাছ থেকে সে যে দেখতে পাবে কল্পনা করেনি।

দ্বিতীয় ঘরটির দেওয়ালে বোর্ড টাঙানো, তাতে কি লেখা সেদিকে নজর গেল না অদিতির। একটি লোক তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'কি চাই?'

'মিলনবাবু আছেন?' গলা শুকিয়ে গিয়েছিল তার।

'কি দরকার?'

'উনি আমাকে আসতে বলেছিলেন।'

'কেন? কি ব্যাপার?' সামন্ত চোখ ছোট করল।

অদিতি কাগজটা এগিয়ে দিল। একবার নজর বুলিয়ে সামন্ত তাকে আবার দেখল। তারপর পর্দা সরিয়ে ঘরের ভেতর চলে গেল। অদিতি চারপাশে তাকাল।

অনেক ছেলে-মেয়ে চারপাশে ঘুর ঘুর করছে। মেয়েগুলো খুব সেজেগুজে এসেছে। তাদের কেউ কেউ তাকে ঘুরে ঘুরে দেখছে। এরা কারা? এখানে নিশ্চয়ই কাজ করে না। কাজের সময় অলসভাবে কাটাবে কেন?

'আসুন।' সামন্ত ডাকল।

ঘরে ঢুকল অদিতি। ছোট ঘর। একটা টেবিলের দু-পাশে দুজন মানুষ। তাদের একজন মিলন। মিলন বলল, 'চিনতে অসুবিধে হয়েছে?'

'না'।

'বসুন।'

অদিতি বসল। পাশে বসা লোকটি জিজ্ঞাসা করলেন, 'এর কথা বলছিলেন?'

মিলন বলল, 'হ্যাঁ।' ক্যামেরা যদি ওর ফেবারে কথা বলে তাহলে ওকে নিয়ে আমি একটা জুয়ো খেলতে চাই।'

লোকটি বললেন, 'আপনি জুয়ো খেলবেন আমার টাকায়। তাই তো?'

মিলন চুপসে গেল, 'হ্যাঁ, মানে, আপনার অনুমতি নিয়েই—।'

'একটু আগে যে মেয়েটিকে দেখলেন তার ধারে কাছে ইনি আসেন?'

'দেখুন, আগের মেয়েটির ফিগার সুন্দর, দেখতেও সুন্দরী। আবার গল্পের নায়িকা যদি অত স্মার্ট হয় তাহলে দর্শকের সিমপ্যাথি পাবে না। বাঙালি দর্শক বেসিক্যালি কনজারভেটিভ হয়।'

'তাই নাকি? তাহলে হিন্দী সিনেমার হেলেন, জিনত আমন, বিন্দুকে দেখতে ব্ল্যাকে টিকিট কাটত না।'

'এই তথ্যটাও ঠিক। কিন্তু ওখানেই মজা। বাঙালি দর্শক তার নিজের মেয়ে বা বউকে শরীর দেখানো পোশাক পরে নাচতে দেখতে চাইবে না কিন্তু বাইরের মেয়ে ওসব পরলে দু-চোখ ভরে দেখবে। হিন্দী ছবিতে যা তারা দেখতে চায় বাংলা ছবিতে তা বরদাস্ত করবে না।'

'হুম্। ওদিকে সীতা রায় আপনার ডাকের আশায় বসে আছেন।'

'সীতা রায়? হ্যাঁ, ওঁকে নিয়ে নিশ্চয়ই কাজ করব। নায়ক যেখানে চাকরি করে সেই ইন্ডাস্ট্রির মালিকান। দারুণ সৎ। ওই চরিত্রে ওঁকে চমৎকার মানাবে। আপনি নিশ্চয়ই স্বীকার করবেন, নায়িকা হওয়ার সময় ওঁর চলে গেছে।'

ভদ্রলোক সোজা হয়ে বসলেন, 'ওয়েল, আপনি যা করার আজই করুন। প্রচুর সময় দিয়েছি। এই ব্যাপারটা আর ফেলে রাখতে চাই না।'

মিলন ডাকল, 'সামন্ত!'

সামন্ত ছুটে এল। মিলন বলল, 'এই ভদ্রমহিলাকে কোন মেকআপ রুমে নিয়ে গিয়ে একটু ফ্রেশ করিয়ে নাও। ওর স্ক্রিন টেস্ট নেব। আমি ফ্লোরে গিয়ে কিছুক্ষণের জন্যে ক্যামেরা ম্যানেজ করছি। যাও, কুইক।' মিলন উঠে দাঁড়াল।

[আট]

সামন্ত যে ঘরে তাকে নিয়ে এল সেটা যে মেকআপ রুম তা ঢুকেই বোঝা গেল। বড় আয়না, আলো জ্বলছে। অনেক প্রসাধনের বাক্স টেবিলে ছড়িয়ে। এক অভিনেত্রীর মেকআপ শেষ করে শেষবার দেখে নিচ্ছিল মেকআপম্যান।

অভিনেত্রী আয়নায় নিজেকে দেখতে দেখতে হাসল, 'তোমার হাতে যাদু আছে মদনদা, আমার বয়স তোমার হাতের গুণে দশ বছর কমে গেল।'

কথাটাকে পাত্তা না দিয়ে মদন বলল, 'কি ব্যাপার সামন্তদা?'

সামন্ত বলল, 'মিলনদা তোমার কাছে পাঠালেন। এঁকে একটু ঠিক করে দেবে?'

'ঠিক করে দেব মানে? ইনি কি বেঠিক আছেন?'

'আরে না! বাইরে থেকে ঘেমে নেয়ে এসেছেন। একটু মেকআপ করে দাও।'

'তাই বল। আসুন দিদি—।'

অদিতি এগিয়ে গেল। মদন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ওর মুখ দেখল। তারপর বলল, 'বাঃ, অনেকদিন এত ভাল ফেস দেখিনি। কি মেকআপ হবে সামন্তদা?'

'সিম্পল। সাধারণ।'

একটা ছোট তোয়ালের মধ্যে কিছু ঢেলে এগিয়ে দিল মদন, 'আপনি মুখ এবং হাত ভাল করে মুছে নিন।'

অভিনেত্রী সামন্তকে জিজ্ঞাসা করল, 'নতুন মনে হচ্ছে!'

সামন্ত মাথা নাড়ল। অভিনেত্রী আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ ছবি?'

'ছবি-টবি ঠিক হয়নি। স্ক্রিন টেস্ট হবে।'

'অ। তাই বল। যাই স্যুটিং করতে যাই।' অভিনেত্রী বেরিয়ে গেল।

অদিতির মেকআপ করতে করতে মদন বলল, 'দ্যাখো সামন্তদা, আজ আমি অন্য ছবির কাজ করছি, শুধু মিলনদার রিকোয়েস্টে এটা করে দিলাম। মিলনদা ছবি শুরু করলে যেন আমি বাদ না যাই।'

'না না। মেকআপম্যান হিসেবে তুমি মিলনদার ফার্স্ট চয়েজ।'

মিনিট পঁচিশেক বাদে আয়নায় নিজেকেই চিনতে পারছিল না অদিতি। তাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছে। যারা তাকে সুন্দরী বলত তারাও এখন চমকে যাবে।

মদন জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক আছে দিদি?'

সে কোন উত্তর দিতে পারল না।

সামন্তর সঙ্গে মেকআপ রুম থেকে হেঁটে সে যখন ফ্লোরে যাচ্ছে তখন বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলোর চোখের দৃষ্টি দেখে মাথা নামাল। সবাই যেন তাকে গিলে খেতে চাইছে। হঠাৎ অদিতির মনে হল সে যে শাড়ি পরে এসেছে সেটা তার মেকআপের সঙ্গে মানাচ্ছে না। কিন্তু তার সঞ্চয়ে যে দামী শাড়ি নেই এটা মেনে

নেওয়া ছাড়া উপায় কি।

যাকে গুদামঘর ভেবেছিল সেরকম একটির দরজা দিয়ে সামন্ত তাকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল। অদিতি দেখল তারা খুব বড়লোকের ড্রইং রুমে ঢুকে পড়েছে। দামী সোফা, কার্পেট, টিভি, পিয়ানো। সাধারণ একটা আলো জ্বলছে সেখানে। মিলন এগিয়ে এল। ভাল করে অদিতির মুখ লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি আমার সঙ্গে এসো।'

ওপাশে একটা পর্দা ঝোলানো দরজা ছিল। সেখানে পৌঁছে মিলন বলল, 'তুমি ওই দরজার বাইরে চলে যাবে। আমি অ্যাকশন বলামাত্র ধীরে ধীরে ভেতরে ঢুকবে। তারপর ওই টেবিলের ওপর রাখা টেলিফোনটার দিকে তাকাবে। ধরে নেবে টেলিফোনটা বাজছে। এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বলবে, হ্যালো, কাকে চান? হ্যাঁ, আমি অদিতি বলছি। কি বলবে?'

'হ্যালো? কাকে চান? হ্যাঁ, আমি অদিতি বলছি।'

'গুড। নার্ভাস হওয়ার কোন কারণ নেই। যাও চলে যাও।'

পর্দার বাইরে চলে এল অদিতি। সে ভেবেছিল এদিকেও ঘর আছে। কিন্তু দেখল সব ভোঁ ভাঁ। কিছু তার, লোহার বিম পড়ে আছে, গুদাম ঘরে যেমন থাকে। তারপরই সে চিৎকার শুনতে পেল, 'লাইটস!' সঙ্গে সঙ্গে প্রচুর আলো জ্বলে উঠল ঘরের ভেতরে, বাইরে দাঁড়িয়ে সেটা টের পেল অদিতি। 'সাউন্ড।' চিৎকার মিলিয়ে যেতে না যেতে মিলন বলল, 'অ্যাকশন!'

পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই হকচকিয়ে গেল অদিতি। জোরালো আলো চোখে পড়তে সব যেন ধাঁধিয়ে গেল। সে চোখে হাত রাখতে মিলন চিৎকার করে উঠল, 'কাট, কাট। লাইটস অফ!' তারপর ছুটে এল সে, 'কি হল? তুমি চোখে হাত রাখলে কেন?'

চোখে আলো পড়ছিল। মিনমিন করল অদিতি।

'বাঃ, মুখে আলো না ফেললে ছবি উঠবে কি করে? যাও, আবার যাও, খবরদার আলোর দিকে তাকাবে না, যা বলেছি তাই কর।'

এবার কেমন যেন ঝিম্‌ঝিম্‌ করতে লাগল শরীর। অদিতি আবার দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়াল, তার ঘাম হচ্ছে কেন? আঁচলটা তুলতে না তুলতেই কানে এল মিলনের গলা, 'অ্যাকশন।'

সঙ্গে সঙ্গে পর্দা সরিয়ে ঘরে ঢুকতেই মনে হল কানের পাশ দিয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। তার হাতে যে আঁচলের প্রান্ত তখনও ধরা ছিল সে খেয়ালই করেনি, সেটা গালে চেপে ঘাম মুছতে যেতে মনে পড়ল টেলিফোনের দিকে তাকাতে হবে। সে তাকাল। আলোর হুমকি উপেক্ষা করে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে স্পষ্ট গলায় বলল, 'হ্যালো! কাকে চান? হ্যাঁ, অদিতি বলছি।'

'কাট্‌। লাইটস অফ। অদিতি তুমি বাইরে গিয়ে দাঁড়াও। সামন্ত, ওর মেকআপ তুলে দিতে বল।' মিলনের কথা শেষ হওয়ার আগেই জোরালো আলো নিভে

গেল। ধীরে ধীরে বাইরে বেরিয়ে আসতেই সামন্ত বলল, 'চলুন।'

যে টিভি সিরিয়ালের স্যুটিং ওই ফ্লোরে চলছিল সেটা লাঞ্চের জন্যে আধঘণ্টা বিরতিতে ছিল। মিলনকে খাতির করে ওরা অদিতির ছবিটা তুলে দিয়েছে। ওদের সাউন্ড রেকর্ডিস্ট বলল, 'মনিটরে ছবিটা দেখে নিতে পারেন।'

ইউম্যাটিক ক্যাসেটে তোলা ছবি বাড়ির ভিসিপিতে দেখা যাবে না। সেটা ট্রান্সফার করিয়ে নিতে হবে হাফ ইঞ্চিতে। এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব নয়। এদের স্যুটিং শেষ হলে এডিটিং রুমে গিয়ে করা যেতে পারে।

মিলন ঘাড় নাড়তেই ছেলেটি ছবি চালু করল। এখন ফ্লোরে জনা পাঁচেক লোক। মনিটরে দেখা গেল ঘরটা। তারপর পর্দা সরিয়ে অদিতি ঢুকল। আঁচলে ঘাম মুছল। টেলিফোনের দিকে এগিয়ে গিয়ে সংলাপ বলল।

মিলন বলল, 'আবার চালাও।'

ছবিটা দ্বিতীয়বার দেখানো হতে বাকি চারজন গুঞ্জন করে উঠল। সাউন্ড রেকর্ডিস্ট জিজ্ঞাসা করল, 'ঘাম মোছার বিজনেসটা কি আপনি বলে দিয়েছিলেন দাদা?'

'না।' মিলন উঠে দাঁড়াল।

একজন লাইটবয় বলে উঠল, 'মার কাটারি ব্যাপার হয়ে যাবে। নতুন বলে মনেই হচ্ছে না। যেমন ফিগার তেমনি কথা বলার ধরন।'

এর পরের দশ মিনিট খুব দ্রুত কাটলো। প্রযোজককে ডেকে এনে দেখাল মিলন। দেখার পর প্রযোজক জিজ্ঞাসা করল, 'এইটুকু?'

'স্ক্রিন টেস্ট এর বেশি হয় না।' তখন মিলনের বুকের ভেতর উত্তেজনা ফেঁপে ফুলে উঠছে অথচ সে প্রাণপণে চেষ্টা করছে নিজেকে নির্লিপ্ত রাখতে, 'কি রকম লাগল, বলুন।'

'আমি কি বলব! আমার চেয়ে আপনারা অনেক অভিজ্ঞ!'

'মেয়েটিকে দেখে আপনার কেমন লেগেছে তাই বলুন?'

'ভাল, খুব ভাল। তাই তো আর একটু দেখতে ইচ্ছে করছিল।'

'চলুন, বাইরে যাই।'

অফিসের দিকে যেতে যেতে মিলন প্রযোজককে বলল, 'যদি এর মাথা না বিগড়ে যায় তাহলে আমি ভবিষ্যদ্বাণী করছি, মেয়েটি একদিন বাংলা ফিল্মের এক নম্বর নায়িকা হবেই। এত সহজ সফ্‌ট ব্যাপার নতুনদের মধ্যে পাওয়া যায় না।'

প্রযোজক বললেন, 'ওসব আমি ঠিক বুঝি না মশাই, তবে দেখে চোখের আরাম হল। এখন বাংলা ছবিতে একই মুখ, একই কথা, একই হাসি দেখতে দেখতে ঘুম পেয়ে যায়। তা থেকে এ বাঁচাবে।'

অফিসে বসে মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'একে যদি নায়িকার চরিত্রে নির্বাচিত করি তাহলে আপনার আশা করি আপত্তি নেই?'

'আপত্তি মানে? এই যে আজ আপনার সঙ্গে ছবি নিয়ে কথা বলছি, যেদিন ছবি শেষ হবে তার আগে আর একটাও কথা বলব না।'

'সেকি? কেন? আপনার টাকা!'

'দূর! রাখুন টাকা। আপনার ওপর আজ থেকে আমার সেন্ট পার্সেন্ট আস্থা রইল। হ্যাঁ, একটা কথা, আপনাদের এই লাইন খুব খারাপ, মেয়েটার সঙ্গে একটা চুক্তি করে নিন, আমাদের ছবি রিলিজ হওয়ার আগে ও অন্য কোন ছবিতে অভিনয় করবে না। আমরা যেহেতু সুযোগ দিচ্ছি তাই এই দাবি করতেই পারি।'

মিনিট পাঁচেক বাদে অদিতি যখন অফিস ঘরে এসে বসল তখন তার মুখে মেকআপ না থাকলেও বেশ ছিমছাম দেখাচ্ছিল।

মিলন বলল, 'অদিতি, তোমার কি রকম লাগল বল?'

অদিতি মাথা নামাল, 'প্রথমটা আমি ঠিক বুঝতে পারিনি।'

মিলন হাসল, 'সেটা ঠিক আছে, কুড়ি বছর কাজ করেও অনেকে ওইরকম বুঝতে পারে না। শোনো, ইনি আমাদের প্রযোজক, অনেক ভাল ছবি এর আগে করেছেন, আমরা তোমাকে নতুন ছবির নায়িকা চরিত্রে নির্বাচন করেছি।' কথাগুলো বলে মিলন হাত বাড়িয়ে দিতেই দেখল অদিতি দু-হাতে নিজের মুখ ঢেকে ফেলেছে। থরথর করে কাঁপছে সে। মিলন প্রযোজকের দিকে তাকাতে তিনি ইশারায় জানালেন চুপ করে থাকতে।

মিনিট খানেকের মধ্যে নিজেকে সামলে নিতে পারল অদিতি। তারপর উঠে এল। মিলন প্রতিবাদ করার আগেই প্রণাম করে বলল, 'আপনারা আশীর্বাদ করুন যেন ভালভাবে কাজ করতে পারি।'

প্রযোজক প্রণাম নিলেন না। অদিতি চেয়ারে ফিরে গেলে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় থাকো?'

'একটা মেয়েদের মেসে।'

'তোমার বাবা-মা?'

'ওরা কৃষ্ণনগরে থাকে।'

'এখানে কি কর?'

'সেলস গার্লের চাকরি করি।'

'মাই গড! চাকরিটা তোমাকে ছাড়তে হবে অদিতি। আর যত তাড়াতাড়ি পার মেস ছেড়ে দাও। সিনেমার নায়িকারা কেউ মেসে থাকে না। এই ছবিতে অভিনয় করছ বলে তুমি তিরিশ হাজার টাকা পাবে। আজ পাঁচ হাজার টাকা অ্যাডভান্স হিসেবে নিয়ে যাও। তোমার সঙ্গে শর্ত হল, আমাদের ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত তুমি অন্য কোন ছবিতে অভিনয় করবে না। স্টুডিওতে যখনই আসার দরকার হবে ট্যাক্সিতে আসবে। আমাদের লোক ভাড়াটা দিয়ে দেবে। যতদিন কাজটা শেষ না হয় ততদিন শরীরের যত্ন নেবে। যাতে অসুস্থ হয়ে না পড়।' ব্রিফকেস থেকে টাকা বের করলেন প্রযোজক। পাঁচ হাজার টাকা।

[নয়]

কথা হয়ে গেল। রোজ সকালে অদিতি মিলনের বাড়িতে আসবে। সেখানে বসে রিহার্সাল দেবে, কি করে ভাল অভিনয় করতে হয় বুঝে নেবে। অনুশীলন না করলে কখনও সাফল্য পাওয়া যায় না। অভিনয়ের কথা উঠলে অনেকেই ভাবে, কী আর শক্ত ব্যাপার? সংলাপ মনে রেখে বলে গেলেই হয়। সাঁতার সম্পর্কে এই রকম একজন বলেছিল। জলে নেমে হাত-পা ছুঁড়ে এগিয়ে গেলেই সাঁতার কাটা হয়ে যাবে। তাকে জলে না নামানো পর্যন্ত তার শিক্ষা হয়নি।

মিলন অদিতিকে পরামর্শ দিল, 'ঘুম থেকে উঠে ফ্রেশ হয়ে আয়নার সামনে বসবে। নিজেকে দেখবে। তোমার মুখের কোন্ জায়গাটা ভাল লাগছে, কোন্ জায়গা ঠিক পছন্দ হচ্ছে না তা নিজে আবিষ্কার করবে। তারপর রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা খুলে 'বিদায় অভিশাপ' কবিতাটা পড়বে। ওখানে কচ এবং দেবযানী পরস্পরের সঙ্গে কথা বলছে। এই সংলাপ কবিতায় হলেও বলতে কোন অসুবিধে হবে না। মানুষের মনের নানারকম ভাব কবিতার লাইনে লাইনে ছড়ানো। বলার সময় তুমি আয়নায় নিজেকে লক্ষ্য করবে। কোন্ সংলাপ কিভাবে বললে মানে স্পষ্ট হয় তা তুমি নিজেকে দেখেই বুঝতে পারবে। বেশ জোরে স্পষ্ট উচ্চারণ করবে যাতে জিভের জড়তা কেটে যায়।'

চুপচাপ শুনছিল অদিতি, এবার মুখ নামাল।

'কি হল?' প্রযোজক জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি মেসের যে ঘরে থাকি সেখানে অন্য বোর্ডারও থাকে। তারা এসব করলে বিরক্ত হবে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি এটা করা দরকার।'

প্রযোজক বললেন, 'ঠিক আছে, 'দাঁড়াও দেখি তোমার জন্যে ওয়াই ডব্লু সি এ-তে সিঙ্গেল রুম যোগাড় করে দিতে পারি কিনা।'

সামন্ত তার সমস্ত ঠিকানা লিখে নিল।

মহরতে প্রযোজক বিশ্বাস করতেন না তাঁর বক্তব্য, 'মহরৎ আবার কি? ছবি করতে হলে একবারে স্যুটিং শুরু করুন।'

অদিতি উঠে দাঁড়ালে তিনি বললেন, 'দাঁড়াও ভাই।'

অদিতি দাঁড়াল। আবার কি হল? এদের মতটা বদলে যাবে না তো!

প্রযোজক মিলনকে বললেন, 'কী, কই, ওর একটা ফটো সেসন করুন।'

'ফটো সেসন?' মিলন অবাক।

'হ্যাঁ। বিভিন্ন পোশাকে যতটা পারেন গ্ল্যামারাস ফটো তুলিয়ে নিন। সেগুলো দিয়ে প্রেসকে চমকে দেব।' প্রযোজক চোখ বন্ধ করলেন।

'আপনি প্রেসকে বলবেন?'

'হ্যাঁ। নতুন মেয়ে নায়িকা হচ্ছে, আমি প্রথম থেকেই পাবলিসিটি করতে চাই। ওর ছবি সামনের সপ্তাহেই সব কাগজে ছাপা হোক।'

'তাহলে তো মহরৎ করতে হয়।'

'কেন?'

'চিত্রসাংবাদিকদের একটু আপ্যায়ন না করলে ওঁরা খুশী হন না।'

'হুম্। ঠিক আছে। মহরৎ করুন।' প্রযোজক উঠে গেলেন।

হেসে ফেলল মিলন। এত দ্রুত মানুষটা বদলে যাবে সে কল্পনা করেনি। অদিতিকে নির্বাচন করে সে ভদ্রলোককে খুশী করতে পেরেছে, এটা কম কথা নয়।

অদিতি তখনও দাঁড়িয়েছিল। এঁদের কথাবার্তা সে ঠিক বুঝতে পারছিল না। মিলন সামন্তকে বলল, 'কালই ওর ছবি তোলার ব্যবস্থা কর।'

সামন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'তারাদাসকে খবর দেব?'

'উঃ, সামন্ত!' বিরক্ত হল মিলন, 'তারাদাস হল একজন স্টিল ফটোগ্রাফার। আমাদের চাই কোন বিখ্যাত ফটোগ্রাফার যার হাতে জাদু আছে এবং স্টুডিওর মালিক।'

'অ! তাই বলুন। কানাই ঘোষকে বলব?'

'গুড। বল। টাইমটা জেনে নিয়ে ওকে বলে দাও।'

সামন্ত ছুটল টেলিফোন করতে। মিলন বলল, 'অদিতি, তোমার ভাল জামাকাপড় খুব বেশি নেই, না?'

অদিতি মাথা নামাল, উত্তর দিল না।

'ঠিক আছে। আমাদের ড্রেসার তোমার মাপ নিয়ে নিচ্ছে। কাল সেগুলো পেয়ে যাবে। আগামীকাল তোমার ছবি তোলা হবে।'

'কেন?'

'পাবলিসিটির জন্যে। এ লাইনে পাবলিসিটি হল প্রথম এবং শেষ কথা। বিভিন্ন পোশাকে তোমার ছবি তোলা হবে। সেগুলো কাগজে ছাপা হলে লোকে তোমার নাম জানতে পারবে।'

অদিতি মুখ তুলল, 'আমি—!'

মিলন অবাক হল, 'কিছু বলবে?'

অদিতি বলল, 'গতকালও আমি কল্পনা করিনি আজ আমি এখানে পৌঁছাব। এসবই আপনার জন্যে হল।'

'কিছুই হয়নি অদিতি। এখন মন দিয়ে কাজটা করার চেষ্টা কর। সাফল্য পেলে তবে এসব কথা বলার মানে হবে। আর আমার জন্যে তো কিছু হয়নি, তোমার বউদি যদি জিনিসগুলো রেখে দিয়ে তোমাকে পরে আসতে না বলতেন তাহলে আমার সঙ্গে যোগাযোগ হত না। অতএব, যদি কিছু হয়ে থাকে তাহলে তাঁর জন্যেই হয়েছে।' মিলন হাসল।

সামন্ত ফিরে এসে খবর দিল, 'আগামীকাল বিকেল পাঁচটায় টাইম দিয়েছেন

কানাইদা। ওর স্টুডিও হল পূর্ণদাস রোডে।' ঠিকানাটা বুঝিয়ে দিল সামন্ত।

ড্রেসারকে জামাকাপড়ের মাপ দিয়ে সামন্তর ডেকে দেওয়া ট্যাক্সিতে উঠে বসল অদিতি। ট্যাক্সি যখন স্টুডিওর গেটের দিকে যাচ্ছে তখন সে সোজা হয়ে বসল। বসন্ত চৌধুরী। এখন বয়স হলেও সুন্দর চেহারা রেখেছেন। সুচিত্রা সেনের সঙ্গে দীপ জ্বেলে যাই ছবিতে উনি অভিনয় করেছেন। ছবিটার কথা মনে আছে তার।

গন্তব্যস্থান বলে ট্যাক্সিতে হেলান দিয়ে বসেছিল অদিতি। কোথা থেকে কি হয়ে গেল। ভাল হচ্ছে কিনা জানা নেই তবে ফিরিওয়ালী হয়ে দরজায় দরজায় ঘুরতে হবে না আর। কিছুদিন অন্তত পরিশ্রম এবং অপমান থেকে সে বেঁচে গেল। এক একজন মহিলা কী বিশ্রী প্রশ্ন করতেন, সত্যি কথা বলো তো তোমার মতলব কি? এমন সুন্দর চেহারা নিয়ে তুমি ফিরি করতে বেরিয়েছ?

তখন অপমানিত হয়েও চুপ করে থাকতে হত।

হঠাৎ মনে হল তার ব্যাগে কড়কড়ে পাঁচ হাজার টাকা আছে। এটা যে স্বপ্ন নয় তার প্রমাণ। সে যখন কলকাতায় এসেছিল তখন এই টাকার কথা ভাবতেও পারত না। ট্যাক্সিটাকে সে ঘুরিয়ে নিয়ে চলে এল সেই কোম্পানিতে যেখানে সে সেলসগার্লের কাজ করত। হ্যাঁ, এই কোম্পানির কাছেও সে কৃতজ্ঞ। কৃষ্ণনগর থেকে কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে অনেক জায়গায় দরখাস্ত করেছিল কেউ তো জবাব দেয়নি। কিন্তু এরা দিয়েছিল। ইন্টারভিউ নিয়ে সন্দেহ থাকা সত্ত্বেও কাজ দিয়েছিল। এই কাজটা না পেলে তাকে এখনও কৃষ্ণনগরে পড়ে থাকতে হত।

মিসেস মণ্ডল হলেন ম্যানেজার। মেয়েদের জিনিস দেওয়া এবং বিক্রির টাকা তিনিই বুঝে নেন। খুব রোগা, চল্লিশের উপর বয়স কিন্তু গলা দিয়ে বাজখাই শব্দ বের হয়। অদিতিকে দেখেই তিনি মাথা নাড়লেন, 'এই যে, আসুন। কমিশনের কাজ বলে যদি ভাবেন ইচ্ছে মতন ডুব মারবেন, কাজ করবেন না তাহলে খুব ভুল করেছেন। কোম্পানির জিনিস বিক্রি না হলে কোম্পানি চুপ করে বসে থাকতে পারে না। আমি আগেই বলেছিলাম সুন্দরী মেয়েদের দিয়ে এসব কাজ হয় না, কর্তারা শুনল না আমার কথা—।'

অদিতি হাসল, 'আপনি কিন্তু একাই কথা বলে যাচ্ছেন।'

'ও। তাই নাকি? তা আপনি কি বলতে চান বলে ফেলুন।'

'কোম্পানি আমার কাছে কত পায় আর আমি কমিশন বাবদ কত পাব যদি হিসেব করে বলেন তাহলে ভাল হয়।'

'নিশ্চয়ই। সেই হিসেব আমি করে রেখেছি। আপনার তো কিছুই পাওনা নেই, উল্টে কোম্পানি একশো নব্বুই টাকা পাবে।'

অদিতি ব্যাগ খুলে পাঁচ হাজার থেকে দুটো একশো টাকার নোট বের করে সামনে রাখল, 'ব্যস! সব শোধ হয়ে গেল?'

মিসেস মণ্ডল হতভম্ব হয়ে গেলেন, 'ব্যাপারটা কি?'

'টাকাটা নিয়ে একটা রসিদ দিন।'

ভদ্রমহিলা তাই করলে অদিতি বললেন, 'মালিকদের বলবেন অসময়ে এই কাজটা আমাকে দিয়েছিলেন বলে আমি কৃতজ্ঞ। আচ্ছা চলি।'

ট্যাক্সিতে উঠে অদিতি হেসে ফেলল। গতকালও সে পাইপয়সা হিসেব করে চলত। একশো নব্বুই বললেই সে তা মেনে দিয়ে দিত না। পুরো হিসেব চাইত। অথচ আজ দুশো দিয়ে দশ টাকা ফেরত নেওয়ার প্রয়োজন মনে করল না। কি রকম পাল্টে যায় জীবনযাপনের ধরন।

তারপরেই মনে হল চার হাজার আটশো টাকা মেসে রাখা নিরাপদ নয়। তার নিজস্ব আলমারি দূরের কথা ড্রয়ার পর্যন্ত নেই ওখানে। বড় ট্রাঙ্কে জামাকাপড় রাখতে হয়। চাবি দেওয়া থাকলেও চুরি হলে কিছু করার থাকবে না। কলকাতায় তার কোন ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই। একটা অ্যাকাউন্ট খোলা দরকার।

সামনেই একটা ব্যাংকের হোর্ডিং দেখতে পেল সে। নামী ব্যাংকের ইভনিং ব্রাঞ্চ। সিনেমায় যা ঘটে তাই যেন তার জীবনে এখন ঘটে যাচ্ছে। ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়ে সে ব্যাংকে ঢুকল। অ্যাকাউন্ট খুলতে চাইলে সমস্যা হল রেফারেন্স নিয়ে। ওই ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট আছে এমন কাউকে দরকার।

অদিতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, এই ব্যাংকে প্রথম যিনি অ্যাকাউন্ট খুলেছিলেন তাঁকে রেফার করেছিল কে? তখন তো কারও কোন অ্যাকাউন্ট ছিল না এখানে?'

প্রশ্নটা অফিসারদের খুব পছন্দ হল। ওদের একজন সই করে দিতে অদিতি পুরো চার হাজার টাকা ব্যাংকে জমা দিয়ে পাস বই নিয়ে বেরিয়ে এল। পাস বইতে তার নাম লেখা। ঠিকানাটা মেসের। এটা দেখলেই বুকের ভেতর আলাদা শক্তি জমা হয়।

মেসে ফিরে গিয়ে কাউকে কোন কথা বলল না অদিতি। এসব কথা শুনলে হয় ওরা অবিশ্বাস করবে নয় নিজের মত গল্প তৈরি করবে। এ ঘরের বাকি মেয়েদের দুজন নিত্যনতুন বয়ফ্রেণ্ড পাল্টায়। তাদের কাছে টাকা পয়সা নেয় অথচ ভাবভঙ্গিতে সবসময় সতীপনা বজায় রাখে।

পরদিন বিকেলে ট্যাক্সি নিয়ে কানাই ঘোষের স্টুডিওতে পৌঁছে গেল অদিতি। স্টুডিওর বাইরে দাঁড়িয়েছিল সামন্ত, বলল, 'ঠিক সময়ে এসে গেছেন। কিন্তু আমি ভবিষ্যৎবাণী করছি সামনের বছরে ঠিক সময়ে আসবেন না।'

'কেন?' খুব অবাক হল অদিতি।

'কারণ তখন আপনি স্টার হয়ে যাবেন।' সামন্ত দাঁত বের করল।

[দশ]

এত দ্রুত তার সঠিক মাপে পোশাক তৈরি হয়ে আসবে ভাবতে পারেনি অদিতি।

মিলন তাকে কানাই ঘোষের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। কানাইবাবুর বয়স পঞ্চাশের ওপরে। ছিমছাম চেহারা। প্রায় তিরিশ সেকেন্ড তার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একটু আলোর সামনে এসে দাঁড়াও ভাই। এখানে।'

কয়েক পা এগিয়ে যেতেই মুখে আলো পড়ল। কানাইবাবু তার মুখের দিকে এমনভাবে তাকালেন যে অস্বস্তি হচ্ছিল অদিতির। মিনিটখানেক ধরে বিভিন্ন দিক দিয়ে তাকে দেখে কানাইবাবু ডাকলেন, 'হরগোবিন্দ।'

সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এক কোণে বসে থাকা একটা লোক এগিয়ে এল। কানাইবাবু অদিতির বাঁ হাতের নিচে আঙুল রাখল, 'এই জায়গাটা দ্যাখো। এটাকে একটু মারতে হবে। চিবুকের পাশে একটা সরু লাইন আসছে, দেখতে পাচ্ছ? পাচ্ছ না? দাঁড়াও।' জায়গাটায় চাপ দিলেন কানাইবাবু, 'দ্যাখো, চুলের মত একটা লাইন। আমি চাই না ক্যামেরায় এটা আসুক। ব্যাস, এইটুকু আপাতত কর। হালকা মেকআপ চাই। হেয়ারড্রেসার?'

একজন মহিলা এগিয়ে এলেন, 'বলুন।'

'কপালটা একটু মারতে হবে। লঙ হেয়ার, খোলা চুল। বাজে উইগ্ হলে আমার দরকার নেই।' কানাইবাবু বললেন।

'না না। বম্বে থেকে আনানো হয়েছে।'

'ড্রেসার?'

'হ্যাঁ দাদা।' তৃতীয়জন জানান দিল।

'ওই গোল্ডেন কালার শাড়িটার সঙ্গে ব্লাউজ। ঠিক আছে? আমি আধ ঘণ্টার মধ্যে ক্যামেরা খুলতে চাই।' হুকুম করলেন কানাইবাবু।

পরপর কি যে হয়ে গেল তাল মেলাতে পারছিল না অদিতি। প্রথমে মেকআপম্যান তার জামার ওপর অ্যাপ্রন চাপিয়ে হাত গলা মুখে রঙ মাখাল। সে যেন পুতুল এমন ভঙ্গি লোকটার। কৃষ্ণনগরে ঠাকুরের মূর্তি গড়ার সময় যেমন নাক মুখ চিবুকের কাজ করা হয় তেমনি এই লোকটা তাকে ব্যবহার করল। তারপর উইগ্ পরাল হেয়ার ড্রেসার। শেষে পাশের ঘরে গিয়ে শাড়ি, সায়া পরে আসতে বলল ড্রেসার। এসব হয়ে যাওয়ার পর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে চমকে উঠল অদিতি। এ কাকে দেখছে সে? এই কি অদিতি? কৃষ্ণনগর থেকে কলকাতায় এসে মেসে উঠে সেন্ট পাউডার বাড়িতে বাড়িতে সে ফিরিওয়ালার মত বিক্রি করেছে? না। অসম্ভব। কোন মিল নেই তার সঙ্গে। আয়নায় যে এখন রয়েছে সে যেন নেমে এসেছে নন্দনকানন থেকে।

'চলুন দিদি। কানাইদা খুব টাইম মেনে চলেন।' পাশের ঘরে ঢুকতেই মিলনের গলা থেকে বেরিয়ে আসা স্বর শুনতে পেল অদিতি, 'বাঃ।'

কানাইবাবু চোখ ছোট করে পরীক্ষা করলেন। তারপর বিভিন্ন ভঙ্গি দেখিয়ে দেখিয়ে ছবি তোলা শুরু করলেন। একই ভঙ্গিতে অন্তত দশ-দশটা ছবি তুললেন তিনি। শেষে পাশ ফিরিয়ে দাঁড় করিয়ে বললেন, 'ধরুন, কোন কিছু দেখে আপনি অবাক হয়ে গেছেন। আপনার আঁচল কাঁধ থেকে খুলে হাতের ওপর পড়ে আছে। এই শর্টটা দিন।'

হঠাৎ সমস্ত শরীরে বিদ্যুৎ বয়ে গেল। আঁচল হাতের ওপর পড়ে গেলে তো ব্লাউজ দেখা যাবে। ইনি কি বলছেন?'

কানাইবাবু বললেন, 'ভাই, সঙ্কোচ করবেন না। আপনার ছবি দেখে যারা ফ্যান হবে তারা তো মুখ দেখে সন্তুষ্ট হওয়ার পাত্র নয়। আপনি যে স্বাস্থ্যবতী এটা ওদের জানা দরকার। আর কথা দিচ্ছি ছবি দেখে অশ্লীল বলে মনে হবে না যদি আপনার এক্সপ্রেশন ঠিক হয়। এইভাবে দাঁড়ান। হ্যাঁ। চিবুক একটু তুলে ডানদিকে তাকান। চোখের পাতায় বিস্ময়, ঠোঁট একটু চাপা হবে। হ্যাঁ, গুড এক্সপ্রেশন হোল্ড করুন। হাতটা কোমরের একটু ওপরে ভাঁজ করে রাখুন।'

হাতটা তুলতেই কানাইবাবু কাঁধ থেকে আঁচল সরিয়ে হাতের ওপর ফেলে দিতেই অদিতির মনে হল লজ্জায় সে মরে যাবে। এইভাবে শুধু ব্লাউজ পরে সে মায়ের সামনেও কোনদিন দাঁড়ায়নি।

'ঠোঁটের এক্সপ্রেশন চলে গেল কেন?' কানাইবাবু চিৎকার করতেই সজাগ হল অদিতি। সে চেষ্টা করল। কানাইবাবু বললেন, 'আগের মত হচ্ছে না। আরে ভাই ভুলে যান আপনার আঁচল পড়ে গেছে। ওদিকে মন আছে বলে এক্সপ্রেশন দিতে পারছেন না। হ্যাঁ। গুড!'

খট্ খট্ করে শাটারের আওয়াজ হতে লাগল। তারপর কানাইবাবু চিৎকার করলেন, 'লাইটস অফ।'

বড় আলো নেভার আগেই অদিতি আঁচল টেনে নিল। কানাইবাবু চেঁচালেন, 'ড্রেসার, জিনস আর টি শার্ট। হেয়ার ড্রেসার, কাঁধ অবধি স্ট্রেট চুল।'

পাশের ঘরে নিয়ে গিয়ে ড্রেসার বলল, 'দিদি, চেঞ্জরুমে গিয়ে প্যান্ট আর শার্ট পরে আসুন।' হেয়ার ড্রেসার লম্বা উইগ্ খুলে নিল।

'প্যান্ট? আমি জীবনে পরিনি।' আঁতকে উঠল অদিতি।

'আপনার ফিগার তো ভাল, পরলে ভাল লাগবে।'

নিতান্ত অনিচ্ছায় পাশের ঘরে গেল অদিতি। জামা কাপড় খুলে ওগুলো পরতেই কেমন আড়ষ্ট হয়ে গেল। কিন্তু মেকআপ রুমে ফিরে আসামাত্র হেয়ার ড্রেসার মেয়েটি বলে উঠল, 'খুব স্মার্ট দেখাচ্ছে আপনাকে। নিন, এই চুলটা আপনাকে পরিয়ে দিই।'

এসব শেষ হলে আয়নায় যাকে দেখল তার সঙ্গে একটু আগের মেয়েটির কোন

মিল নেই। অত্যন্ত মড একটি তরুণী এখন আয়নায়।

কানাইবাবু খুশি হলেন দেখে। গোটা দশেক বিভিন্ন ভঙ্গিমার ছবি তোলার পর বললেন, 'চলে যাচ্ছে কিন্তু ভাই তুমি নিশ্চয়ই এসব পরতে অভ্যস্ত নও?'

মাথা নাড়ল অদিতি, 'না।'

'কিন্তু ছবিতে অভিনয় করতে হলে প্রয়োজনে এসব পরতে হবে। তোমার যদি অভ্যাস না থাকে তাহলে দর্শকদের কনভিন্স করতে পারবে না। সুতরাং বাড়িতে প্যান্ট শার্ট পরা অভ্যেস করো।' কানাইবাবু চোখ বন্ধ করলেন, 'এবার আমি তোমার কয়েকটা ক্লোজআপ নেব। তুমি টি-শার্টের প্রথম দুটো বোতাম খুলে ফ্যালো।'

'কেন?' আঁতকে উঠল অদিতি।

কানাইবাবু চোখ খুললেন, 'ছবিতে সুন্দর দেখাবে বলে।'

'না, আমি পারব না।' তীব্র প্রতিবাদ করল অদিতি।

কানাইবাবু এতক্ষণে মিলনের দিকে ঘুরে তাকালেন। ঘরের এক কোণে চেয়ারে চুপচাপ বসেছিল মিলন। চোখের সামনে অদিতির রূপান্তর দেখে সে একসঙ্গে অবাক এবং খুশী হয়েছিল। মিলন দেখল কানাইবাবু কোন কথা না বলে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

মিলন উঠল, 'অদিতি, তুমি ফিল্ম পত্রিকায় নায়িকাদের ছবি দ্যাখোনি?'

অদিতি জবাব দিল, 'না।'

মিলন বলল, 'পরিচালক হিসেবে আমি নিজে কোন অশ্লীল দৃশ্য ছবিতে রাখি না, তাই তোমাকেও অনুরোধ করব না অশ্লীলতায় যেতে। কিন্তু আজকাল যে কোন ককটেল পার্টিতে মহিলারা যেভাবে সেজে আসেন তা করতে আপত্তি করছ কেন?'

কানাইবাবু বললেন, 'তুমি যদি মুম্বাইতে ফিল্মে নাচতে যেতে তাহলে তো এক পাও হাঁটতে পারতে না। ওরা আগে ফিগার দেখতে চায়। সেই ফিগারে দুটোর বেশি তিনটি সুতো থাকলে চলবে না। এই কলকাতায় আমার কাছে ছবি তুলতে এসে মেয়েদের অনেকেই বলে, একটু সেক্সি ছবি তুলে দিন। মাথা থেকে পা কোথায় তাদের সেক্স আছে খুঁজতে খুঁজতে আমাকে হিমশিম খেতে হয়। ঠিক আছে, পেছন ফেরো।'

অদিতি ক্যামেরার দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। কানাইবাবু এদিকে এসে টি-শার্টের প্রান্ত গুটিয়ে কোমরের ওপর তুলে বেঁধে দিল দু-প্রান্ত। তারপর ক্যামেরায় ফিরে গিয়ে বললেন, 'বাঁ পায়ের ওপর দাঁড়াও। গুড। এবার ডান পায়ের ওপর শরীরের ভর রাখো। বাঃ। এবার তোমার সামনে হাঁটো। ওকে। এবার ফিরে এসো। নিচু হও, যেন কিছু কুড়োতে যাচ্ছ, হ্যাঁ, এই সময় তোমাকে কেউ ওপর থেকে ডাকল, কি করবে? ওই ভঙ্গিতে মুখ তুলে তাকাবে। তাকাও।' বলতে বলতে অদিতির সামনে চিৎ হয়ে শুয়ে পড়লেন কানাইবাবু। পটাপট ছবি তুলতে লাগলেন তিনি।

পোশাক পাল্টে মেকআপ তুলে অদিতি যখন মিলনের সামনে এসে দাঁড়াল তখনও তাকে বেশ ঝকঝকে দেখাচ্ছিল। কানাইবাবু ব্যস্ত হয়ে গেলেন তোলা ছবির হিল্লে করতে। ডার্করুমে ঢুকে গেলেন তিনি।

অদিতি বলল, 'আমি পারলাম না, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

চট করে বুঝতে পারল না মিলন, 'কি পারলে না?'

'ওই যে, উনি যেভাবে ছবি তুলতে বললেন!'

'ও। ঠিক আছে, এ নিয়ে ভাবার কোন কারণ নেই। সুচিত্রা সেনও কখনও ওইসব ছবি তুলতে দেননি। তাঁর মত অভিনেত্রী অভিনয় দিয়ে এসব অতিক্রম করতে পেরেছিলেন। তোমাকেও সেই চেষ্টা করতে হবে।'

অদিতি কোন কথা বলতে পারল না। তার আচরণে কানাইবাবু যে খুশী হননি এটা স্পষ্ট; কিন্তু মিলনের মনের ভাব সে বুঝতে পারছিল না।

একটু পরে কানাইবাবু তার ডার্করুম থেকে বেরিয়ে এলেন, 'ওকে। সব ঠিক আছে। আমি কালই প্রিন্ট পাঠিয়ে দেব মিলনবাবু।'

'আপাতত পোস্টকার্ড সাইজ দিচ্ছেন তো?'

'হ্যাঁ, তিন কপি করে। বিলটা যেন কালই পেমেন্ট করা হয় তা দেখবেন। এই যে মাননীয়া, এর আগে এসব ছবি কখনও তুলেছ?'

'না।' অদিতি জবাব দিল।

'তাহলে আমার হাতে যাত্রা শুরু হল?'

'হ্যাঁ।'

'প্রার্থনা করি তুমি সফল হও। কিন্তু ভাই, যদি দেখি ভবিষ্যতে কোথাও কোন কাগজে বা ফিল্মে তুমি লাস্যময়ী হয়ে পোজ দিচ্ছ তাহলে তোমাকে খুব খারাপ মেয়ে বলে ভেবে নেব। যদি মত পরিবর্তন করো তাহলে অন্য কাউকে দিয়ে নয়, আমার কাছে চলে এসো। তুমি আমার মেয়ের বয়সী। আমি যখন ছবি তুলি তখন তোমাদের শরীরের দিকে তাকাই না, অন্য এক সৌন্দর্য খোঁজার চেষ্টা করি।'

জবাব দিল না অদিতি। তার কোন জবাব ছিল না।

হঠাৎ মিলন বলল, 'কানাইবাবু, বলুন তো, অদিতি নামটা নায়িকা হিসেবে লোকে কি রকম নেবে?'

'আপনি ওর নাম পাল্টাবার কথা ভাবছেন নাকি?'

'প্রযোজক বলছিলেন। ওর জীবনযাপনের তো ব্যাপক বদল হচ্ছে।'

'হোক। তবু অদিতি ইজ এ গুড নেম। ওটা বদলাবেন না।' হেসে ফেলল অদিতি। তার সব কিছু বদলে গেলেও যদি নামটা একই থাকে তাহলে মা খুব খুশী হবেন। কারণ তার নামকরণ মা করেছিলেন।

[এগারো]

কৃষ্ণনগর স্টেশনে নেমে বিদায় নিল অদিতি। এখন রিকশার ভাড়া যা বেড়েছে তাতে কিছুদিন আগে নিতান্ত বাধ্য না হলে চড়ত না সে। আজ রিকশায় বসে তার আচমকা অন্যচিন্তা মাথায় এল। ধরা যাক মিলনবাবুর ছবিটা খুব জনপ্রিয়তা পেল। নায়িকা হিসেবে দর্শকরা তাকে লুফে নিল। তখন কি সে এভাবে কৃষ্ণনগর শহরে রিকশায় চড়ে যেতে পারবে? এখন কেউ তার দিকে তাকাচ্ছে না। তখন কি হবে? ভাবতেই গায়ে কাঁটা দিল অদিতির। সে চোখ বন্ধ করল। বন্ধ চোখের পাতায় দৃশ্যটা আপনা থেকেই ভেসে উঠল যেন, একটা গাড়ি হুশ্ করে বেরিয়ে গেল রাস্তা দিয়ে। গাড়ির ভেতর কাচ তুলে বসে আছে নায়িকা অদিতি।

'দিদি কোন্ দিকে যাব?'

রিকশাওয়ালার কথায় সম্বিত ফিরল তার। তাড়াতাড়ি বলল, 'বাঁ দিকে।' বলেই কি রকম সঙ্কোচ হল। অকারণে আঁচল টানল সে।

দরজা খুলে বাবা অবাক, 'কিরে? চলে এলি?'

খুব রাগ হয়ে গেল অদিতির। তাকে দেখে যেন বাবা খুশী হয়নি। সে পাল্টা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন? আসতে নেই?'

'না না। নতুন চাকরি। ছুটি পেলি?'

ঘরে ঢুকে অদিতি বলল, 'চাকরিটা ছেড়ে দিয়েছি।'

'সর্বনাশ! চাকরি ছেড়ে দিলি? কি হয়েছিল?' বাবার কথার রেশ ধরে ভেতরের দরজায় দাঁড়ানো মা বলল, 'তুই কি কোথাও একটু মানিয়ে থাকতে পারবি না? এই বাজারে কেউ চাকরি ছাড়ে? এখন মেসের টাকা দিবি কি করে?'

বাবা বলল, 'টাকা না দিলে মেস থেকে তাড়িয়ে দেবে। তখন তোকে আবার এই এখানেই ফিরে আসতে হবে।'

মা বলল, 'ভাবলাম ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। এত কষ্টের পর মেয়েটা চাকরি পেল, নিজের খরচ নিজেই মেটাতে পারবে।'

অদিতি আর সহ্য করতে পারল না, 'তোমরা থামবে?'

মা বলল, 'এই সংসার কিভাবে চলবে তা তোর অজানা নয়। তুই চাকরি করে যদি কিছু বাঁচাতে পারতিস তাহলে আমাদের উপকারে লাগত। এখন রাগ দেখিয়ে থামতে বলছিস, মন কেন তা মানবে?'

অদিতি বলল, 'মা, আমি অনেকটা দূর থেকে এসেছি। এক গ্লাস জল পর্যন্ত খেতে দাওনি তোমরা। আমি যে তোমাদের বোঝা তা সরাসরি বলে দাও না। তাহলে আর কখনও এখানে আসব না।'

মা আর কথা না বাড়িয়ে ভেতরে চলে গেলে অদিতি বেতের চেয়ারে বসে

পড়ল। চেয়ারটা পুরনো, অনেক জায়গায় বেত খুলে এসেছে। পিঠে লাগে বলে মা একটা চাদরের টুকরো দিয়ে আড়াল করেছে। খুব বিমর্ষ মুখে বাবা দ্বিতীয় চেয়ারে বসে বলল, 'কমলেন্দু এসেছিল।'

বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠল অদিতির। তার তো এ বাড়িতে আসার কথা নয়। সে কাঁপা গলায় বলল, 'কি বলল?'

'তোর খোঁজ করছিল।'

'তারপর?'

'কলকাতায় চাকরি করতে গিয়েছিস শুনে ঠিকানা চাইল।'

'দিয়েছ?'

'না দিয়ে উপায় কি?'

'তুমি আমার ঠিকানা ওকে দিয়ে দিলে?'

'বাঃ, যদি বলতাম ঠিকানা জানি না তাহলে কি বিশ্বাস করত? আমি দো-মনা করছি দেখে আমাকে ধমকাল।'

'কি চমৎকার। বাইরের একটা লোক তোমাকে এসে ধমকাল আর তুমি সুড়সুড় করে তার দাবি মেনে নিলে!' ফোঁস করে উঠল অদিতি।

এই সময় একগ্লাস জল নিয়ে এল মা, 'বাইরের লোক হলে অন্য কথা ছিল, কিন্তু জামাইকে তো কিছু বলা যায় না।'

'জামাই! ও এখনও তোমার জামাই?'

'আচ্ছা, মানলাম তোদের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে কিন্তু—!'

'মা, ছাড়াছাড়ি হওয়ার পর ওই লোকটার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। আর আমার সঙ্গে সম্পর্ক না থাকলে তোমাদের জামাই কি করে হয় এই কথাটা আমি বুঝতে পারছি না।'

'যাকগে, ওকে তো বিদায় করা গেছে।'

'এবার আমার ওখানে হাজির হবে। ওই মদোমাতাল লোকটা আমার ওপর কি অত্যাচার করত তা তোমরা ভুলে গেলে? এখনও জামা খুললে ওর অত্যাচারের চিহ্ন পিঠময় দেখতে পাবে। জানো না?' অদিতি মাথা ঝাঁকাল, 'কি চায় বলেনি?'

'বলল দরকার আছে?' বাবা বলল।

মা বলল, 'পোশাক দেখে মনে হল অবস্থা ভাল নয়।'

বাবা বলল, 'খোকা টাকা পাঠিয়েছে। মনিঅর্ডারে লিখেছে এক্সট্রা টাকা পাঠাতে পারবে না। তোর মা পড়ে শোনাল। ভেবেছিলাম চোখ দেখাতে মাদ্রাজের শঙ্কর নেত্রালয়ে যাব কিন্তু তা আর হবে না।'

'হবে।'

'হবে মানে?'

'শঙ্কর নেত্রালয়ে গিয়ে চোখের চিকিৎসা করাতে কত লাগবে?'

'আমি জানি না। তবে শুনেছি ওখানে গেলে ওরা বলে দেয়।'

'তাহলে ওখানে গিয়ে জেনে এসো। যাওয়ামাত্রই তো অপারেশন করবে না।'
'তুই যা বলছিল ভেবে বলছিস?'
'আমাকে কখনও বাজে কথা বলতে শুনেছ?' অদিতি ভেতরে চলে গেল। এই বাড়িতে ভাই-এর একটা ঘর ছিল। ভাই চাকরি নিয়ে বাইরে যেতে ওর ঘরটা পেয়েছিল সে শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরে এসে। সেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল অদিতি। আহ্ কি আরাম।
মা ঘরে ঢুকল, 'কি করে টাকার ব্যবস্থা করবি?'
'দেখি?'
'অন্তত হাজার তিন-চার লাগবে গিয়ে দেখিয়ে আসতে।'
'কবে যাবে দিন ঠিক করো।'
'হ্যাঁরে। তোর কি হয়েছে?'
'কিছু হয়েছে বলে কেন ভাবছ?'
'বুঝতে পেরেছি, জামাই, মানে ও এসেছিল বলে রেগে গিয়েছিস! তুই ভাবছিস কলকাতায় গিয়ে ও তোকে খুব বিরক্ত করবে!' মা মাথা নাড়ল, 'আমার মনে হয় ও ওসব করবে না।'
'না করলেই ভাল।'
'তুই কি আরও বড় চাকরি পেয়েছিস?'
'চাকরি আমাকে কে দেবে?'
'তাহলে মাদ্রাজে যাওয়ার টাকা কি করে দিবি?'
'দেব যখন বলেছি তখন চিন্তা করছ কেন?'

দুপুরের খাওয়া শেষ করে অদিতি বলল, 'আমি তিনটের ট্রেন ধরব।'
'আজকের রাতটা থেকে যা না।'
'ভেবেছিলাম থাকব কিন্তু আর ভাল লাগছে না।'
'ওর কথা মন থেকে মুছে ফ্যাল না।'
'ওর কথা আমার মনে নেই।'
'তাহলে?'
'বাড়িতে ঢোকামাত্র তোমরা দু'জনে এমনভাবে আমাকে আক্রমণ করতে আরম্ভ করলে যে মনে হল আমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে তোমাদের খুব বিপদে ফেলে দিয়েছি। তোমরা ভয় পেলে আবার যদি তোমাদের ঘাড়ে এসে পড়ি। অবশ্য তোমাদের দোষ নেই। অভাব মানুষকে তো স্বার্থপর করবেই। আমি কিন্তু একটা ভাল খবর দিতে এসেছিলাম।'
'মাথা ঠিক নেই রে তোর বাবার। চোখ চোখ করে ও অন্ধ হয়ে যাচ্ছিল। এবার পাগলও হয়ে যাবে। সব দেখেও তুই যদি রাগ করিস তাহলে আমরা দাঁড়াই কোথায়?' মা বলল।
'বাবার না হয় চোখ নিয়ে মাথা খারাপ, তোমার কি হয়েছিল?'

'ঠিক আছে বাবা, অন্যায় হয়ে গেছে, স্বীকার করছি। এখন তোর ভাল খবরটা কি সেটা বল।' মা হাসল।

'আমি সিনেমায় নামছি।'

'কি?'

'হ্যাঁ। প্রথমেই নায়িকার ভূমিকায়।'

সঙ্গে সঙ্গে মা চিৎকার করল, 'এই যে শুনছ? অদিতি সিনেমায় নামছে!'

বাবা দরজায় এল, 'সেকি!'

'সে কি মানে?'

'শেষ পর্যন্ত তুই চরিত্রটা নষ্ট করবি?'

'সিনেমায় নামলে বুঝি চরিত্র নষ্ট হয়?'

'হয় না? ওখানে কোন মেয়ে নিজেকে ঠিক রাখতে পারে নাকি? সিগারেট, মদ তো খেতেই হয়, সবার মনোরঞ্জন করতে করতে ছিবড়ে হয়ে যেতে হয়। তুই এই ভুল করলি?'

'আমি কোন ভুল করিনি।'

'ও কোন ভুল করেনি। যা করেছে ভেবেচিন্তে করেছে। তাহলে তোমাকে মাদ্রাজে যাওয়ার জন্যে টাকা দিতে পারত না। হ্যাঁরে, সিনেমার নায়িকা হলে কত টাকা পাওয়া যায়?'

'শুরুতে কম। কুড়ি-পঁচিশ হাজার।'

'বাব্বা! কদিন কাজ করতে হবে?'

'দিন পনের।'

'কমটা বললি, বেশি হলে কত?'

'বোম্বেতে গেলে এককোটি।'

'এক কোটি?' মা বসে পড়ল, 'অতটাকা একটা মেয়ে পায়? তুই যদি বোম্বে গিয়ে নাম করিস তাহলে তুইও পাবি?'

'আমি অলীক কল্পনা করতে চাই না। যা পাচ্ছি তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে চাই। আমি উঠলাম।'

'তাহলে মাদ্রাজের টিকিট কেটে রাখিস।'

'কবে যাবে দিন ঠিক করে জানিও।'

স্টেশনে এসে কাউন্টারে দাঁড়িয়ে টিকিট কাটতে গিয়ে মুখোমুখি হয়ে গেল ভদ্রমহিলার। কমলেন্দুর বউদি। 'এই যে অদিতি কেমন আছ?'

'ভাল।'

'ভাল তো থাকাই উচিত। ওর হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে গেছ এ তোমার ভাগ্য। আমরা তো আলাদা হয়ে গেছি। তুমি চলে যাওয়ার পর দাদা আর কমলেন্দুর সঙ্গে থাকতে চাইল না।' বলে কমলেন্দুর বউদি ট্রেন ধরতে ছুটে গেলেন।

[বারো]

মেসে ফিরেই খবরটা পেল।

এক ভদ্রলোক তার খোঁজে এসেছিলেন।

সে কোথায় যায়, কখন যায়, কখন ফেরে এইসব খোঁজ খবর করে গেছেন। আগামী রবিবার সকালে তিনি আবার আসবেন, অদিতি যেন অবশ্যই থাকে।

মাথা গরম হয়ে গেল খবরটা শুনে। কে এসেছিল বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না। আর কারও তার সম্পর্কে এত কৌতূহল থাকার কথা নয়। বাবা যে এমন বোকামি করবে তা সে কল্পনা করতে পারেনি। আবার এখনও জামাই জামাই বলে আদিখ্যেতা করতে ছাড়ছে না। মাঝে মাঝে অদিতির মনে হয়, ছাড়াছাড়ি হওয়া সত্ত্বেও বাবা চান না তারা আলাদা থাকুক। মারধোর যাই খাক না কেন, এখনও যদি অদিতি বাপের আশ্রয় ছেড়ে ওই লোকটার কাছে ফিরে যায় তাহলে ওরা খুশী হবেন। শুধু তার কারণে বাড়তি যে খরচ হচ্ছে সেটা বাঁচানোর জন্যে নয়, সে ফিরে গেলে ওরা বোধহয় মনের স্বস্তি ফিরে পাবেন। এটা যে কি ধরনের স্বস্তি তাই শুধু বুঝতে পারে না অদিতি।

তবু ভাগ্য লোকটা বলেনি আমি অদিতির স্বামী। ছাড়াছাড়ির কথা ও আমলই দেয় না। যদি এই মেসে বলে যেত, অদিতি আমার বউ, আমি দূরে থাকি বলে ও এখানে থাকে। ওকে বলবেন রবিবার সকালে আসব, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু থাকত না। কিন্তু একথা বলেনি। মানুষটা নামতে নামতে এমন জায়গায় নেমে গেছে যে ওর নিকট আত্মীয়াই স্টেশনে বলে গেল কোন সম্পর্ক রাখে না।

রবিবারে লোকটা এলে সে কি করবে? মেসে থাকবে না? অদিতি জানে তাতে কোন লাভ হবে না। ছিনে জোঁকের মত লেগে থাকবে লোকটা। হয়তো এই মেসের দরজায় ধর্না দিয়ে পড়ে থাকবে। তার সম্পর্কে অশ্লীল কথা শোনাতেও ওর বাধবে না। ঝামেলা এড়াতে মেসের ম্যানেজার তাকে বলবে চলে যেতে। সেটা আর একটা বিপদ। তার চেয়ে ওর সঙ্গে কথা বলাই ভাল। মুশকিল হল, এখানে কোন আলাদা ঘর নেই যেখানে বসে ব্যক্তিগত কথা বলা যায়। কথা বলতে হলে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে সবাইকে শুনিয়ে কথা বলতে হয়।

অদিতি ভেবে পাচ্ছিল না কি করবে? তার মনে প্রথমেই মিলনের মুখ ভেসে এল। তার কাকার বয়সী মানুষ, কাজের খাতিরে দাদা বলতে হবে, কিন্তু মানুষটা যে ভাল সে ইতিমধ্যে বুঝে নিয়েছে। কোন্ পুরুষ কি রকম তা মেয়েরা দু-দিন মিশলেই বুঝতে পারে। ভুল যদি হয় তাহলে সেটা খুব অল্প ক্ষেত্রে। কিন্তু এই বোঝার জন্যে একটু বয়স দরকার। আঠারো কুড়ি বছরে সেটা সম্ভব নয়। সেই বয়সে সব কিছু নতুন, সুন্দর এবং ভাল। মানুষের মনের স্বভাব তার আচরণে

বিচার করার মত মানসিকতা তখন তৈরি হয় না। ঐ আঠারো বছর বয়সই তো অদিতির সর্বনাশ করেছিল।

কিন্তু মিলনদাকে সে কি বলতে পারে?

ভদ্রলোকের সঙ্গে সেদিনের পরিচয়। আচমকা পছন্দ হয়ে যাওয়ায় তিনি তাকে ফিল্মে নামার সুযোগ দিয়েছেন। এই সুযোগ অন্য কারও ক্ষেত্রে অনেক কিছু হতে পারে কিন্তু অদিতির কাছে সমস্যার সমাধান ছাড়া আর কিছু নয়। ঐ সমস্যা হল আর্থিক সমস্যা। রোদ-জলে ঝড়ে দরজায় দরজায় ঘুরে ফিরি করতে গিয়ে যে অপমান সহ্য করতে হত তা থেকে বেঁচে যাওয়া। আর এই কাজ করেও মাসের শেষে যে টাকা আসত তাতে মেসের মাসকাবারি মিটিয়ে হাতে কি থাকত তা সে নিজেই জানে না। এই ছবিতে সুযোগ পাওয়ায় সেই দুশ্চিন্তা গিয়েছে।

অতএব মিলনদার কাছে সে কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁকে কি করে যে বলবে, আপনি আমার প্রাক্তন স্বামীর হাত থেকে বাঁচান। অল্প বয়সের ভুলে আমি ওর প্রেমে পড়েছিলাম। ওর সুন্দর চেহারা দেখে মিষ্টি কথা শুনে মনে হয়েছিল আর কিছু চাওয়ার নেই। বিয়ের পর বুঝতে পারলাম মাকাল বলে একটা ফল আছে। ছেলেবেলায় পড়া লাইনটা, যা চিক্‌চিক্ করে তাই সোনা নয়, তা কতখানি সত্যি তা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম।

কিন্তু আমি বাঙালি মেয়ে। বাল্যকাল থেকে শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে, মানিয়ে চলবে। সম্বন্ধ করা বিয়ের ক্ষেত্রে যদি শ্বশুরবাড়িতে গিয়ে মানিয়ে চলতে হয় তাহলে নিজের পছন্দ করা বিয়েতে তো মাথা নুইয়ে থাকা দরকার। অতএব আমি তাই করতে চেয়েছিলাম। আমার শ্বশুর ছিলেন না, শাশুড়ি ছিলেন। তাঁর মেয়েরা দেখতে ভাল নয়। আমার সৌন্দর্য তাঁকে খুব কষ্ট দিত। তাছাড়া ছেলের বিয়ে দিয়ে অনেক কিছু পাবেন এমন ধারণা তাঁর ছিল। সেটা ব্যর্থ হতে তিনি কিছুতেই আমাকে মেয়ে বলে মনে করতে পারলেন না। ফলে সংঘাত আর সংঘাত। তবে প্রথম বছর ওটা এক পক্ষের ছিল। আমি মুখ বুজে সহ্য করতাম।

অদিতি মাথা নাড়ল। না, এসব গল্প সে কিছুতেই মিলনকে বলতে পারবে না। সে আসুক, যা হওয়ার হোক, কাজের জায়গায় ঘরের সমস্যাকে সে টেনে নিয়ে যাবে না। নিজের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত তাকে যতদিন করার করে যেতে হবে।

পরদিন সকালে ইউনিট থেকে একটি ছেলে এসে খবর দিল বিকেল তিনটের সময় স্টুডিও যেতে হবে। সেখানে তার জামার মাপ নেবে দর্জি। অদিতি মনে মনে খুশী হল। তার ভাল জামা নেই বললেই সত্যি কথা বলা হয়। তার মাপের জামা যখন তৈরি হচ্ছে তখন স্যুটিং শেষ হলে ওগুলো ওরা নিশ্চয়ই ফেরৎ নেবে না।

ঠিক তিনটে বাজতে পাঁচ মিনিট আগে অদিতি ট্যাক্সি থেকে নেমে কোনদিকে না তাকিয়ে মিলনের অফিসের দিকে এগোচ্ছিল। ওপাশ থেকে একজন নামী অভিনেতা চামচেদের নিয়ে আসছিলেন। অদিতিকে দেখে তিনি থমকে দাঁড়ালেন, 'নতুন মনে হচ্ছে।'

একজন চামচে বলল, 'আগে দেখিনি দাদা।'

অভিনেতা বললেন, 'কার ঘরে যাচ্ছে দ্যাখ তো।'

যার অফিসঘরে অদিতি ঢুকল তার সঙ্গে অভিনেতার ভাল পরিচয় আছে।

মিলন বসে সামন্তর সঙ্গে কাজ করছিল। অদিতি ঢুকতেই বলল, 'খুব ভাল। এইরকম সময় মেনে চলবে। সামন্ত, ইউসুফকে ডেকে আনো, মাপ নিয়ে যাক।'

সামন্ত উঠল। মিলন বলল, 'দাঁড়িয়ে কেন, বসো।'

অদিতি চেয়ারে বসে বরফ গলায় বলল, 'আচ্ছা ছবিটার নাম কি?'

'ও হো। তোমাকে আমি ছবির নাম বলিনি। আর বলব কি, আমি এর মধ্যে তিনবার ছবির নাম বদলেছি। একবার ভেবেছি নাম রাখব নির্যাতিতা, ভাল লাগল না। দ্বিতীয়বারে ঠিক করলাম, জ্বালা। সেটাও ভাল লাগল না। প্রযোজক বললেন, যাত্রার নাম রাখলে নাকি পাবলিক পছন্দ করে। যেমন, মায়ের স্নেহ, মায়ের আশীর্বাদ, পতির কোলে সতী। আমার সহ্য হল না। শেষ পর্যন্ত আমি প্রোডাকশন নাম্বার ওয়ান বলে কাজ শুরু করেছিলাম। তোমাকে দেখার পর নাম মাথায় এল। প্রযোজকেরও খুব ভাল লেগেছে।'

'কি নাম?'

'সাধারণ মেয়ে। রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতার নাম।'

অদিতি হাসল। ছবির নাম হিসেবেও সুন্দর।

'এই যে মিলনবাবু, আসতে পারি?' পেছন থেকে একটি গলা গম্‌গম্‌ করল।

'আরে আসুন দাদা। আসুন। কী সৌভাগ্য।' মিলন উঠে দাঁড়াল।

'বাঃ তোমার বিনয়ের তুলনা নেই। টালিগঞ্জের ছবি করছ অথচ আমাকে ভুলে গেলে। আমি কি অভিনয় জানি না বলে তোমার ধারণা?' সেই অভিনেতা এসে আর একটা চেয়ারে বসলেন।

'লজ্জা দেবেন না দাদা। আপনার করার মত চরিত্র থাকলে আমি নিজে যেতাম। আপনাকে তো মিস-ইউজ করতে পারি না।'

'এই এক অস্ত্র তোমরা প্রায়ই ব্যবহার কর। ছবির নাম কি?'

'সাধারণ মেয়ে।'

'বড় ফ্ল্যাট নাম হে। চমক নেই। যাক গে, তোমার পাঁঠা তুমি যেদিক দিয়ে ইচ্ছে কাটতে পার। হিরো করছে কে?'

মিলন নাম বলল। কাঁধ ঝাঁকালেন অভিনেতা। তারপর জিজ্ঞাসা করল, 'সাধারণ মেয়ে গল্পটা কি?'

'একটি সাধারণ ঘরের মেয়ের মাথা তুলে দাঁড়াবার গল্প। তার সামনে, যেমন হয়, জীবনের নানান বাধা পাঁচিলের মত আড়াল তৈরি করেছিল। প্রথম জীবনে করা ভুল তাকে তলিয়ে নিয়ে যেতে পারত কিন্তু সে হাল ছাড়েনি। সেইসব পাঁচিল ভেঙে সে নিজের পায়ে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পেরেছে। বাঙালি মেয়েরা যা করবে ভাবে কিন্তু করতে পারে না। আমার ছবির নায়িকা তাই করে ফেলবে।' মিলন বলল।

'বাঃ! তুমি তো খুব চমৎকার গল্প বললে। বললে অথচ কিছুই বললে না। যে যা পার বুঝে নাও তাই তো! তা নায়িকাটি কে?'

'আপনার পাশে বসে আছে দাদা।'

'অ্যাঁ।' চমকে তাকালেন অভিনেতা। চোখাচোখি হল। সঙ্গে সঙ্গে অদিতির মনে অজস্র দমকল ঘণ্টা বাজতে লাগল, 'এই লোকটা খারাপ, এই লোকটা খারাপ। এই লোকটা খারাপ।'

'আপনি নায়িকা? অভিনন্দন। আগে দেখিনি, এই প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

বাঃ। এই লাইনে নায়িকার ভূমিকায় সুযোগ পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার। আপনাকে প্রযোজক আবিষ্কার করেছেন?'

'না। মিলনদা ডেকে পরীক্ষা করে নিয়েছেন।'

'তাই নাকি মিলন? তোমার তো এরকম দোষ ছিল না।'

'দোষ কেন বলছেন দাদা?'

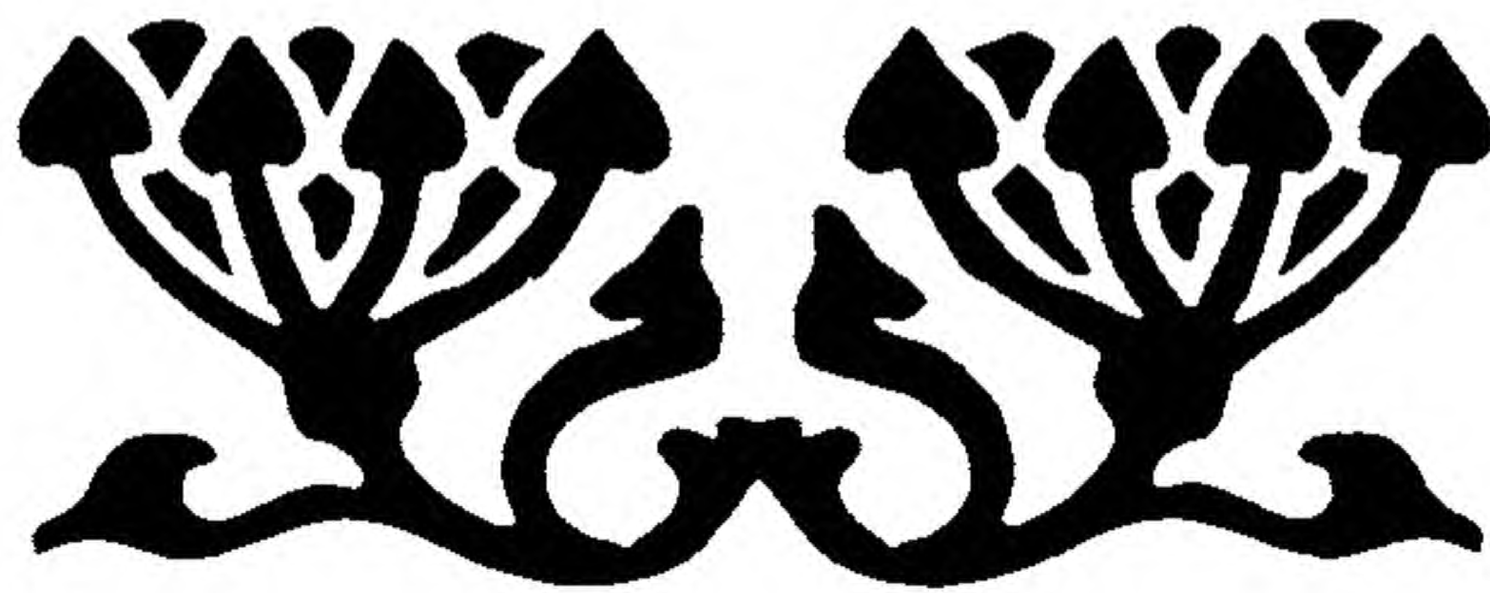
'মেয়েমানুষ দেখলে তুমি দশহাত দূরে থাকতে। অথচ একে তুমি নিজে ডেকে নায়িকা করলে। অবশ্য ফিগার-টিগার ঠিক আছে। নাম কি হে?'

প্রশ্নটা অদিতির দিকে তাকিয়ে। তার শরীর জ্বলছিল। তার বলতে ইচ্ছে করছিল সে মেয়েমানুষ নয়। মানুষ। পুরুষদের তো ছেলে-মানুষ বলা হয় না। পুরুষ-মানুষ বলা হলে মেয়েদের মহিলা-মানুষ বলতে দোষ কোথায়। মেয়েমানুষ শব্দটার মধ্যে একটা প্রকাণ্ড তাচ্ছিল্য আছে।

'ওর নাম অদিতি।'

'অদিতি। বাঃ! অদিতি, আলাপ হল, আমার সঙ্গে যোগাযোগ রেখো, আখেরে কাজ দেবে। আরে মিলন তো একটা ছবি করছে, আমি বছরে দশটা ছবিতে অভিনয় করি। দশজন পরিচালক আমার কথা শোনে।' অভিনেতা উঠে দাঁড়ালেন।

হঠাৎ অদিতির মুখ থেকে বেরিয়ে এল, 'একটা নিয়েই আমি থাকতে চাই, দশটা তো সামলাতে পারব না। আপনার মত যেদিন হব সেদিন ভাবব।'



[তেরো]

অভিনেতা অদ্ভুত চোখে তাকালেন। তারপর কিছুই শোনেননি এমন ভান করে বললেন, 'চলি হে মিলন, একনম্বর ফ্লোরের স্যুটিং আমার জন্যে আটকে আছে।'

তিনি চলে যাওয়ামাত্র সামন্ত এল ইউসুফকে নিয়ে। ঘরের এককোণে দাঁড় করিয়ে সে অদিতির পোশাকের মাপ নিয়ে নিল। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'কি কি বানাতে হবে লিস্ট পেয়েছ?'

'হ্যাঁ দাদা। প্রথমে যেসব দৃশ্য নেবেন তার পোশাক দিয়ে দেব ড্রেসারকে।'

'ঠিক আছে। ভাল যেন হয়।'

ইউসুফ চলে গেলে মিলন বলল, 'বসো অদিতি। একটু আগে যা তুমি শুনতে বাধ্য হলে তার জন্যে আমি সত্যি দুঃখিত। উনি খুব শক্তিশালী অভিনেতা, দীর্ঘদিন ছবি করছেন। উত্তমবাবুর সময়েও নায়ক করেছেন। কিন্তু ইদানীং ওঁর মুখ খুব আলগা হয়েছে। কি বলছেন ভেবে বলেন না।'

অদিতি চেয়ারে বসল। তার অনেক কিছু বলতে ইচ্ছে করলেও চুপ করে রইল।

'এখানে কাজ করলে দু-ধরনের মানুষ দেখবে। একদল কাজের বাইরে বাড়তি কথা বলেন না। যেমন তরুণ মজুমদার। অত্যন্ত ভদ্র রুচিশীল মানুষ। ওঁর সঙ্গে কথা বললে মনের আরাম হয়। আর এক ধরনের অভিনেতা এবং অভিনেত্রীও আছেন যাঁরা নিজেদের মধ্যে অশ্লীল কথা সাবলীলভাবে বলে থাকেন। মানুষ হিসেবে এঁরা খারাপ নন; কিন্তু অশ্লীল কথা বলায় অভ্যস্ত।'

সামন্ত শুনছিল, বলল, 'কিছু হয়েছে দাদা?'

মিলন বলল, 'না না। তেমন কিছু নয়।'

অদিতি এবার তাকাল, 'ওঁর চাহনি ভাল ছিল না।'

সামন্ত বলল, 'ওঁর চামচেরা বাইরে দাঁড়িয়ে খুব হাসাহাসি করছিল। আমাকে একজন জিজ্ঞাসা করল, নতুন পায়রাটা কে?'

'আঃ সামন্ত! এসব কথার যে কোন মানে নেই তা তুমিও জানো, শুনলে ওর মন খারাপ হবে। অদিতি, তোমাকে একটা কথা বলি, রামকৃষ্ণদেবের কথা, এখানে তুমি হাঁসের মত থাকবে। কাজ করবে কিন্তু গায়ে মাখবে না। সবার সঙ্গে হেসে কথা বলবে, কাউকে চটাবে না কিন্তু কাজ শেষ হতেই দূরত্ব রাখবে। এই যে উনি যে কথা বলে গেলেন তার পরেও দেখা হলে বলবে, ভাল আছেন দাদা, বলেই সামনে থেকে সরে যাবে। তুমি কাউকে প্রশ্ন করবে না। যেই লোকে বুঝে যাবে তুমি নরম মাটি যেমন নও তেমনি মাথা গরম সহজে করো না, অমনি দেখবে কেউ তোমাকে বিরক্ত করছে না। দুর্বলতা দেখলেই মানুষ পেয়ে বসে। বুঝেছ?' মিলনদা জিজ্ঞাসা করলেন।

অদিতি মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি কি ওঁর কথা নিয়ে এখনও ভেবে যাচ্ছ?'

'না-না।' মাথা নাড়ল অদিতি।

'তাহলে কোন সমস্যায় পড়েছ?'

অদিতি তাকাল। মিলনদার গলার স্বর আন্তরিক। কি বলবে সে? সে মাথা নাড়ল, 'না তেমন কিছু নয়। আমি কি যাব?'

'নিশ্চয়ই। ও হ্যাঁ, আজ যে গল্প শুনলে, এই ছবির গল্প, সেটা কিন্তু পুরো গল্প নয়। আমি তোমাকে চিত্রনাট্যের কপি দিচ্ছি, বাড়িতে পড়ে তৈরি হও। আমি চাইছি একটি সাধারণ মেয়ে যেভাবে বিহেভ করে তুমি তাই করবে।'

একটা বাঁধানো খাতা কোলে নিয়ে সামন্তর ডেকে দেওয়া ট্যাক্সিতে বসে স্টুডিও থেকে বেরিয়ে এল অদিতি। আর কটা দিন, সামনের সোমবার থেকে তার স্যুটিং শুরু হবে। ছবির নাম, সাধারণ মেয়ে।

রাত্রে মেসের খাটে শুয়ে চিত্রনাট্য পড়ে ফেলে সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। এ তো প্রায় তারই গল্প। অদিতি চোখ বন্ধ করতেই পাশের খাটের মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল,

'ওটা কিসের খাতা গো?'

'চিত্রনাট্য।' চোখ না খুলে বলল অদিতি।

'নাটক? তুমি নাটক করবে নাকি? পয়সা পাবে?'

অদিতি মেয়েটির দিকে তাকাল। তাকিয়ে হেসে বলল, 'পাগল!'

'তাহলে পড়ছ কেন? ফালতু ফালতু।'

খাতাটাকে সযত্নে তুলে রাখল অদিতি। তারপর আবার শুয়ে পড়ল। ওবাড়ি থেকে ফিরে আসার পর মাসের পর মাস বিছানায় শুলেই স্মৃতি হুড়মুড় করে চলে আসত সামনে। বন্ধ চোখের পাতায় সিনেমার মত সেসব দেখতে পেত অদিতি। আজ অনেকদিন পরে তাই হল।

শাশুড়ির নির্যাতন নতুন কিছু নয়। ভদ্রমহিলা জীবনে কিছুই পাননি তাই কোন মেয়েকে পেতে দেখলে সহ্য করতে পারতেন না। ভোর পাঁচটায় ঘুম থেকে তুলে দিয়ে সংসারের কাজ শুরু করতে বলতেন। সেটা শেষ হত রাত এগারটায়। বিশ্রাম নিতে দেখলেই তাঁর জিভ কুটকুট করে উঠত। প্রথম প্রথম স্বামীকে খুব ভাল লাগত তার। মাস দুয়েক বাদে হঠাৎ লোকটা তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'দুশোটা টাকা আছে?'

ছিল। তার সঞ্চয়ে হাজার টাকা ছিল। দিয়ে দিল সে। স্বামী খুব আদর করে টাকা নিয়ে চলে গেল। কিন্তু দু-দিন বাদে জিজ্ঞাসা করল, 'আর কত আছে বল তো? খুব দরকার।' অদিতি কোন দ্বিধা না রেখে আটশো দিয়ে দিল। সেই বিকেলে শাশুড়ি সামনে এসে দাঁড়ালেন, 'অদিতি, তুমি আমার ছেলের সর্বনাশ করছ কেন? কি লাভ হবে তোমার?'

'আমি বুঝতে পারছি না মা।'

'ন্যাকা। তুমি ওকে জুয়ো খেলতে টাকা দাওনি?'

'জুয়ো খেলতে?'

'হ্যাঁ, জুয়ো খেলে রোজগার করতে বলনি?'

'না তো।'

'মিথ্যে কথা। তোমার এত টাকার লোভ স্বামীকে নরকে নামাচ্ছ। ছিঃ!' অদিতি হতভম্ব হয়ে গেল। গালাগালিগুলো তার কানে ঢুকছিল না। রাত্রে স্বামী বাড়ি ফিরলে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তুমি কি জুয়ো খেলছ?'

'তোমাকে কে বলল?'

'মা।'

'মা জানল কি করে?'

'আমি জানি না।'

'মা তো বাড়ি থেকে বের হয় না। আমি বাইরে গিয়ে ব্যবসা করছি না জুয়ো খেলছি তা ওঁর পক্ষে কি জানা সম্ভব?'

'তাহলে উনি যে বললেন—!'

'ওঁর কথায় তাহলে নাচো!'

এই নাচা শব্দটা দিয়ে শুরু হয়েছিল। অদিতি ভেবেছিল স্বামী তার মাকে গিয়ে জিজ্ঞাসা করবে কেন তিনি বানিয়ে বলেছেন? কিন্তু সেরকম কিছুই ঘটল না। উল্টে দিন তিনেক বাদে স্বামী বলল, 'খুব বিপদে পড়ে গেছি, হাজার দুয়েক টাকা এখনই চাই, দাও।'

চোখ কপালে তুলল অদিতি, 'আমার কাছে টাকা নেই।'

'নেই তো একটা ব্যবস্থা করো।'

'আমি কি করব?'

'অদ্ভুত মেয়েমানুষ। স্বামীর বিপদে সাহায্য করবে না?'

'আমার কাছে যা ছিল তার সবই তোমাকে দিয়ে দিয়েছি।'

'নিজের কাছে না থাকে তো বাপের কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসো।'

'বাবা?'

'হ্যাঁ। ওই বুড়োর তো প্রচুর খরচ বেঁচে গিয়েছে। বিয়েতে কোন যৌতুক দিতে হয়নি। যাও, আর দেরি করো না।'

মুখে অন্ধকার জমেছিল অদিতির, 'আমি কি বলে টাকা চাইব?'

'যা খুশী বলো। তোমার স্বামী অসুস্থ অথবা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। মাইরি, মেয়েমানুষকে মিথ্যে কথা বলতে শেখাতে হবে নাকি?'

'তুমি এভাবে আমার সঙ্গে কথা বলছ?'

'তুমিই বলাচ্ছ। আমার সঙ্গে ঢ্যামনামি না করলে বলতাম না।'

'ছিঃ।'

'এই! মাথা গরম করে দিও না। একঘণ্টার মধ্যে টাকা চাই আমার।'

সেদিন লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল যেন। কৃষ্ণনগর শহরের আর এক প্রান্তে বাপের বাড়ি। সেখানে গিয়ে কিন্তু কিন্তু করে টাকার কথা বলে ফেলেছিল। বাবা অবাক হয়ে বলেছিলেন, 'সেকি রে। জামাই-এর হাতে মাত্র দু-হাজার টাকাও নেই? কি ব্যবসা করে ও!'

'জানি না।'

'জানিস না? তুই তাকে জেনেশুনে বিয়ে করেছিস অথচ কি ব্যবসা করে তার খোঁজ খবর নিসনি? ওর মায়ের কাছে নেই?'

'দ্যাখো বাবা, থাকলে তোমার কাছে হাত পাততে আসতাম না।'

বাবা অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলেন কিছুক্ষণ। তারপর আলমারি খুলে টাকা বের করে অদিতির সামনে রেখে বলেছিলেন, 'আমার আর্থিক অবস্থা তো জানিস। যা ছিল তোর বিয়েতেই চলে গেছে। হুট্ করে যদি কিছু হয় তাই এই টাকাটা বাড়িতে রেখেছিলাম।'

খুব খারাপ লেগেছিল, নিজেকে অপরাধী বলে মনে হয়েছিল, তবু টাকাটা নিয়েছিল অদিতি। বাড়িতে ফেরামাত্র স্বামী জিজ্ঞাসা করল, 'কি বুড়ো টাকা দিয়েছে নাকি আমাকে যেতে হবে?'

অদিতি টাকাটা দিয়েছিল। হাতে নিয়ে গুনতে গুনতে স্বামী বলেছিল, 'বাঃ। খুব ভাল। বুদ্ধিমান লোকরাই নিজের বিপদ ডেকে আনে না।'

হঠাৎ শরীর কাঁপিয়ে কান্না এল অদিতির। সেদিন স্বামী বেরিয়ে যাওয়ার পর বিছানায় শুয়ে সে এইভাবেই কেঁদেছিল। প্রেম, বিয়ে, স্বামী নিয়ে যে বেলুন সে ফুলিয়েছিল তা এইভাবে ফেটে যেতে পৃথিবীটা আচমকা অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল। সে সময় মনে হয়েছিল এরপর বেঁচে থাকার আর কোন মানে হয় না। কি নিয়ে বেঁচে থাকবে সে? কার জন্য বাঁচবে? এ বাড়িতে থাকলে তাকে পড়ে পড়ে মার খেতে হবে। যে লোকটা তাকে টাকার জন্যে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছিল সে আজকের পরে থেমে যাবে না। অদিতি দাঁতে দাঁত চেপে প্রতিজ্ঞা করল, স্বামী হাজারবার বললেও সে আর টাকা আনতে বাপের বাড়িতে যাবে না। এর চেয়ে মরে যাওয়াও ভাল।



[চৌদ্দ]

রবিবার সকালে ঘুম ভেঙেছিল আতঙ্ক নিয়ে। একবার মনে হয়েছিল মেস থেকে বেরিয়ে কোথাও চলে যায়। কিন্তু কোথায় যাবে? কলকাতা শহরে তার পরিচিত মানুষ নেই বলতে গেলে। হঠাৎ মিলনদার স্ত্রীর কথা মনে পড়ল। ভদ্রমহিলাকে ওর খুব ভাল লেগেছে। উনি যদি জিনিসগুলো বাড়িতে স্বামীকে দেখানোর জন্যে না রেখে দিতেন তাহলে সে কোনকালেই ছবিতে সুযোগ পেত না। সেদিক দিয়ে দেখলে ওর কাছে সে কৃতজ্ঞ। ওই বউদির কাছে গেলে হয়।

কিন্তু গিয়ে কতক্ষণ থাকতে পারবে সে? এক দুই তিন ঘণ্টা। তাকে তো মেসে ফিরে আসতেই হবে। আর এলেই অদিতি নিশ্চিত লোকটার দেখা পাবেই। অতএব সে স্থির করল যা হওয়ার হোক, মুখোমুখি হবে।

এই মেসে ঘুম থেকে উঠলে এক কাপ চা দেওয়া হয়। তাতে না থাকে ভাল লিকার না মিষ্টি। সেই কষা তরল পদার্থ গরম বলে সবাই চা মনে করে খেয়ে নেয়। তারপর একেবারে ভাত। সঙ্গে পাতলা ডাল জাতীয় পদার্থ, একটা ঘ্যাঁট আর ব্লেডে কাটা মাছের টুকরো।

আজ চা খেয়ে শাড়িটা পাল্টাতেই পাশের মেয়েটা বলল, 'তুমি ছুটির দিনেও কোথায় বেরুবে? বেড়াতে যাচ্ছ বুঝি?'

মেয়েটার সব ব্যাপারে কৌতূহল। বেচারা খুব গরীব। টিউশুনি করে মেসের খরচ চালিয়ে কলেজে পড়ছে। সামান্য সৌখিনতা ওর স্বপ্নের বাইরে। অদিতি বলল, 'নারে! একজন আসবে তাই ভদ্রস্থ হলাম।'

'কে গো?'

'আমার জীবনের অভিশাপ।'

'সেকি? কে সে?'

'পরে বলব। তুই টিউশুনিতে যাবি না?'

'আজ রবিবার না? আজ আমি ঘুমাবো।' এমনভাবে মেয়েটি কথা বলল যেন ঘুমের মত সৌখিন ব্যাপার পৃথিবীতে আর নেই।

নটার সময় মেসের মাসী এসে বলল, 'তোমার কাছে কেউ এসেছে।' ছ্যাঁত করে উঠল বুক। পা ভারী হল। মন শক্ত করে অদিতি নিচে নামল। সদর দরজায় একজন অচেনা মানুষ তাকে দেখে নমস্কার করে বলল, 'দিদি, আপনার একটা চিঠি আছে।' পকেটে হাত দিল লোকটা।

'আমার কাছে?'

'হ্যাঁ। প্রোডিউসার পাঠিয়ে দিয়েছেন।' লোকটা চিঠিটা দিল। একটা খাম। হঠাৎ পায়ের তলায় মাটি দুলে উঠল। নিশ্চয়ই তাকে ওরা বাদ দিয়েছেন। মিলনদা এসে

মুখে বলতে পারেননি বলে প্রোডিউসারের চিঠি পাঠিয়েছেন। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল তার। দুর্ভাগ্য কখনও একা আসে না। সে খামটা খুলল। লোকটা দাঁড়িয়েছিল। 'সুচরিতাসু অদিতি, তোমার মেসে থাকার ব্যাপারে অসুবিধে হচ্ছে অনুমান করে আপাতত একটি বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছি। টালিগঞ্জের রসা রোডে একটি দু'কামরার ফ্ল্যাট খালি আছে। স্টুডিওর কাছে বলে সুবিধে হবে। আমাদের ছবি যতদিন রিলিজ না হচ্ছে ততদিন তোমাকে কোন ভাড়া দিতে হবে না। এরপরে থাকতে চাইলে আমরা তখন কথা বলব। যদি তুমি রাজি হও তাহলে পত্রবাহককে মতামত জানিয়ে দাও। আজ বিকেলেই সে তোমাকে নতুন আবাসে পৌঁছে দেবে। শুভেচ্ছা নিও। ইতি—মুরলীধর সেনগুপ্ত।''

'মুরলীধর সেনগুপ্ত?' অদিতি নামটা উচ্চারণ করল।

'প্রোডিউসার।' লোকটি বলল।

'মিলনদা জানেন?'

'হ্যাঁ। উনিই তো চিঠিটা পৌঁছে দিতে বললেন।'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে কি আপনি আজই যাবেন?'

'আপনি বিকেল তিনটের সময় আসুন।'

লোকটি নমস্কার করে চলে যেতে অদিতি মেসের ম্যানেজারের ঘরে ঢুকল, 'আপনার সঙ্গে একটু কথা বলব?'

'কি কথা?'

'আমার তো দু-মাসের টাকা জমা আছে। এখনও এক মাস হয়নি। আমি যদি মেস ছেড়ে দিই তাহলে আপনি কতটা ফেরত দেবেন?' অদিতি লোকটার মুখের দিকে তাকাল।

'ছেড়ে দেবেন মানে? বলা নেই কওয়া নেই ছেড়ে দেব বললেই হল।'

'আমাকে অনেক দূরে চলে যেতে হবে।'

'ও। নতুন চাকরি পেয়েছেন বুঝি! বাঃ খুব ভাল। কত মাইনে?'

'আপনি আমার প্রশ্নের জবাব দেননি।'

'ও।'হ্যাঁ। এক মাসের জমা দেওয়া টাকা ফেরত পাবেন। তবে হুট্ বললেই তো দেওয়া যাবে না। দিন দশেক সময় লাগবে।'

অদিতি আর কথা না বাড়িয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই দরজায় তাকে দেখতে পেল। পাজামা পাঞ্জাবি বেশ ময়লা, মুখে প্রচুর পান থাকায় কষ দিয়ে রস চলকে পড়েছে। চুল উস্কখুস্ক। তাকে দেখা মাত্রই লোকটা দুটো হাত মাথার উপর তুলল, 'বাঃ, এত সহজে দেবীদর্শন হবে কল্পনাও করিনি।'

'কি চাই?' অদিতি শক্ত গলায় জানতে চাইল।

'চাওয়ার কি শেষ আছে? কত কি চাই! কিন্তু সেইসব কথা কোথায় বসে বলব? তোমার ঘরে চল!'

'এটা মেয়েদের মেস। কাউকে ঘরে নিয়ে যাওয়া যায় না।'

'অ। ডিসিপ্লিন! অতিথির জন্যে কোন ঘর নেই?'

'না। তোমার যা বলার এখানে দাঁড়িয়েই বল।'

'অসম্ভব। আমি আর যাই করি তোমাকে এখন অপমান করতে পারি না।'

'মানে?'

'মানে তো সহজ। যখন তুমি আমার স্ত্রী ছিলে তখন ভালবাসার, মারধর করার এমন কি অপমান করার অধিকার ছিল আমার। এখন স্ত্রী নও, ওসব পারি না।' জিভ বের করে মাথা নাড়ল লোকটা।

'বুঝলাম না।'

'তুমি যে টিউবলাইট হয়ে গেছ বুঝতে পারিনি। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বললে পাঁচ পাবলিক সেসব শুনবে। তাতে কি তোমার মান বাড়বে? তোমার অপমান হবে না?'

হাসল লোকটা।

'ঠিক আছে। বাইরে চল।'

রাস্তায় নামল অদিতি। পেছনে লোকটা। হাঁটতে হাঁটতে বলল, 'তুমি মাইরি খুব ইমপ্রুভ করেছ। চেহারা বেশ টলটলে হয়েছে, গায়ের চামরায় জেল্লা এসেছে। আবার প্রেমে পড়েছ নাকি?'

অদিতি জবাব দিল না। আর একটু এগিয়ে একটা পার্ক আছে। সে সেখানে ঢুকে এমন জায়গায় দাঁড়াল যার আশেপাশে কোন মানুষ নেই। এখন বেশ বেলা হয়েছে। মাথায় রোদ নিয়ে কেউ পার্কে বেড়াতে যায় না। পার্কে ঢুকে লোকটা বলল, 'এ কোথায় এলে?'

'কি বলতে চাও তাড়াতাড়ি বলে ফ্যালো।'

'অদিতি, মাইরি, আমার খুব অনুতাপ হচ্ছে।'

'এই কথা বলতে এসেছ?'

'না। আমি শুনলাম তুমি চাকরি করছ, কৃষ্ণনগরে নেই। তাই তোমার বাবার কাছে ঠিকানা চেয়ে নিলাম। দ্যাখো, আমরা দুজন তো পরস্পরকে ভালবাসাবাসি করে বিয়ে করেছিলাম। স্বামী স্ত্রী হয়েছিলাম। যতই ঝগড়াঝাঁটি হোক, স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক যুগযুগান্তরের। ডিভোর্স হয়ে গেলেও সেই সম্পর্ক ছিন্ন হয় না। ঠিক কি না?

'তোমার কথা শেষ হয়েছে?'

'এই দ্যাখো, তুমি এখনও রেগে আছ!'

'তোমার এইসব ফালতু কথা শোনার মত সময় আমার নেই। এখন তুমি আমার কাছে একটা রাস্তার লোক ছাড়া কিছুই নও। আমাদের যখন আইনসম্মত ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে তখন আমাকে জ্বালাতে এসো না।'

'এসো না বললে এই মন শুনবে?'

'মানে?'

'মন যে মানতে চায় না অদিতি। সবসময় মনে হয় তোমার কাছে আসি। আচ্ছা, বল তো, কতদিন আমি তোমাকে চুমু খাইনি?'

'তোমার সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘেন্না লাগছে। তুমি এখন আসতে পার। আর আবার যদি আমাকে বিরক্ত করতে আসো তাহলে আমি পুলিশে খবর দেব।'

'তুমি শুধু শুধু আমাকে ভয় দেখাচ্ছ। যাক গে, তুমি তোমার ওই ফার্স্টক্লাস ফিগার নিয়ে যা ইচ্ছে কর আমার আপত্তি নেই। কিন্তু মাসে কিছু কিছু মাল আমাকে দিও। প্লিজ। এই ধরো পাঁচশো।'

অদিতি কথা না বলে পার্ক থেকে বেরিয়ে যেতে চাইল কিন্তু লোকটি ছুটে এল, 'আরে! কিছু না বলে চলে যাচ্চ যে!'

'তুমি আর একটা কথা বললে আমি চেঁচিয়ে লোক জড়ো করব।'

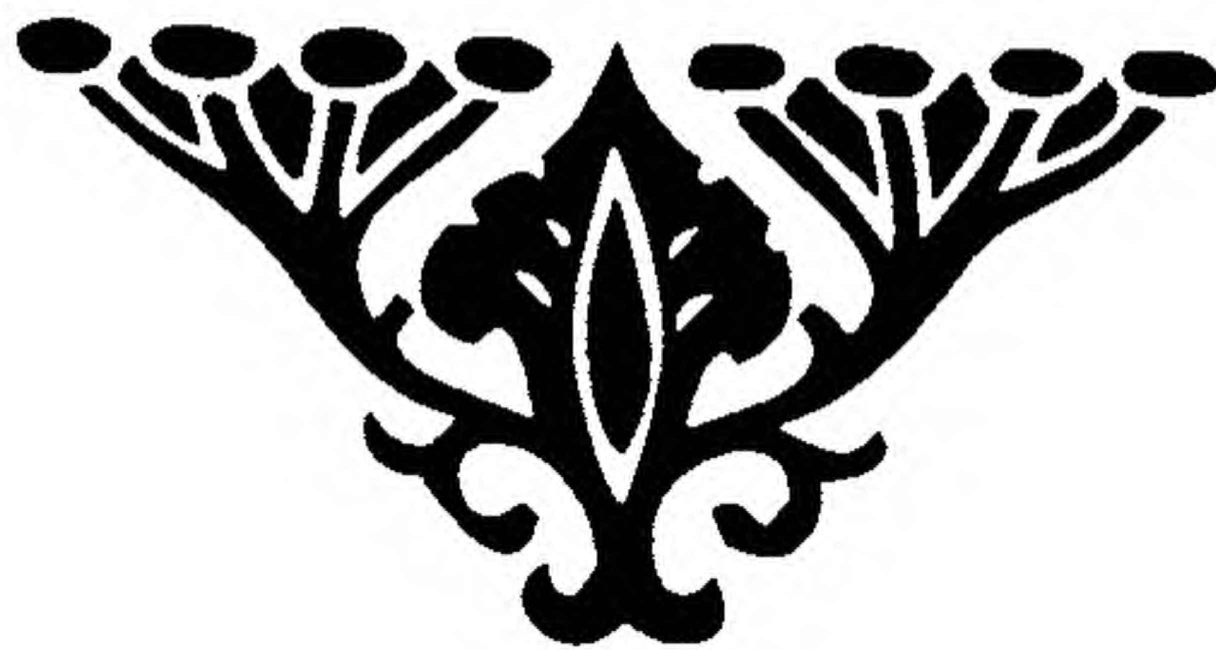
'করবে তো কর। আমার কি? তোমারই প্রেস্টিজ যাবে। এই পাড়ায় থাকতে পারবে না'। লোকটা ক্লেদাক্ত হাসি হাসল।

'কি বলতে চাইছ?'

'তোমার স্মৃতিশক্তি খুব দুর্বল অদিতি। মনে আছে, তোমার আমার মধ্যে যখন খুব প্রেম চলছিল, বিয়ের দিন কুড়ি পরে, তখন আমি তোমার কিছু ছবি তুলেছিলাম। মনে পড়ছে? তুমি অবশ্য সব জামা-কাপড় খুলতে রাজি হওনি। আমি স্বামী বলে যেটুকু খুলেছিলে তাতেই ওই ছবিগুলো হে হে, অনেকটা দেখা যাচ্ছে। ওগুলো আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। তোমার মেসে, এই পাড়ায়, যদি পাঠিয়ে দিয়ে বলি চাইলেই তোমাকে পাওয়া যায় তাহলে ছবি দেখে কেউ কেউ তো বিশ্বাস করতেও পারে। তাই না? আজ যাচ্ছি। কিন্তু ব্যাপারটা ভেবে দেখো।'

লোকটা চলে গেল।

পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইল অদিতি।



[পনেরো]

বিখ্যাত এক রাজনৈতিক নেতা ডাব ফাটালেন। হাততালি ভেসে এল চারদিক থেকে।

প্রচুর গণ্যমান্য মানুষ, সাংবাদিক, ক্যামেরাম্যান সামনে। আছেন টালিগঞ্জের অনেক দামী এবং বিখ্যাত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা। আজ সাধারণ মেয়ের মহরৎ।

প্রথম দিন, শুভদিনে একটি দৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত হবে।

আজ সকালে গাড়ি গিয়েছিল মেসে। গতকালের দুপুরের ঘটনার পর অদিতি এমন ভেঙে পড়েছিল যে প্রোডিউসারের চিঠির কথা আর খেয়ালে ছিল না। বিকেল বেলায় যখন লোকটি এল তখন সে তৈরি ছিল না। ভেবে দেখারও অবকাশ পায়নি। বলেছিল, পরে জানাবে।

কাল রাতে এই নিয়ে সে অনেক ভেবেছিল। লোকটা তাকে ছাড়বে না বোঝাই যাচ্ছে। বিয়ের পর ভালবাসার স্বাভাবিক দিনগুলোয় স্বামী-স্ত্রী অনেক কিছু করে যা তাদের একান্ত ব্যক্তিগত। বন্ধ ঘরে লোকটা তাকে প্রেম দিয়ে ছবি তুলতে চেয়েছিল। প্রথমে নানান পোজের ছবি। তারপর পোশাক খুলতে বলেছিল। আঁতকে উঠেছিল অদিতি, প্রথমে কিছুতেই রাজী হয়নি। কিন্তু ভালবাসা বড় দায়। তবু যতটা সম্ভব আড়াল রেখেছিল সে। ছবি প্রিন্ট করিয়ে তাকে দেখায়নি লোকটা। বলেছিল সর্বনাশ হয়ে গেছে। ফিল্ম খারাপ ছিল, একটাও ছবি ওঠেনি। শুনে হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছিল অদিতি।

লোকটা মিথ্যা কথা বলেছিল। এতদিন নিজের কাছে ছবিগুলো রেখে দিয়েছে ব্ল্যাক মেইল করবে বলে। যদি জানতে পারে সে সিমেনায় নামতে যাচ্ছে তাহলে সেখানেও হাজির হবে ছবি নিয়ে। কাল রাতে অদিতির মনে হয়েছিল সব ছেড়েছুড়ে এমন কোন জায়গায় চলে যাবে যেখানে লোকটার কালো ছায়া পৌঁছাবে না। ভেবেছিল, কিন্তু জায়গাটা কোথায় হদিস পায়নি।

আজ সকালে গাড়ি গিয়েছিল মেসে। পাশের খাটের মেয়েটি সবিস্ময়ে বলে উঠেছিল,'তোমাকে নিতে গাড়ি এসেছে, কি চাকরি করছ গো?'

'এখন নয়, পরে বলব।'

'তোমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করলেই বল পরে বলব, অথচ বল না।'

'এবার বলব।'

অন্য একজন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি নাকি মেস ছেড়ে দিচ্ছ?'

'বোধ হয়।'

সঙ্গে সঙ্গে পাশের মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'বিয়ে করবে?'

'বিয়ে? হঠাৎ বিয়ের কথা কেন।'

'তুমি যদি বিয়ে না কর তাহলে আমাকে তোমার সঙ্গে থাকতে দেবে?' ব্যাকুল চোখে তাকিয়েছিল মেয়েটি। অদিতির মনে হয়েছিল সেই কথাটা, নিজের থাকার জায়গা নেই যার সে শঙ্করাকে ডাকে?

গাড়ি থেকে নামামাত্র সামন্ত এগিয়ে এল, 'ওয়েলকাম, ওয়েলকাম, গুড মর্নিং। আপনার জীবনের প্রথম দিনে আমার অভিনন্দন। মিলন-দা এখন ফ্লোরে রয়েছেন, খুব ব্যস্ত। আপনাকে মেকআপ নিয়ে যেতে বলেছেন।'

সামন্ত তাকে মেকআপরুমে নিয়ে গেল। পর পর কয়েকটা ঘর। ছেলে এবং মেয়েদের আলাদা আলাদা। যারা খুব নামী তাদের একার জন্যে মেকআপ রুমের ব্যবস্থা আছে। মেকআপম্যান এবং ড্রেসারকে ডেকে সব বুঝিয়ে সামন্ত চলে গেল। অদিতি দেখল ঘরটা বড়। কয়েকটা চেয়ার ছাড়া একটা লম্বা ইজিচেয়ার রয়েছে। মেকআপম্যান বলল, 'আসুন দিদি।'

ওপাশের বড় আয়নায় আর একজন মেকআপ নিচ্ছিলেন। তাঁকে ঠিক চিনতে পারল না অদিতি। তার মেকআপ যখন চলছে তখন যিনি দরজা খুলে ঢুকলেন তাঁকে অনেক বাংলা ছবিতে দেখা গেছে। ঢুকেই তিনি বললেন,'এত তাড়াহুড়ো করে আসা যায়! উঃ। অ্যাই, জিনিসগুলো ওখানে রাখ। আমি একটু জিরিয়ে নিই।' বলেই ধপ্ করে ইজিচেয়ারে বসে শরীর এলিয়ে দিলেন। ওঁর সঙ্গে যে মেয়েটি ঢুকেছিল সে দুটো ব্যাগ টেবিলের উপর রাখল। আয়নায় ভদ্রমহিলাকে দেখতে পাচ্ছিল অদিতি।

'ও লক্ষ্মণ, আমার মেকআপ কি বলেছে?' শুয়ে শুয়ে ভদ্রমহিলা জানতে চাইলেন। তাঁর চোখ বন্ধ। দ্বিতীয় মেকআপম্যান জবাব দিল, 'আপনার মেকআপ আর কি হবে? যেমন আছেন। এই বয়সে রঙ মেখে লাভ কি।'

'একি রে! এ হতভাগার মুখে যে বোল ফুটেছে। এখনও যেটুকু গ্ল্যামার আছে তা উড়িয়ে দেওয়ার মতলব।' খ্যান খ্যান করে উঠলেন মহিলা। আর তারপরই গলা পাল্টালেন, 'ওটি কে?'

'হিরোইন। নবাগতা।' লক্ষ্মণই জবাব দিল।

'তাই বল। হঠাৎ মনে হল কাবেরীর ভূত দেখছি। কাবেরী বসু গো। বড় ভাল মেয়ে ছিল। এই যে মেয়ে, আয়নায় দেখছি, এবার একটু আমার দিকে তাকাও তো!'

মেকআপম্যান বিরক্ত হল, 'দিদি বড্ড বিরক্ত করছেন।'

'নে ছাড়। এক মিনিট কথা বললে মহাভারত অশুদ্ধ হয় না।' অগত্যা অদিতিকে তাকাতে হল। ভদ্রমহিলা তাকে দেখলেন। 'হুঁ। কাবেরীর সঙ্গে মিল আছে। এই প্রথম?'

'হ্যাঁ।'

'মিলনের আলুর দোষ নেই, প্রোডিউসারের যৌবনে একটু ছুঁকছুঁকানি ছিল, এখন সাধু হয়ে গেছে। তাহলে কার সুপারিশে ঢুকলে?'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।'

'অ। বাড়ি কোথায়?'

'কৃষ্ণনগর।'

'তাই বল! নদে জেলার লোকের যত দোষ থাক, জিভে রসগোল্লার রস। বুঝলে না? এখন লাইনের যা অবস্থা দক্ষিণা না দিলে চান্স পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। যারা নেয় তাদের দোষ দেব কি, যারা দিতে চায় তারাই আগ বাড়িয়ে বলে, নাও আমাকে নাও। একটা কথা মনে পড়ছে। চন্দ্রাবতী দেবীর নাম জানো? জানো না। হুঁ! বিরাট অভিনেত্রী ছিলেন। কানন দেবীর আমলে হিট্ নায়িকা। তিনি বলতেন, জানিস আমাদের আমলে খারাপ পাড়ার মেয়েরা ছবিতে অভিনয় করতে আসত। কারণ ভদ্রবাড়ির মেয়েদের তেমন পাওয়া যেত না। অভিনয় করতে এসে তারা কিন্তু এটাকেই ধ্যান জ্ঞান করে ভদ্র হয়ে যেত। আর এখন ভদ্রপাড়ার মেয়েরা আসছে দলে দলে। এসে চেষ্টা করছে কে কত আগে খারাপ হতে পারে।' মহিলা মাথা নাড়লেন, 'ঘুষ ছাড়া যেমন সরকারি অফিসে কাজ হয় না তেমনি কাপড় না খুললে আজকাল নায়িকা হওয়া যায় না।'

'হাতের পাঁচ আঙুল তো সমান নয়।' অদিতি কথা বলল।

'তা তো নয়ই।'

'তাই আপনি যা বলছেন আমার ক্ষেত্রে সে রকম অভিজ্ঞতা এখনও হয়নি। মিলনদা'র স্ত্রীর মাধ্যমে ওঁর সঙ্গে আলাপ হয়। তিনিই আমাকে এই সুযোগ দিয়েছেন।' অদিতি বলল।

মেকআপম্যান বলল, 'ব্যাস্, আর কথা নয়। দেরী হয়ে যাবে।'

শাড়ি জামা পরার পর আয়নার সামনে দাঁড়াতেই মন ভাল হয়ে গেল অদিতির। এত সুন্দর সে? সঙ্গে সঙ্গে লোকটার কথা মনে পড়ল। গতকালই বলেছে, চেহারা বেশ টসটসে হয়েছে। টসটসে শব্দটাকে এত অশ্লীল বলে কখনও মনে হয়নি।

হাততালি শেষ, হল্-এ প্রোডিউসার ছোট ভাষণ দিয়ে রাজনৈতিক নেতাকে বক্তব্য রাখতে বললেন। নেতা বললেন,'এটা তো রাজনৈতিক মঞ্চ নয়। সিনেমা সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় মাধ্যম। তাই এই শিল্পে জড়িত কর্মীদের আমি অনুরোধ করব যাতে সুস্থ সংস্কৃতির কথা মনে রাখেন।'

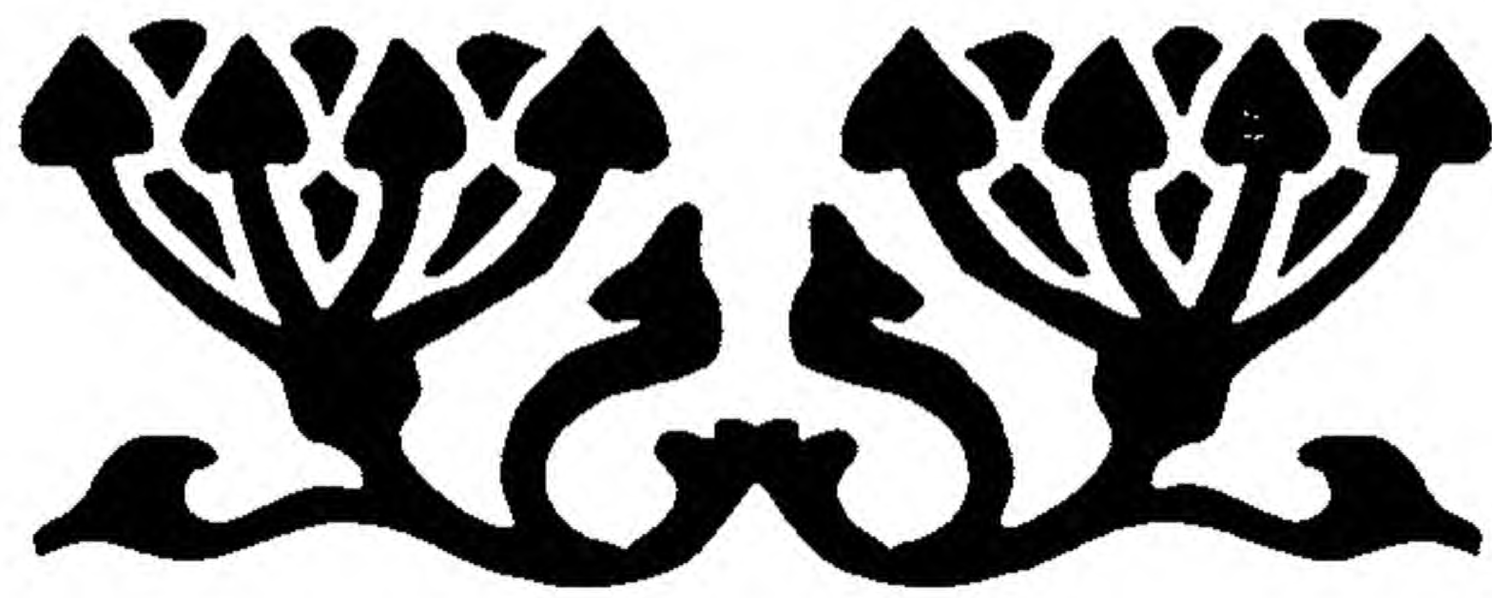
প্রচুর হাততালি পড়ল। রাজনৈতিক নেতা এত অল্পে ভাষণ শেষ করবেন তা কেউ ভাবতে পারেনি। এরপর পরিচালক হিসেবে মিলন প্রত্যেকের শুভেচ্ছা এবং আশীর্বাদ প্রার্থনা করে বলল, 'এই ছবিতে নায়িকার চরিত্রে আমরা একজন নবাগতাকে নির্বাচন করেছি। বাংলা ছবির নায়িকার অভাব যে কতটা প্রকট তা আপনারা জানেন। সত্যি কথা বলতে কি আমার এই ছবির নায়িকা নির্বাচন করতে গিয়ে হিমশিম খেয়েছিলাম। আমি আপনাদের সঙ্গে নবাগতা অদিতির পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি। অদিতি, এদিকে এসো।'

একপাশে সকলের আড়ালে দাঁড়িয়ে অদিতি অনুষ্ঠান দেখছিল। ডাক শোনামাত্র তার দুটো পা ভারী হয়ে গেল। কোনমতে হেঁটে এসে মিলনের পাশে দাঁড়িয়ে দর্শকদের নমস্কার করতেই হাততালি পড়ল এবং সেই সঙ্গে বাঃ, চমৎকার ইত্যাদি মন্তব্য ভেসে এল। ক্যামেরাম্যানরা ঘন ঘন ছবি তুলতে থাকল। ছবি তুলে তাদের যেন আশ মিটছিল না। খুব নার্ভাস লাগছিল অদিতির।

সেই নার্ভাসনেস তাকে ছেড়ে গেল না যখন সে একটু পরে সংলাপ বলল। সেই মহিলা তার সহ-অভিনেত্রী হয়েছেন। দৃশ্যটি হল মহিলা তার মাসীমা, তাকে বলছেন রোজগার করতে। তার উত্তরে অদিতিকে বলতে হবে, 'আমি তো কত জায়গায় দরখাস্ত করেছি, একটা জায়গা থেকেও কোন ডাক আসছে না। আমি কি করে রোজগার করব বুঝতে পারছি না।' তার উত্তরে মাসীমা বলবে, 'ওসব শুনতে চাই না। আমি তোকে এক মাস সময় দিলাম। এর মধ্যে না পারলে নিজের ব্যবস্থা নিজে করে নিস।'

কথা বলতে গেলেই চোখে আলো পড়ছে। পা ভারী, গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। সংলাপ ভুলে যাচ্ছে অদিতি। দু-বার রিহার্সেল দেয়ার পরেও মনিটরের সময় গোলমাল হচ্ছে। দর্শকরা উশখুশ করছেন। আর প্রোডিউসার দাঁতে দাঁত চাপছেন। মিলন এগিয়ে গেল অদিতির পাশে। ফিসফিস করে বলল, 'তুমি ভুলে যাও অভিনয় করছ। কদিন আগে তোমার নিজের অবস্থার কথা ভাবো। কি কষ্ট করে তোমাকে রোজগার করতে হয়েছে। সেটা ভেবে সংলাপ বল।' অদিতি চোখ বন্ধ করল। মিলন চেঁচাল, 'লাইটস। সাউন্ড। স্টার্ট ক্যামেরা। অ্যাকশন!'

অদিতি সংলাপটা বলল। অন্য রকম গলায়। অদ্ভুত আর্তি ফুটে উঠল তার কণ্ঠস্বরে। মিলন কাট্ বলার পর হাততালির পায়রা উঠল। প্রোডিউসার ছুটে এলেন সামনে, 'সাবাস।'



[ষোল]

স্যুটিং শেষ হওয়ার পর নিজের অফিসে কিছুক্ষণ বসেছিল মিলন। সারাদিন কাজ করে একটু আড্ডা মারতে মাঝে-মাঝেই ইচ্ছে করে। এইসময় ফকিরবাবু এলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে বললেন, 'দাদা, নমস্কার।'

তখন ঘরে সামন্তবাবু ছাড়া আর কেউ নেই। মিলন হাসল, 'আরে! আসুন, আসুন, কি খবর আপনার?'

'আমার আর খবর! আপনি ছবি শুরু করছেন অথচ আমি একটা পার্ট পেলাম না। আমার ভাগ্যটাই এইরকম দাদা।' ফকিরবাবু হাত জড়ো করে রেখেছিলেন।

'আহা। সবে তো শুরু করেছি। কিন্তু ফকিরবাবু—।'

'ফকির কখনও বাবু হয় না দাদা, ফকির ইজ ফকির!'

'ও, তাই তো!'

'কথাটা আমি উত্তমবাবুকেও বলেছিলাম।'

'আপনি দয়া করে চেয়ারে বসে কথা বলুন।'

ফকিরবাবু বিনীত ভঙ্গীতে আদেশ পালন করলেন। ভদ্রলোকের উচ্চতা পাঁচ ফুটের বেশি নয়। মাথায় ঝাঁকড়া কোঁচকানো চুল। ঠোঁটের ওপর প্রজাপতি গোঁফ। চট্ করে চার্লি চ্যাপলিনকে মনে করিয়ে দেয় ওঁর চেহারা।

'আপনার সঙ্গে উত্তমকুমারের আলাপ ছিল?' সামন্ত জিজ্ঞাসা করল।

'একি রে! ছিল মানে? প্রত্যেক সপ্তাহে একদিন ওঁর ময়রা স্ট্রীটের বাড়িতে যেতাম। চিঁড়েভাজা আর মোয়া খেতে খুব ভালবাসতেন। আমায় দেখেই বলতেন, আসুন আসুন ফকিরবাবু, কি খবর? আমি বলতাম, দাদা, ফকির কখনও বাবু হয় না। শুনে হো হো করে হেসে উঠেছিলেন। হাসতে হাসতেই বলেছিলেন, বেণু, দ্যাখো ফকির মাইনাস বাবু এসেছেন।'

'তারপর?' সামন্তর চোখ বিস্ফারিত।

'সত্যিকারের সজ্জন ছিলেন। আমায় বলতেন, কে আপনাকে ছবিতে নিচ্ছে না? বলুন আমি বলে দেব। আর আজকালকার হিরোদের দেখুন। বাপের বয়সী এই আমাকে দেখে ইয়ার্কি করে, এই ফোকরে, এদিকে আয় বে।' ফকিরবাবুর গলা ধরে এল, 'অভিনয় আমার নেশা। সেই নেশার টানে এখনও টালিগঞ্জে আসা বন্ধ করতে পারিনি দাদা।'

'আপনি কতগুলো ছবিতে অভিনয় করেছেন?' মিলন জিজ্ঞাসা করল।

'ওয়ান হান্ড্রেড অ্যান্ড এইট্টি ফাইভ।'

'সেকি? এত?'

'তার মধ্যে পঁয়ত্রিশটা ছবিতে কাজ করে টাকা পেয়েছি। বাকিগুলোর টাকা

প্রোডাকশন ম্যানেজাররা পাঁইট খাবে বলে মেরে দিয়েছে।'

'সেকি?'

'সে সময় ওরকম হত।'

'আপনি থাকেন কোথায়?'

'স্টুডিও থেকে হাওড়া স্টেশন, এক ঘণ্টা। সেখান থেকে ট্রেন ধরে আরও দেড় ঘণ্টা গিয়ে বাসে উঠতে হবে। আধঘণ্টার বাস। তারপর সাইকেলে কুড়ি মিনিট আমাদের গ্রাম। তা হল গিয়ে সাড়ে তিন ঘণ্টা। ওটা চার ধরুন।'

'সেকি? এতদূর থেকে যাতায়াত করেন?'

'সন্ধ্যে সাতটার পর স্যুটিং শেষ হলে পারি না। লাস্ট বাসটা রাত সাড়ে নটায় চলে যায়। সে-রাতে কলকাতায় ভাগ্নের বাড়িতে থাকি। তখন মদনের মা খুব চিন্তা করে দাদা। চিন্তা করতে করতে তেতাল্লিশ কেজি হয়ে গেছে।'

'মদনের মা কে?'

'আর বলবেন না। চরিত্র-রক্ষা করার জন্যে আমার পিতৃদেব মাত্র বাইশ বছর বয়সে যে পনের বছরের কাপড়ের পুঁটুলিকে আমার ঘাড়ে চাপিয়ে গিয়েছিলেন, যে পুঁটুলি একের পর এক পাঁচটি সন্তানের জন্ম দিয়ে আমার হাড়ে দুব্বো গজিয়ে দিয়েছে তার নাম মদনের মা।'

সামন্ত যেন বুঝতে পারল, 'আপনার স্ত্রী!'

'এ দেখছি টিউবলাইট। লেটে জ্বলে। আচ্ছা দাদা, আজ বিরক্ত করব না। একটু মনে রাখবেন।' উঠি উঠি ভাব করল ফকিরবাবু।

মিলন বলল, 'এখন তো সবে ছটা। হাতে যখন সময় আছে তখন আপনার মদনের মা সম্পর্কে কিছু বলুন না।'

'কি বলব দাদা। মানুষটার একটাই শখ আর সেটা আমি মেটাতে পারলাম না।'

'কি শখ?'

'উনি রোজ ঠাকুরঘরে গিয়ে পাঁচালি পড়েন, "ঠাকুর তুমি কত নিষ্ঠুর। এত মেয়ের স্বামী নিলে আমায় কেন কর ফতুর। ঠাকুর তুমি কত নিষ্ঠুর।" '

মিলন হকচকিয়ে যায়, 'একি বলছেন?'

মাথা নাড়েন ফকিরবাবু, 'ওর কোন দোষ নেই দাদা। আমাদের পাশের গ্রামটার নাম বিধবা গ্রাম। নাইনটি পার্সেন্ট মেয়েছেলে বিধবা।'

'কেন?' সামন্ত উত্তেজিত।

'স্বামীরা সব রেলে কাজ করত। একুশ বছর বয়সে আমিও রেলের চাকরিতে ঢুকি। রেলের নিয়ম হল, চাকরি করতে করতে স্বামী মারা গেলে বিধবা বউ চাকরি পাবে। তা ধরুন, স্বামী মাইনে পায় পাঁচ হাজার। সে মারা গেলে বিধবা পেনশন, গ্র্যাচুইটি, প্রভিডেন্ড ফান্ড সব বিধবা পাবে, প্লাস একটা চাকরি। সব যোগ করলে মান্থলি ইনকাম বেড়ে সাড়ে সাতহাজার হয়ে যাবে, প্লাস একটা খাওয়ার লোক কমে

যাবে। তা ধরুন, চল্লিশের নিচে কোন রেলকর্মীর বউ স্বামী একটু বেশি অসুস্থ হলেই বি আর সিং হাসপাতালে নিয়ে যায়। ওটা রেলের হাসপাতাল। ভর্তি করে ডাক্তারবাবুকে গিয়ে ধরে। "ডাক্তারবাবু, বেশি দিতে পারব না, পাঁচ হাজারে ব্যবস্থা করুন।"

ডাক্তার বলেন, "না না, পাঁচে হবে না। দশ আনুন।" তাই আনা হল। রাত দুটোয় ঘোষণা করা হল, তিন নম্বর ওয়ার্ডের সাতনম্বর পেশেন্ট্ চলে্ গেছেন।'

মিলন বিশ্বাস করতে পারছিল না, 'একি বলছেন?'

'একেবারে সত্যি কথা। বিধবার বয়স যদি পঁয়ত্রিশের নিচে হয় তাহলে অফিসের ঠাকুরপোরা শ্রাদ্ধ চুকে যাওয়ামাত্র তাকে নিয়ে যাবে বড় সাহেবের কাছে, "স্যার অরিজিন্যাল বিধবা। ভেরি আনফরচুনেট, এখনই চাকরি দিন।" সাহেব বলবেন, "আরে এখনও তিনশো বিধবা লাইনে ওয়েট করছে।" অফিসের ঠাকুরপোরা বলবে, "তারা সব অ্যাভব ফর্টি। আমরা ইন্টারেস্টেড নই। একে চাকরি না দিলে বাড়ি ফিরতে পারবে না চাঁদু।" অতএব বউদির চাকরি হয়ে গেল। প্রথমদিন সাদা শাড়ি পরে অফিসে এলেন তিনি। এসে অ্যাটেনডেন্স খাতার ওপর কেঁদে ভেঙে পড়লেন। জলে জলে সেই পাতার সব লেখা মুছে গেল। ঠাকুরপোরা এটা শিখিয়ে দিয়েছিল তাকে যাতে হাজিরা খাতায় তাদের অনুপস্থিতির রেকর্ডটা নষ্ট হয়ে যায়। তা বউদি চাকরিতে যোগ দিলেন কিন্তু কোন কাজ জানেন না। কিন্তু কোন ক্ষতি নেই। প্রতি সপ্তাহে তার সাদা শাড়িতে রঙ লাগা শুরু হল। মাস দুয়েকের মধ্যে পাছায় ফুল ফুটল। টিফিনের সময় অফিসের বাইরে খাবারের দোকানগুলোর সামনে যেতেই এক ঠাকুরপো কাটলেট নিয়ে এগিয়ে আসে তো আর এক ঠাকুরপো বলে, বউদি আপনাকে এই ফ্রাইটা খেতেই হবে, প্লি-ই-জ। আবার কোন কোন ঠাকুরপো ম্যাটিনি শো-এর টিকিট দেখায়। বউদি বলেন, কি করে অফিস থেকে বেরুবো ভাই। ঠাকুরপো পরামর্শ দেয়, "বসকে বলুন শরীর খারাপ, ওই...মেয়েদের যে শরীর খারাপ হয়। ওটা শুনেও আটকাবে এমন কোন অফিসার রেলে জন্মায়নি।" ব্যাস, বউদি চলল সিনেমায়। এসব তো তার বিয়ের পর কখনও কপালে জোটেনি। ফলে পঁয়তাল্লিশ কেজি নিয়ে ঢুকে ষাট কেজি হয়ে যেতে সময় লাগল না তার। একটা কথা বলি দাদা, আর কয়েকবছর পর রেলে বিধবা আর খেলোয়াড় ছাড়া অন্য কাউকে দেখবেন না। আর এই বিধবারা চাকরি করবে তাদের আশি বছর বয়স পর্যন্ত। কারণ বিধবা হওয়ার পর যখন চাকরিতে ঢোকে তখন যার পঞ্চাশ সে বয়স বলে আটাশ। বার্থ সার্টিফিকেট নেই তো, এফিডেভিট করলেই চলে যায়। হাওড়া স্টেশনে এক দিদিমা চেকার আছে। ফোকলা মুখে টিকিট চায়। তা এইসব দেখেশুনে মদনের মায়ের তো বাসনা হতেই পারে যে সে বিধবা হয়ে ওজন বাড়াতে আমার জায়গায় চাকরি করতে যাবে। পাশের গ্রামে অত বিধবা তবু সে বিধবা হতে পারল না। ব্যাপারটা মনে এলে এত খারাপ লাগে যে কি বলব। ওকে বিধবা হওয়ার সুযোগ না দিয়ে আমি চাকরি থেকে

অবসর নিয়ে ফেললাম। আর ওর চান্স থাকল না চাকরি পাওয়ার। আচ্ছা দাদা, আজ উঠি।' ফকিরবাবু চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লেন।

মিলন বলল, 'আপনি কাল একবার আসতে পারবেন?'

'সিওর।'

'তাহলে আসুন। তিনদিনের কাজ আছে। আপনাকে লাগবে।'

'সত্যি বলছেন?'

'বাঃ, মিথ্যে বলব কেন?'

'কিন্তু দাদা, আমি কিন্তু পাঁচশো টাকার নিচে কাজ করি না।'

'আপনাকে আমরা হাজার দেব।'

'সত্যি। আপনি ভাল লোক। আচ্ছা, আপনি নতুন মেয়েকে নায়িকা করেছেন, না? কী সাহস আপনার। শুনলাম খুব ভাল করছে।'

'আসুন না সেটে, এসে দেখুন।'

'নিশ্চয়ই দেখব। চলি।'

'একটা কথা ফকিরবাবু, আপনার স্ত্রী ছবি দ্যাখেন তো?'

কয়েক মুহূর্ত ভাবলেন ফকিরবাবু। তারপর ধীরে ধীরে মাথা নাড়লেন, 'না।'

'কেন? আপনার ছবিও দ্যাখেন না!'

'না। আমি তো ছবিতে চাকর-বাকরের রোল করি। ও লোকমুখে সেটা শুনেছে। আমাকে চাকরবেশে ও সহ্য করতে পারবে না।' ফকিরবাবু চুপচাপ বেরিয়ে গেলেন।



[সতেরো]

প্রোডিউসার গাড়ি দিতে চেয়েছিলেন, মিলন রাজি হয়নি। পুরনো অভ্যেসটা নষ্ট হয়ে গেলে পরে বিপদে পড়তে হবে। সামন্তর সঙ্গে অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে সে স্টুডিওর সেই বিখ্যাত বেদীর পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল, 'দ্যাখো সামন্ত, এই ফকিরবাবুকে দেখে বোঝাই যায় না তিনি নিজেকে নিয়ে এমন রসিকতা করতে পারেন। স্ত্রী ওঁর মৃত্যু চাইছিলেন চাকরির জন্যে এটা নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করছ না? বরং মনে রেখো, ওঁকে চাকরচরিত্রে ভদ্রমহিলা সহ্য করতে পারেন না। তার মানে ফকিরবাবুকে তাঁর স্ত্রী কতখানি ভালবাসেন!'

'হ্যাঁ দাদা। লোকটার সম্পর্কে ধারণা বদলে গেল।' সামন্ত বলল।

ওরা দাঁড়িয়েছিল যে বেদীটির পাশে সেখানে এককালে রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন। একটা ছাউনি করা আছে। বিকেল আসলে নামী অভিনেতারা এককালে ওখানে জড়ো হতেন আড্ডার জন্যে। এখন অযত্নে পড়ে আছে। মিলন যেসময় প্রথম সিনেমা-লাইনে এসেছিল তখনও শিল্পীদের নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক আন্তরিক ছিল। বয়স্করা শ্রদ্ধা পেতেন, ছোটদের সমস্যায় বয়স্করা পাশে এসে দাঁড়াতেন। এখন আর ওসব কেউ চিন্তাও করে না।

এই সময় স্টুডিওতে গাড়িটা ঢুকল। প্রযোজকের গাড়ি। এই সময়ে তাঁর এখানে আসার কথা নয়। কোন সমস্যা হয়েছে ভেবে এগিয়ে গেল মিলন। দরজা খুলে নিচে নেমে প্রযোজক বললেন, 'আরে! তুমি এখনও এখানে?'

'এই বাড়ি যাচ্ছিলাম! আপনি কি আমার কাছে এসেছেন?'

'সন্ধ্যের পর তোমাকে আমার দরকার হবে কেন? হ্যাঁ, তোমার নতুন নায়িকার মতলব কি বল তো? তার জন্যে ফ্ল্যাট ঠিক করে দিলাম অথচ সে এখনও যাচ্ছে না! এদিকে চারপাশ থেকে আমাকে শাসানো হচ্ছে আমি ভুল করেছি।'

'ফ্ল্যাটের ব্যাপারে আমি ওর সঙ্গে কথা বলব। কিন্তু ছবি রিলিজ হলে দেখবেন যারা আজ আপনার কান ভারী করার চেষ্টা করছে তারা কথা গিলতে বাধ্য হচ্ছে। ওর কাজে আমি সন্তুষ্ট।' মিলন বেশ জোর দিয়ে বলল।

'ঠিক আছে, তুমি যাও, কাল তো স্যুটিং আছে।' প্রযোজক বললেন।

অতএব মিলন এগোল গেটের দিকে। সামন্ত দৌড়ে পাশে এসে বলল, 'কি ব্যাপার দাদা? প্রযোজক কোন্ ধান্দায় এই সময় স্টুডিওতে এসেছেন?'

'আমাকে বলতে চাইলেন না।'

'আপনি একটু অপেক্ষা করবেন, আমি দেখছি উনি কার কাছে যাচ্ছেন।'

'কি দরকার সামন্ত। উনি এ লাইনে পুরনো লোক। অনেকের সঙ্গে জানাশোনা আছে, যেখানে ইচ্ছে সেখানে যেতে পারেন।'

'তা নিশ্চয়ই পারেন। এখন রাত সাড়ে সাতটা। স্টুডিও প্রায় ফাঁকা। এই সময় উনি কখনও আসেন না। মনে হচ্ছে কোন গোলমাল হবে। আপনি ওই বেদীর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়ান, আমি আসছি।' সামন্ত চলে গেল।

ব্যাপারটা পছন্দ হল না মিলনের। যে কোন লোক তার নিজস্ব প্রয়োজনে কোথাও গেলে এইরকম খোঁজ-খবর নেওয়া ঠিক নয়। সামন্তের সব ব্যাপারে কৌতূহল। আর এই কৌতূহলের খবর জানলে প্রযোজক নিশ্চয়ই রুষ্ট হতে পারেন।

মিলন দেখল তিনটে মেয়ে ভেতর থেকে হাঁটতে হাঁটতে আসছে। এরা সবাই এক্সট্রার কাজ করে। বেদীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকায় অন্ধকারে তারা মিলনকে দেখতে পায়নি। একজন বলছিল, 'ইস্, বলে কি, ডে নাইট তিনশো টাকা দেবে। আমরা কি ফ্যালনা?'

'এর আগের বার আউটডোরে পাঁচশো টাকা দেবে বলে দু'শো দিয়েছিল। ঝগড়া করতে বলল, রাতের বেলায় তো তোমাদের কাজে লাগানো হয়নি। এই প্রোডাকশন ম্যানেজারটা না এক নম্বরের হারামি।' দ্বিতীয়জন বলতে বলতে চলে গেল।

টালিগঞ্জের সিনেমায় মাঝে মাঝেই এমন মেয়ে দরকার হয় যাদের মুখে কোন সংলাপ নেই। তারা হয় কাজের মেয়ে অথবা সখীর দল। বিয়ে-বাড়ির ভিড় বাড়াতেও তাদের প্রয়োজন। এরা তেমন সুন্দরী নয়, অনেকে তো দেখতে বেশ খারাপ। ওইরকম কোন দৃশ্য থাকলে ওদের ডাক পড়ে। প্রোডাকশন ম্যানেজার ঝাড়াই বাছাই করে সহকারী পরিচালকের কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিছুক্ষণ ক্যামেরার সামনে থাকলে ওদের দেড়শো দু'শো দেওয়া হয়। এই রকম কয়েকটা কাজ পেলে ওদের সংসার চলে। মিলন জানে কেউ কেউ টাকার লোভ দেখিয়ে ওদের অপব্যবহার করে। বিশেষ করে যাদের শরীরস্বাস্থ্য ভাল। যারা লোভী হতে চায় না তাদের কাজ কমে যায়। এই দুটো মেয়ের জন্যে কষ্ট হচ্ছিল মিলনের। তারপরেই সে খেয়াল করল কথাটা, পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের দুঃখ দূর করার ইজারা নিয়ে সে বসে নেই।

কথাটা বলেছিলেন একজন বিখ্যাত অভিনেতা। উত্তমকুমার যখন ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হচ্ছেন তখন ইনিও নায়ক চরিত্রে অভিনয় করছেন। সে সময় দুজনের অভিনয় ক্ষমতা নিয়ে তর্কবিতর্ক চলত। ক্রমশ ইনি চলে এলেন চরিত্রাভিনয়ে। সামান্য কিছু ম্যানারিজম ছাড়া অভিনেতা হিসেবে ছিলেন অনবদ্য এবং মানুষ হিসেবে অতুলনীয়। কলাকুশলীদের বিপদে পাশে দাঁড়াতেন। তিনি বলেছিলেন, 'গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা যায় না মিলন। যে শিল্পী নয় তাকে শিল্পী বানাবার চেষ্টা করছ কেন? পৃথিবীর নির্যাতিত মানুষের দুঃখ দূর করার ইজারা নিয়ে বসে আছ নাকি?'

সামন্ত ফিরে এল বেশ উত্তেজিত হয়ে। 'চলুন দাদা, পা চালান।'

'কেন?' মিলন হাঁটা শুরু করল।

'বাইরে বেরিয়ে বলছি।'

স্টুডিওর গেটের বাইরে আসতেই ট্যাক্সি পাওয়া গেল। অন্যদিন এখান থেকে বাসে ওঠে মিলন, বাস খালি পাওয়া যায়। আজ সামন্তর উত্তেজনা দেখে সে ট্যাক্সি নিল।

ট্যাক্সিতে বসে সামন্ত বলল, 'উনি কার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন জানেন? আমরা ভেবেছিলাম কোন সম্পর্ক নেই।'

'কার সঙ্গে?'

'মিসেস দত্ত।'

'সেকি? উনি এখন স্টুডিওতে আছেন?'

'হ্যাঁ। ফেলু বোসের ছবির হিরোইন। মেকআপ রুমে বসে আছেন। আমাদের প্রযোজক সেখানে ঢুকতেই গোলাগুলি শুরু হয়ে গেল।'

'তার মানে?'

'মেকআপম্যান তখনও ভেতরে ছিল। তার সামনে মিসেস দত্ত বললেন, তুমি ভেবেছ কি? আমাকে একবারও না জানিয়ে নতুন মেয়েকে নায়িকা করে ছবি বানাচ্ছ? কেন? আমি কি পুরনো হয়ে গিয়েছি? প্রযোজক বললেন, তুমি বুঝতে পারছ না কেন, এতে আমার কোন হাত নেই। মিলন যাকে পছন্দ করেছে তাকেই নিতে হয়েছে। মিসেস দত্ত আরও গলা তুললেন, ''ইয়ার্কি? তোমার টাকা আর মিলন পছন্দ করবে? নাকি, আমি ঘুমিয়েছিলাম আর মিলন আমার হাতের গড়গড়ায় তামাক খেয়ে গেল! আমি কোন কথা শুনতে চাই না। মেয়েটাকে বাদ দাও।'' সামন্ত এক নিঃশ্বাসে বলে গেল।

মিলনের বুকে ধ্বক করে উঠল, 'তারপর?'

'প্রযোজক বললেন, ''কয়েকদিন স্যুটিং হয়ে গিয়েছে, কি করে বাদ দেব?''

''আমি ওসব জানি না, স্যুটিং হয়েছে তো কি করা যাবে। লাখ খানেক নষ্ট হবে, তার বেশি তো নয়।''

''কিন্তু ওই চরিত্রে কে করবে?''

''কেন? আমি কি মরে গেছি?''

''না না। তবে বয়সে তোমাকে মানাবে না।''

''মেকআপে বয়স কমিয়ে নেব। আমার স্কিনটোন কি খারাপ?''

''না। তা নয়। তুমি একটু ভারী হয়ে গেছ।'' প্রযোজক বললেন, ''নইলে তোমাকে বাদ দিয়ে নতুন নেওয়ার কথা কি ভাবতে পারি?''

''আমাকে জানাওনি কেন?''

''আসলে এত ঝটপট সব হয়ে গেল। তুমি তো আমার আগের দু-দুটো ছবির হিরোইন করেছ। করনি? প্লীজ, রাগ করো না।''

''মেয়েটার সঙ্গে কতদূর এগিয়েছ?''

''এক ইঞ্চিও না। মাইরি বলছি। তোমার বিকল্প আমি ভাবতে পারি না।''

এই অবধি বলার পর মেকআপম্যানকে ঘর থেকে বের করে দিয়েছে ওরা।' সামন্ত মাথা নাড়ল, 'কি হবে দাদা?'

'কিসের কি হবে?'

'প্রযোজক যদি মিসেস দত্তকে ঢোকাতে চান?'

'আমি বেরিয়ে যাব। ওঁর মেয়ের বয়সী চরিত্রে ওঁকে নিতে পারব না।'

'আপনি বেরিয়ে গেলে আমি না খেয়ে মরব দাদা। তার চেয়ে প্রযোজককে বোঝালে হয় না?'

'উনি নিজে থেকে না বললে কি করে বোঝাবে? তুমি যে মেকআপম্যানের কাছ থেকে শুনেছ এটা বলতে পারবে?'

রাতের খাওয়া শেষ করে শুয়ে পড়েছিল মিলন। এই সময় বেল বাজল। ওর স্ত্রী বলল, 'এত রাতে কে এল?'

মিলন বলল, 'আমি দেখছি।'

দরজা খুলে সে হতভম্ব। প্রযোজক দাঁড়িয়ে আছেন।

'আপনি? আসুন আসুন।'

'এত রাতে বিরক্ত করার জন্যে দুঃখিত। শোন, কাল সকালের ফ্লাইটে আমি বাইরে যাচ্ছি। টাকা পয়সার সব ব্যবস্থা করে যাচ্ছি যাতে তোমার স্যুটিং-এর কোন সমস্যা না হয়। মন দিয়ে কাজটা করো।'

'আপনি কবে ফিরবেন?'

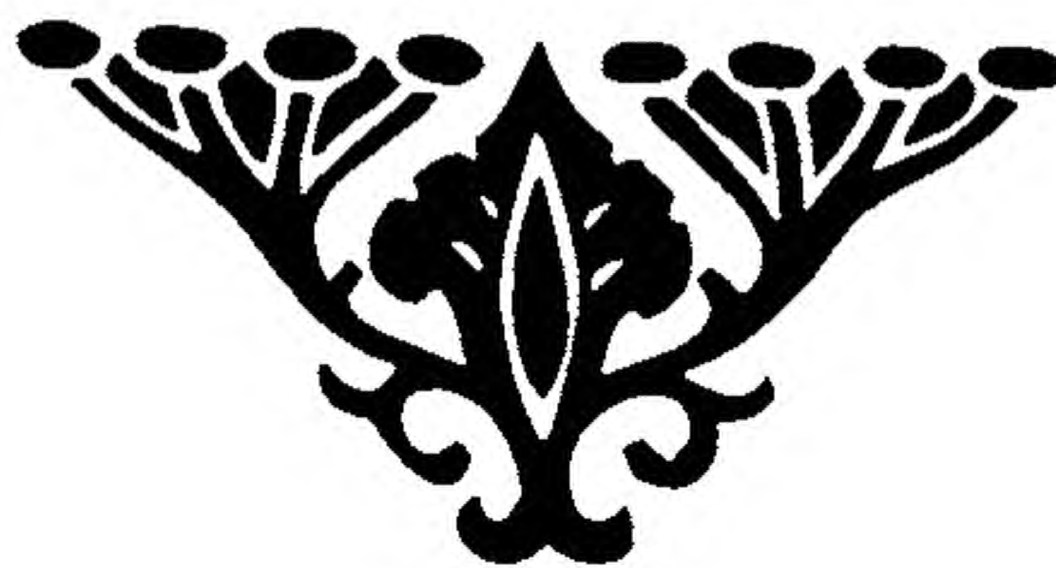
'বলতে পারছি না। মাসখানেক লাগতে পারে। ঠিক আছে?' প্রযোজক ঘুরে দাঁড়ালেন। বাইরে তাঁর গাড়ি রয়েছে। কয়েক পা এগিয়ে আবার পেছনে তাকালেন, 'মিলন, মেয়েটার ব্যাপারে তুমি স্যাটিসফায়েড্ তো?'

'কোন্ মেয়ের কথা বলছেন?'

'আঃ। আমাদের নতুন হিরোইন!'

'হ্যাঁ। নিশ্চয়ই। এ ছবি ওকে জনপ্রিয় করবেই।'

'তাহলে ঠিক আছে।' প্রযোজক চলে গেলেন। মিলনের আচমকা মনে হল, ভদ্রলোক পালাচ্ছেন। মিসেস দত্ত খবরটা জানেন না।



[আঠারো]

সকালে ঘুম থেকে উঠে অদিতি চিৎকার শুনল। মেসের দুই কাজের মাসী নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করছে। সে পাশ ফিরে শোওয়ার চেষ্টা করল। এই সময় কানে এল পাশের খাটের মেয়েটির গলা, 'অদিতিদি—!'

অদিতি তাকাল। মেয়েটি মুখ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। ওর হাতে একটা খবরের কাগজ। মেয়েটি বলল, 'তুমি সিনেমায় নেমেছ?'

মেয়েটির গলার স্বরে এত উত্তেজনা ছিল ঘরের তৃতীয় মেয়েটি বিছানা ছেড়ে চট করে উঠে বসল। অদিতি একটু অস্বস্তিতে পড়ল, 'হঠাৎ?'

'এই দ্যাখো, তোমার ছবি বেরিয়েছে। কী সুন্দর দেখাচ্ছে!' মেয়েটি খবরের কাগজ এগিয়ে দিল। কাগজের পাতায় চোখ রাখল অদিতি। বাংলা ছবিতে নবাগতা অদিতি, নিচে তার ছবি। অনেকটা বড়।

মেয়েটি গড়গড় করে চেঁচিয়ে ছবির পাশে ছাপা খবর পড়তে লাগল। প্রথম দিনের কাজ খুব ভাল হয়েছে এবং পরিচালক মিলন মনে করেন অনেক দিন পরে বাংলা ছবির নায়িকার অভাব অদিতি মেটাতে পারবে।

তৃতীয় মেয়েটি জিজ্ঞাসা করল, 'কত টাকা দেবে গো?'

'জানি না' বলে অদিতি বাথরুমে চলে গেল। সে বুঝতে পারছিল এখনই এই খবরটা সমস্ত মেসে ছড়িয়ে যাবে। শুধু মেস কেন, তার পরিচিত সব মানুষই জেনে যাবে সে সিনেমায় নেমেছে। একটা কাগজে যখন ছাপা হয়েছে তখন অন্য কাগজ কি না ছেপে থাকবে? তার মানে ছবিটা সেই লোকটাও দেখবে। দেখে ছুটে আসবে মেসে। শরীর হিম হয়ে গেল অদিতির। লোকটাকে এড়িয়ে যেতেই হবে, যেমন করেই হোক।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে ঘরের দিকে পা বাড়াতেই ম্যানেজারকে ওপরে উঠে আসতে দেখতে পেল সে। হাত তুলে তাকে থামতে বললেন তিনি। কাছে এসে গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনি টাকাটা আজই নিয়ে যাবেন।'

'হঠাৎ?'

'দেখুন, এই মেসের আইন অনুযায়ী আমি আর আপনাকে এক মাসের অগ্রিম ফেরৎ দিতে বাধ্য নই। তবু দিচ্ছি, কারণ কোন ঝামেলা চাই না।'

'আমি আপনার কথা বুঝতে পারছি না।' অদিতি বলল।

'মেসে ঢোকার সময় একটা ফর্মে সই করেছিলেন। যদি আপনার বিরুদ্ধে পুলিশ কেস হয়, অসামাজিক কাজে জড়িয়ে পড়েন বা আপনার চরিত্রহানির কারণে অন্য বোর্ডারদের অসৎ পথে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাহলে আপনাকে অগ্রিম ফেরৎ না দিয়ে মেস ছেড়ে যেতে বলা হবে। মনে আছে?'

'আছে। কিন্তু এর কোনটা আমি করেছি বলে মনে হয় না।'

'আপনি জেনেশুনে যদি অন্ধ সাজতে চান তাহলে আমার বলার কিছু নেই। আপনার ছবি আজ কাগজে ছাপা হয়েছে। আপনি সিনেমায় নেমেছেন। সিনেমা লাইন কি রকম তা তো সবাই জানে! আমি আর কথা বাড়াতে চাই না। টাকাটা নিয়ে আজই সিট খালি করে দেবেন।' ম্যানেজার চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অদিতি। তারপর নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। সত্যজিৎ, মৃণাল, ঋত্বিক ঘটকরা কি এক চুল মানসিকতা বদলাতে সাহায্য করেননি? সিনেমা এখনও চরিত্রহীনদের আস্তানা?

ঘরে ঢোকামাত্র সে অবাক হল। আরও তিনজন মেয়ে এসে বসে আছে তার অপেক্ষায়। নতুন তিনজন তাকে দেখামাত্র একের পর এক প্রশ্ন শুরু করল। অদিতি বলল, 'এক সঙ্গে বললে আমি কয়টা জবাব দেব?'

একজন, যে কোন্ অফিসের টেলিফোন অপারেটর, খুব সাজে, নিজেকে সুন্দরী ভাবে এবং রাত দশটার আগে মেসে ফেরে না, সে বলল, 'কি করে চান্স পেলে ভাই?'

'এক ভদ্রমহিলার কাছে জিনিস বিক্রি করতে গিয়েছিলাম। ওঁর স্বামী সিনেমার পরিচালক। তিনি নতুন মুখ খুঁজছিলেন। আমার চেহারার সঙ্গে তাঁর ভাবনা মিলে গেল।'

'ব্যাস! এইটুকু?'

'হ্যাঁ।'

'ভাই, আমরা তো ঘাসে মুখ দিয়ে চলি না! এসব ব্যাপার সিনেমায় হতে পারে কিন্তু জীবনে হয় না। তোমাকে চেনে না জানে না, বউ-এর কথায় একেবারে নায়িকার ভূমিকায় নামিয়ে দিল? অসম্ভব? আসল কথাটা বল না!'

'এটাই তো আসল কথা।'

'তুমি যদি ভাঙতে না চাও তো আলাদা কথা। আসলে কি জানো, ঠিকঠাক লোক না পেলে পস্তাতে হয়। আমার এক বান্ধবী সিনেমায় নামবে বলে টালিগঞ্জে গিয়েছিল। সেখানে একজনের সঙ্গে আলাপ হয়। সে চান্স পাইয়ে দেবে বলে ডিরেক্টর প্রোডিউসারদের কাছে নিয়ে যেত। সবাই ওর সর্বনাশ করেছে কিন্তু কেউ চান্স দেয়নি। তুমি আসল লোককে বরাতজোরে পেয়ে গেছ বলে উৎরে গেলে। লোকটার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেবে?'

'আলাপ করালে কি করবে?' গলা শক্ত হয়ে গেল অদিতির।

'যদি সত্যি চান্স দেয় তাহলে যা চাইবে তা দিতে আমি রাজি। পাবো যখন তখন দেব না কেন?'

'বাঃ। ভাল। ঠিক আছে, সে রকম লোকের সন্তান পেলে তোমাকে বলব।'

এই সময় কাজের মাসী এসে বলল, 'একজন ডাকতে এসেছে।'

অদিতির বুকের বাতাস যেন আচমকা থেমে গেল, 'কে?'

'সেদিন এসেছিল। নাম বলেনি।'

অদিতি নিচে নেমে এল। দরজার সামনে সেই লোকটি দাঁড়িয়ে আছে যে তার কাছে প্রোডিউসারের চিঠি নিয়ে এসেছিল। স্বস্তি পেল সে।

'দিদি! সাহেব জানতে চাইলেন আপনি কি ফ্ল্যাটে যাবেন না?'

'কেন?'

'তাহলে সাহেব ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দেবেন।'

'আমি যাব। আমার স্যুটিং আজ বিকেলে। আমি এখনই যেতে চাই।'

'বেশ। চাবি আমার কাছে আছে। আপনার মালপত্র কি অনেক হবে?'

'না। একটা স্যুটকেস আর বেডিং।'

'তাহলে গাড়ির ডিকিতেই হয়ে যাবে।'

অদিতি ঘরে ফিরে এসে জিনিসপত্র গোছাতে লাগল। এখন ঘর খালি। পাশের খাটের মেয়েটি শুধু খবরের কাগজ পড়ছিল। বলল, 'তুমি কোথায় যাচ্ছ?'

'বলেছিলাম তো। মেস ছেড়ে দিচ্ছি।'

'আজই?'

'হ্যাঁ।' অদিতি কাজ করতে করতে বলল, 'একটা ফ্ল্যাটে থাকব।'

'একা?'

'আমি আবার দোকা পাব কোথায়?'

'আমাকে সঙ্গে নেবে?' কাতর গলায় বলল মেয়েটি।

অদিতি চোখ তুলে তাকাল। শ্যামলা রোগা মেয়ে। ওর অবস্থা খুব খারাপ। অথচ মেয়েটির স্বভাব বেশ ভাল। অদিতি জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি যাবে?'

মেয়েটি এগিয়ে এসে ওর হাত ধরল। 'আমাকে বাঁচাও দিদি। সামনের মাস থেকে মেসের টাকা দিতে পারব না। চিন্তায় পাগল হয়ে যাচ্ছি। একটা কাজও পাচ্ছি না।'

'বেশ। তাহলে তুমিও তৈরি হয়ে নাও।'

'তোমার কোন অসুবিধে হবে না তো!'

'আমাকে অনুরোধ করার আগে প্রশ্নটা করলে না কেন?' অদিতি গম্ভীর মুখে বলল, 'অসুবিধে থাকলে মুখের ওপর না বলে দিতে পারি আমি।'

মেসের ম্যানেজার জোর করলেন কোথায় যাচ্ছে জানিয়ে যেতে হবে, এটা নাকি নিয়ম। অদিতি সত্যি কথা বলতে চাইছিল না। সে জানে ম্যানেজারকে ঠিকানা দিলে লোকটা এসে যেভাবেই হোক তা জেনে নেবে। শেষ পর্যন্ত সে বলতে বাধ্য হল, 'কৃষ্ণনগরে।'

'আপনি কৃষ্ণনগরে ওকে নিয়ে যাচ্ছেন?'

'হ্যাঁ। আপনার আপত্তি আছে?'

'বেশ। এই সুলেখা, তুমি স্বইচ্ছায় মেস ছেড়ে যাচ্ছ?'

'আমি কি বাচ্চা মেয়ে যে অন্যের ইচ্ছায় যাব!'

'তুমিও কৃষ্ণনগরে যাচ্ছ?'

'শুনলেন তো! এক মাসের টাকা ফেরত দিন!'

অ্যাম্বাসাডার গাড়িতে বসে সুলেখা জিজ্ঞাসা করল, 'আমরা কোথায় যাচ্ছি?'

'রসা রোড, টালিগঞ্জ।'

'তোমার ফ্ল্যাট?'

'আমাকে থাকতে দেওয়া হয়েছে।'

'কত ভাড়া?'

'সেটা এখনও জানি না। অফিস থেকে যেমন বিনি পয়সায় ফ্ল্যাট দেয় এই ছবিতে কাজ করছি বলে আমায় তেমনি দেওয়া হয়েছে।'

সুলেখা আর কথা বলল না। অদিতি রাস্তার দিকে তাকাল। গাড়িতে বসে রাস্তা দেখলে কিরকম অচেনা লাগে। সে বলল, 'সুলেখা, তুমি নিশ্চয়ই মাঝে মাঝে মেসে যাবে দেখা করতে। কিন্তু আমাদের এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা কাউকে বলবে না।'

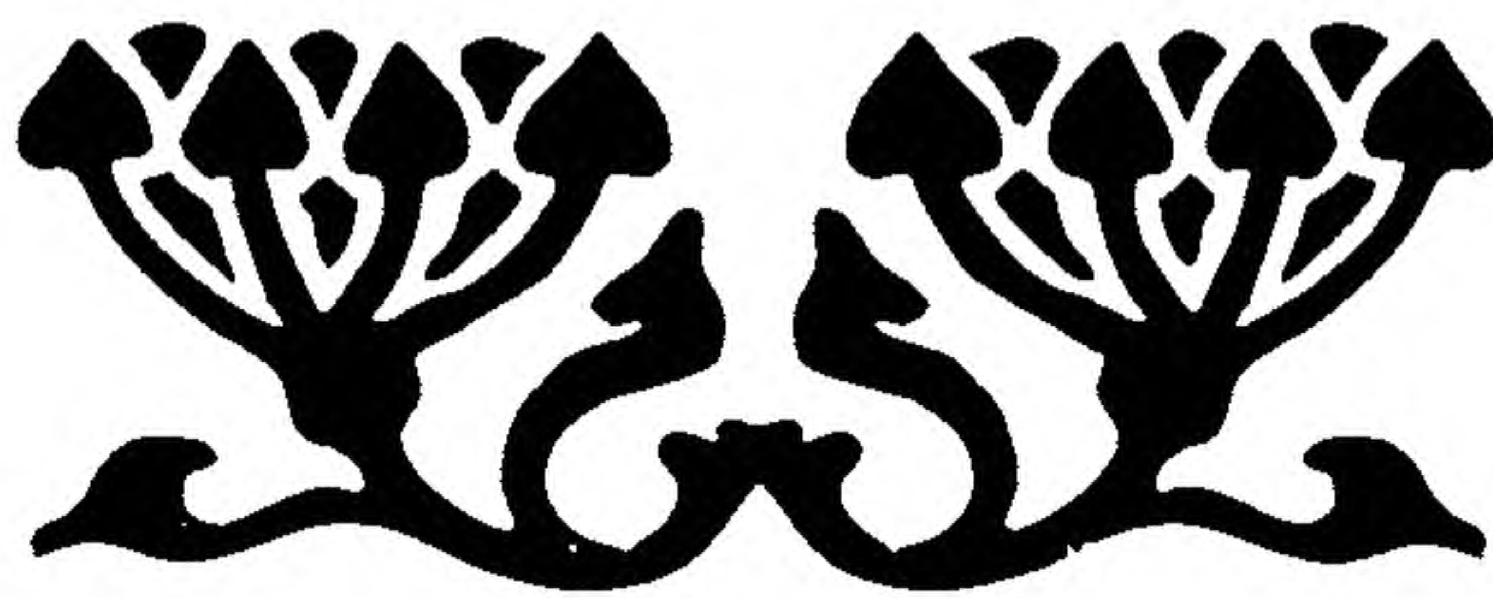
'কেন?'

'আমি চাই না কেউ জানুক।'

'আচ্ছা।'

'তুমি তো শুনলে সিনেমায় অভিনয় করেছি বলে ওই মহিলা কিরকম অশ্লীল প্রস্তাব দিল। যারা আমাকে এইরকম ভাববে তাদের আমি ঠিকানা জানাবো কেন?' অদিতি চোখ বন্ধ করল।

ড্রাইভারই মালপত্র তুলল। পাঁচতলা বাড়ির তিনতলায় ফ্ল্যাট। লিফট আছে। চাবি খুলে ভিতরে নিয়ে গেল ড্রাইভার। পা রাখতেই মন ভাল হয়ে গেল অদিতির। বিরাট বসার ঘর। তিনটে বেডরুম। অ্যাটাচ্ড্ বাথ। একটা ব্যালকনি। সুলেখা দৌড়ে গেল ব্যালকনিতে। খুব হাওয়া সেখানে। তিনতলা থেকে রাস্তা দেখতে দেখতে উল্লসিত হয়ে চেঁচাল সে, 'আমরা এখানে থাকব ভাবতেই পারছি না।'



[উনিশ]

অদিতি ঠিক করল রাত দিনের কাজের লোক রাখবে না। শুধু একটি ঠিকে লোক যদি সকালে ঘরদোর পরিষ্কার করে বাজার এনে দেয় তাহলেই চলবে। সুলেখাই জোর করল, 'দিদি আমি রান্না করব। দুজন মানুষের জন্যে কেন রান্নার লোক রাখবে!'

ঠিকে লোক পাশের ফ্ল্যাট থেকে যোগাড় হয়ে গেল। এই ফ্ল্যাটে সবরকম ফার্নিচার, বিছানাপত্র রয়েছে। যেন কারও সাজানো সংসারে তারা আচমকা এসে পড়েছে। সুলেখার উৎসাহ বেড়ে গেছে। এরই মধ্যে বাইরে বেরিয়ে সে কাছাকাছি দোকান বাজার দেখে এসেছে। সেই সঙ্গে এনেছে আজকের রান্নার সবজি, মাছ চাল ডাল। বারোটার মধ্যে রান্নাও হয়ে গেল। মেসের রান্নার তুলনায় অমৃত।

সুলেখা যে কী খুশী হয়েছে তা ওর হাবভাব দেখে বোঝা যাচ্ছিল। অদিতি বড় শোয়ার ঘর নিয়েছে, পাশেরটা সুলেখার। কলকাতায় একদম নিজের জন্যে একটা শোওয়ার ঘর পাবে তা কল্পনা করেনি সে। খাওয়া-দাওয়ার পর বলেই ফেলল সে, 'এই ফ্ল্যাটে আমার জিনিসগুলো একদম মানাচ্ছে না।'

'কেন?'

'কি রকম গরীব গরীব লাগছে।'

'আমরা তো রাতারাতি বড়লোক হইনি যে পুরনোগুলো ফেলে দেব!'

'আচ্ছা দিদি একটা কথা বলব?'

'কি কথা?'

'তোমার কাছে কি ফ্ল্যাটে থাকার কাগজপত্র আছে?'

'কেন?'

'যদি কেউ এসে দেখতে চায়? তুমি যখন থাকবে না তখন যদি এসে বলে তোমরা এখানে কি অধিকারে আছ, তাহলে কি বলব?'

কথাটা মাথায় ঢুকল অদিতির। সুলেখা ঠিকই বলেছে। এই ফ্ল্যাটে থাকার ব্যবস্থা প্রোডিউসার করে দিয়েছে বটে কিন্তু কোন কাগজপত্র তার হাতে নেই। মনে হওয়া মাত্র মন তেতো হয়ে গেল। বসার ঘরে একটি টেলিফোনও আছে, কিন্তু প্রোডিউসারের টেলিফোন নাম্বার তার জানা নেই। শুধু প্রোডিউসার কেন, অদিতির খেয়াল হল কলকাতার কোন মানুষের টেলিফোন নাম্বার তার জানা নেই। টেলিফোনের যন্ত্রটা থাকা বা না-থাকার মধ্যে কোন ফারাক এখন নেই।

দুপুর দুটোর মধ্যে স্টুডিওতে হাজির হতে বলেছিল সহকারী পরিচালক সামন্ত। একটার মধ্যে তৈরি হয়ে নিল অদিতি। বাড়ি থেকে যা পরে যাচ্ছে তার সবই খুলে ফেলতে হবে মেকআপ নেওয়ার পর। তখন অন্য বেশ। এই সময় টেলিফোন

বেজে উঠল। সুলেখা ছুটে এল, 'ফোনটা বাজছে!'

অদিতি থমকে গেল। কে ফোন করছে? কোন বদমায়েশ লোক নয় তো? সঙ্গে সঙ্গে যে মুখটার ছবি চোখের সামনে এল তার তো এখনও এই ফ্ল্যাটের ফোন নাম্বার জানার কথা নয়।

ফোনটা বেজে যাচ্ছে। অদিতি বলল, 'ফোনটা ধরো না।'

সুলেখা রিসিভার তুলল, 'হ্যালো!' তারপর কিছু শুনে মাথা নাড়ল, 'হ্যাঁ, আছেন। আপনি ধরুন, ডেকে দিচ্ছি।'

অদিতি ইশারায় জানতে চাইল, 'কে?' সুলেখা গলা নামাল, প্রযোজক।

অতএব রিসিভার ধরতে হল, 'হ্যালো।'

'কি ব্যাপার? লাঞ্চ করছিলে নাকি? অনেকক্ষণ রিং হয়েছে।'

'না, মানে—বলুন।'

'ফ্ল্যাট কেমন লাগছে?'

'ভাল।'

'সব গুছিয়ে নিয়েছ তো? অবশ্য এর মধ্যে সব কি করে হবে? যাকগে, কোন চিন্তা নেই। তোমার তো দুটোর মধ্যে স্টুডিওতে আসার কথা। পৌনে দুটোর সময় গাড়ি যাবে। ওখান থেকে আর কতটুকু।'

'আমি একটা কথা ভাবছিলাম।'

'হ্যাঁ, বলো বলো।'

'আমি যে এই ফ্ল্যাটে রয়েছি তা কিসের ভিত্তিতে?'

'বাঃ। তোমাকে তো বলেই দিয়েছি, ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত তুমি স্বচ্ছন্দে থাকতে পারবে। ফ্লপ হলে ছেড়ে দিতে হবে।'

'হ্যাঁ, কিন্তু এই সময়ের মধ্যে যদি কেউ আমাকে চ্যালেঞ্জ করে তাহলে আমি তাকে থাকার ব্যাপারে কি প্রমাণ দেব?'

'অ্যাঁ? ও। এটা ভাবিনি। ঠিক আছে। ভেবে দেখছি। তুমি আপাতত আমার নাম্বারটা লিখে রাখো। তেমন প্রয়োজন পড়লে ফোন করো।' প্রযোজক তার টেলিফোন নাম্বার দিলেন।

ফোন রেখে দেয়ার পর একটু স্বস্তি হল। লোকটাকে তো বলা গেল। আজ সুবিধে পেলে মিলনদাকেও বলতে হবে। প্রযোজক যদিও তার সঙ্গে এখনও খারাপ ব্যবহার করেনি কিন্তু সেদিন মেকআপ রুমে একজন প্রবীণা অভিনেত্রী বলছিলেন, এককালে ওঁর মেয়ে সংক্রান্ত দোষ ছিল। আর একজন পরে মন্তব্য করে—এককালের বিখ্যাত অভিনেত্রী যিনি এখনও অভিনয় করে যাচ্ছেন প্রযোজক নাকি তাঁর ভয়ে বোবা হয়ে থাকেন। কিন্তু বাবার বয়সী ওই মানুষটা তেমন কিছু বলা দূরে থাক, কোন ইঙ্গিতও দেননি, অন্তত এখন পর্যন্ত।

গাড়িতে ওঠার কয়েক মিনিটের মধ্যে স্টুডিওতে পৌঁছে গেল অদিতি। সামন্ত দাঁড়িয়েছিল, হেসে বলল, 'নতুন ফ্ল্যাট থেকে?'

অদিতি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

'কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?'

'না।'

'যাও, তৈরি হয়ে নাও। লাইট প্রায় রেডি।'

এইটে খুব খারাপ লেগেছিল। অল্প আলাপেই সামন্ত তাকে তুমি বলছে। মিলনদা পরিচালক, বয়সেও ঢের বড়, তিনি তুমি বললে তা মেনে নেয়া যায়। পরে ভুল ভেঙেছিল অদিতির। ফিল্ম লাইনে আলাপ হয়ে গেলেই বেশিরভাগ মানুষ আর আপনি বলে না। এমন কি সহকারী পরিচালকরা অথবা সহকারী ক্যামেরাম্যানও স্বচ্ছন্দে তুমি বলে থাকে। বয়সে যে ঢের বড় তাকে দাদা বা দিদির সঙ্গে তুমি বলেই কথা বলে। যেখানে যেটা স্বাভাবিক সেটা মেনে না নিয়ে উপায় কি!

মেকআপরুমে সেই বয়স্কা অভিনেত্রী আজ আগেই এসে মেকআপ নিচ্ছিলেন। অদিতিকে দেখে লক্ষ্মণ বলল, 'দিদি, এবার আমি হিরোইনকে ধরি।'

'হিরোইনকে ধরার জন্যে ছটফট করছ লক্ষ্মণ, আরে ভুলে যেও না আমিও একসময় হিরোইন ছিলাম। গ্ল্যামারাস হিরোইন।' মহিলা আয়নার দিকে তাকিয়ে কথা বলছিলেন। তাঁর মুখে বিরক্তি স্পষ্ট ফুটেছিল।

লক্ষ্মণ বলল, 'আপনার তো হয়ে গেছে দিদি। তাছাড়া আপনার মত ভাল মেকআপ কেউ তো করতে পারে না। আর ইনি মেকআপের কিছুই জানেন না।'

লক্ষ্মণ যখন অদিতির মেকআপ শুরু করল তখন অভিনেত্রী জিজ্ঞাসা করলেন, 'শুনলাম খুব ভাল শট দিচ্ছ। তা থাকা-হয় কোথায়?'

'রসা রোডে।'

'মিলনবাবু তোমার বাড়িতে যায়?'

'না তো!'

'তা ঠিক। ওর এসব বদনাম নেই। তবে ভাই প্রোডিউসার সম্পর্কে একটু সাবধানে থেকো। পেছনে একজন আছেন যার কথায় উনি উঠবস করেন।'

অদিতি কিছু বলল না। ভদ্রমহিলা বললেন, 'এসো না একদিন আমার বাড়ি। এই গল্‌ফ ক্লাবে। সামনের শনিবার তো স্যুটিং নেই। সেদিন কয়েকজনকে ডাকব ভাবছি। আমার বাড়িতে পার্টি হচ্ছে শুনলে সবাই যেতে চায়, রাত দুটোর আগে ঠেলেও বের করা যায় না। তুমি গেলে অনেকের সঙ্গে আলাপ হবে। দেখবে কাজের সুবিধা হবে।'

অদিতি তবু কিছু বলল না।

ভদ্রমহিলা বিরক্ত হলেন, 'মুখে সেলাই দিয়ে বসে আছ কেন?'

লক্ষ্মণ জবাব দিল, 'মেকআপের সময় কথা বলা ঠিক নয়।'

ভদ্রমহিলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে চলে গেলেন ঘর থেকে। লক্ষ্মণ বলল, 'দিদি, ওর

খপ্পরে না পড়াই ভাল।'

লক্ষ্মণকে ভাল লেগে গেল অদিতির।

আজ ছবির নায়ককে দেখল অদিতি। এর ছবি এতকাল সিনেমার কাগজে, পোস্টারে সে দেখে এসেছে। নাদুসনুদুস, ফোলাফোলা গাল, এই নায়ককে বাঙালি দর্শকরা একটু-আধটু পছন্দ করেন বলে উনি গত পনেরো বছর ধরে করে খাচ্ছেন। মিলন আলাপ করিয়ে দিতেই হাতজোড় করলেন নায়ক, 'নমস্কার। আপনার সাফল্য কামনা করছি।'

'নমস্কার। অনেক ধন্যবাদ।'

'বাঃ। মিলনদা, তোমার নায়িকা তো বাচ্চা মেয়ে নয়।'

'বাচ্চা হবে কেন? রীতিমত লড়াই করে বেঁচে থাকা মেয়ে।'

'তাই?' নায়ক অদিতির দিকে তাকালেন, 'একটা পরামর্শ দেব? ওসব লড়াই-এর গল্প ভুলেও কোন সাংবাদিককে জানাবেন না।'

'কেন?' অদিতি জিজ্ঞাসা না করে পারল না।

'গ্ল্যামার কমে যাবে। দর্শকরা সেই সব লেখা পড়বে আর ভাববে আপনি তাদের স্বপ্নের জগতের মানুষ নন। সুচিত্রা সেন, উত্তরকুমার কখনও পাবলিকের সঙ্গে মিশতেন? কখনই নয়। দূরত্ব রাখতেন।'

স্যুটিং শুরু হল, নায়িকার সঙ্গে নায়কের আলাপ হয়েছে। নায়ক বড়লোকের ছেলে। নায়িকার আর্থিক দুরবস্থার কথা জেনে সে তাচ্ছিল্য করছে। দু'বার অপমান হজম করার পর নায়িকা তাকে আক্রমণ করবে। তার অর্থ বা স্বাচ্ছন্দ্য না থাক সততা আছে। অতএব দারিদ্র্য তার কাছে অহঙ্কার।

ক্যামেরা চালু হলে দেখা গেল নায়িকা অনেক স্বচ্ছন্দ, নায়ক ভুল করছেন বারে বারে। তার জন্যে আবার টেক করতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত তিনি আবিষ্কার করলেন অদিতি নিচু গলায় কথা বলছে বলে তাঁর অসুবিধা হচ্ছে। কিন্তু পরিচালক মিলন অদিতিকে সমর্থন করায় তিনি পরিশ্রম করতে বাধ্য হলেন।

স্যুটিংয়ের পর সামন্ত অদিতিকে একটি খাম দিল। খাম থেকে বের হল প্রোডিউসারের প্যাড। তাতে তিনি লিখিতভাবে অদিতিকে তাঁর রসা রোডের ফ্ল্যাটে আগামী একবছর স্বাধীনভাবে থাকার অনুমতি দিয়েছেন।

এত তাড়াতাড়ি লিখিত অনুমতি দেওয়ার পেছনে অন্য উদ্দেশ্য নেই তো? অদিতি চোখ বন্ধ করল।



[বিশ]

একজন অভিনেতা বা অভিনেত্রী রূপবান বা রূপবতী হতে পারেন, অভিনয়ও ভাল করতে পারেন কিন্তু সিনেমার পর্দায় তিনি যে আকর্ষণীয় হয়ে উঠবেন এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। উত্তমকুমার সেই অর্থে সুপুরুষ ছিলেন না। অন্তত শাপমোচন, সাগরিকা ছবির সময়ে তো নয়ই। কিন্তু স্ক্রিন-প্রেজেন্স বলে যে ইংরেজি শব্দটি রয়েছে তা তাঁর অধিকারে ছিল একশ ভাগ। পর্দায় তাঁকে দেখামাত্র দর্শকদের মনে একটা ভাললাগা তৈরি হত। এই 'ভাললাগা' যে শিল্পী তৈরি করাতে না পারবেন তিনি যতবড় প্রতিভাবান হোন না কেন তাঁর জন্যে দর্শক কখনই ব্যস্ত হবে না। উত্তমকুমার-সুচিত্রা সেন-কাবেরী বসু-অপর্ণা সেনের পর প্রসেনজিতের চেহারা পর্দায় ওই ভাললাগা কিছুটা পরিমাণে তৈরি করে। কিন্তু প্রতিভার সবই যদি স্ক্রিন-প্রেজেন্সের রাজযোটক হয় তাহলে শিল্পীর চারপাশে গ্ল্যামারের বলয় সহজেই তৈরি হয়ে যায়। মিলনের মনে হচ্ছিল অনেক অনেকদিন পর বাংলা ছবি এরকম একজন অভিনেত্রীকে পেতে চলেছে আর তার আবিষ্কারক হিসেবে সে চিরদিন গর্ব অনুভব করতে পারবে। অদিতির কাজের প্রশংসা এই স্টুডিও থেকে অন্য স্টুডিওতে একটু একটু করে ছড়িয়ে পড়ছিল। ফলে কৌতূহল বাড়ছিল। কয়েকজন পরিচালক নানান ছুতো করে স্যুটিং দেখে গেছেন। তবে বেশিরভাগই অপেক্ষা করতে পছন্দ করেন। মিলনের ছবি হয়ে গেলে দর্শকরা কিভাবে নেয়, অদিতিকে দেখে তাদের কি প্রতিক্রিয়া হয় তা যাচাই না করে কেউ এগোতে চাইবেন না। তাঁরা লক্ষ্য রাখবেন, একটু আধটু কথাবার্তা এগিয়ে রাখতে পারেন কিন্তু কখনই অদিতির সঙ্গে চুক্তিতে সই করবেন না। মিলনের ছবি ফ্লপ করলে বলার সুযোগ পাবেন, আরে নতুনদের দিয়ে যদি বাজিমাৎ করা যেত তাহলে ঘোড়ার বদলে গাধাকে দিয়ে দৌড় করানো যেত!

এসব কথা শুনলে মিলনের হাসি পায়। কোন্ ছবি চলবে, কোন্ ছবি চলবে না তা কোনও বিশেষজ্ঞ আগাম বলতে পারেন না। প্রচুর বিখ্যাত শিল্পী, নামী পরিচালক, ভালো গান থাকা সত্ত্বেও ছবি তিন-চার সপ্তাহের মধ্যে প্রেক্ষাগৃহ থেকে দর্শকের অভাবে উঠে গেছে বহুবার। আবার যে ছবি সম্পর্কে তেমন কোন আশা কেউ করেনি, সে ছবিকেই দর্শকরা সুপারহিট করে দিচ্ছে। হ্যাঁ, সিনেমা একটা বিরাট জুয়াখেলার নাম, যার নিরানব্বুই ভাগ হল ফ্লপ, লোকসান, আর এক ভাগ হল হিট, লাভ। তবু ওই এক ভাগের জন্যেই মানুষ আসে ছবি তৈরি করতে। আর সেই সঙ্গে থাকে এই শিল্পের প্রতি ভালবাসা। কিন্তু এসব সত্যি হলেও মিলনকে লড়তে হচ্ছে এই এক ভাগ জায়গাটা পাওয়ার জন্যে।

চাইলেই যে এটা সম্ভব হবে এমন নয়। কিন্তু না হওয়া মানে জীবনের ওপর

একটা কালো পর্দা নেমে আসা। চলচ্চিত্র পরিচালনা ছাড়া অন্য কোন বিদ্যে মিলনের জানা নেই। ছবি ফ্লপ হলে আর কেউ এগিয়ে আসবে না টাকা নিয়ে। না এলে পরের ছবি তৈরি করতে পারবে না সে। তুমি যতই ভাল কাজ করো কোন মূল্য নেই যতক্ষণ না দর্শকরা দেখে খুশি হচ্ছে। আজ পর্যন্ত ছবি তৈরির কোন ফর্মুলা বের হয়নি, যাতে হিট হয়।

মিলনের মনে হচ্ছিল তার একটাই ভরসা অদিতি। ক্যামেরায় মেয়েটিকে অপূর্ব দেখাচ্ছে। কোনও কোনও মেয়েকে এমনিতে সুন্দরী বলে মনে হয় না কিন্তু ছবিতে চমৎকার দেখায়। অদিতি সেই ধরনের মেয়ে। তাছাড়া এর সংলাপ বলার ধরন, যেখানে সংলাপ নেই সেখানকার নির্বাক অভিনয় মিলনকে ভরসা দিচ্ছে খুব।

আজ স্যুটিং ছিল না। স্টুডিওতে নিজের অফিসে বসে কাজ করছিল মিলন। এই সময় লোকটা এল, 'আপনি মিলনবাবু?'

'হ্যাঁ। বলুন!'

'একটু বসতে বলুন!' লোকটা হাসল।

'বসুন।'

বসল লোকটা। পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করে এগিয়ে ধরতেই মিলন মাথা নেড়ে না করল। নেজে একটা সিগারেট ধরিয়ে অনেকটা ধোঁয়া ছেড়ে বলল,

'আমার নাম কমলেন্দু।'

'কি করতে পারি আপনার জন্যে।'

আপাতত একটাই কাজ করুন। আমার স্ত্রীর ঠিকানাটা দিন।'

'আপনার স্ত্রী? কে তিনি?'

'আপনার ছবির নায়িকা। নবাগতা অদিতি।'

'অদিতি আপনার স্ত্রী?' হাঁ হয়ে গেল মিলন।

'কেন? আমাকে দেখে কথাটা বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি?'

লোকটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করল মিলন। ওর হাসির সঙ্গে একটা ক্লেদাক্ত ভাব জড়ানো। এই লোক কখনই ভাল হতে পারে না। '

'আপনার স্ত্রীর ঠিকানা আপনারই জানার কথা, তাই না?'

'হ্যাঁ। সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু স্ত্রী যদি নষ্ট চরিত্রের মেয়েছেলে হয় আর আপনাদের মত ফিল্মের লোকজন যদি তাকে সাহায্য করেন তাহলে স্বামীর পক্ষে তার হদিস বের করা একটু মুশকিল হয়ে পড়ে।'

'আপনি কি বলতে চাইছেন?' মিলন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করল।

'এত উত্তেজিত হবেন না দাদা, শরীর খারাপ হয়ে যাবে।'

'শুনুন, আপনি আমাকে বিরক্ত করবেন না।'

'একি বলছেন? আপনাকে আমি বিরক্ত করব কেন? শুধু ওর ঠিকানা দিয়ে দিন, চলে যাই।'

'আমার পক্ষে ওর ঠিকানা দেওয়া সম্ভব নয়।'

'কেন?'

'আগে আমাকে ওর সঙ্গে কথা বলতে হবে। ও যদি অনুমতি দেয় তাহলে আপনি ওর ঠিকানা পাবেন।'

'আমার স্ত্রীর অনুমতির জন্যে আমাকে অপেক্ষা করতে হবে?'

'অদিতি আপনার স্ত্রী কিনা তা আমি জানি না। কিন্তু সে আমার ছবির নায়িকা। লক্ষ লক্ষ টাকার ছবি তার ওপর নির্ভর করছে। এই অবস্থায় তাকে ডিস্টার্ব করলে আমার ছবির ক্ষতি হবে।'

'আপনার ছবির ক্ষতি তো অন্যভাবেও হতে পারে।'

'তার মানে?'

'ধরুন, অদিতি মারা গেল। ক্ষতি হবে না?'

মিলন আর মাথা ঠিক রাখতে পারল না। চিৎকার করে বলল, 'গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার।'

তার চিৎকার শুনে সামন্ত এবং প্রোডাকশনের কয়েকজন ছুটে এলো। সামন্ত ঘরে ঢুকেই জিজ্ঞাসা করল,'কি হয়েছে দাদা?'

কমলেন্দু হাসল,'কিছু হয়নি ভাই, আপনারা কাজে যান।'

মিলন বলল, 'আপনি বেরিয়ে যান এখান থেকে।'

কমলেন্দু বলল, 'যেতে পারি। কিন্তু তাতে তো সমস্যার সমাধান হচ্ছে না। আপনি একটু মাথা ঠাণ্ডা করে ভাবুন।'

মিলন বলল, 'আমার আর কিছু ভাবার নেই।'

সামন্ত আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কিছু গোলমাল, দাদা?'

'হ্যাঁ। ভাই, তোমরা যাও, আমরা কথা বলছি।' মিলন যাদের উদ্দেশে বলল, সেই প্রোডাকশনের ছেলেরা বেরিয়ে গেল।

কমলেন্দু বলল,'ব্যাপারটা কিছুই নয়। আমি দাদার কাছে আমার স্ত্রীর ঠিকানাটা চাইছিলাম, উনি উত্তেজিত হয়ে পড়লেন। তাই না দাদা?'

'কে আপনার স্ত্রী?' সামন্ত রেগে গেল।

মিলন বলল, 'ইনি ক্লেইম করছেন অদিতি এঁর স্ত্রী।'

সামন্ত জিজ্ঞাসা করল,'কি নাম আপনার?'

'কমলেন্দু।' কমলেন্দু হাসল।

'আপনি বাইরে গিয়ে দাঁড়ান, আমি দু'মিনিটের মধ্যে আসছি।'

'বাইরে গিয়ে দাঁড়াব?'

'হ্যাঁ।'

'বেশ। যথা আজ্ঞা।' কমলেন্দু উঠে বাইরে চলে গেল।

সামন্ত বলল, 'আমি অদিতির সঙ্গে কথা বলে আসছি। মনে হচ্ছে কোন গোলমাল আছে।'

'সেরকম কিছু হলে আমি একেবারে ডুবে যাব সামন্ত।'

'সে রকম কিছু হতে আমরা দেব না।'

কমলেন্দুর পাশ কাটিয়ে হন্ হন্ করে স্টুডিওর টেলিফোন বুথে চলে এলো সামন্ত।

ডায়াল করল। অদিতি ফোন ধরল।

'অদিতি। সামন্ত বলছি। কমলেন্দু বলে কাউকে চেন?'

নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অদিতির।

'অদিতি।'

'চিনতাম।'

'কে লোকটা? স্টুডিওতে এসে ঝামেলা করছে।'

'ওর সঙ্গে আমার একদা বিয়ে হয়েছিল। নির্মমভাবে অত্যাচারিত হওয়ার পর আমি ওকে ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছি।'

'ও। ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে শালা এখনও তোমাকে স্ত্রী বলছে কি করে?'

'আমি অনেকদিনই ওর স্ত্রী নই, আমি কি স্টুডিওতে যাব?'

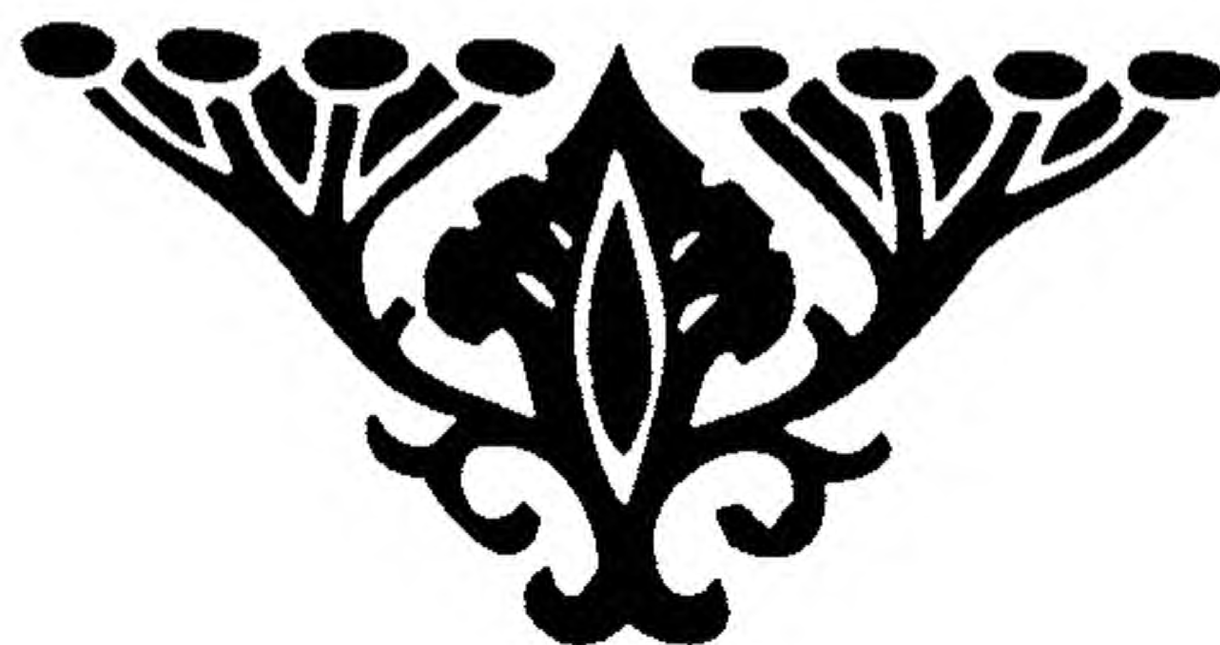
'না না। আমরাই ব্যবস্থা করছি। কোন চিন্তা কোরো না।

টেলিফোন রেখে কমলেন্দুকে নিয়ে মিলনের ঘরে ঢুকল সামন্ত, 'দাদা, এই লোকটা মিথ্যে কথা বলেছে। অদিতি ওর স্ত্রী নয়। ওদের ডিভোর্স হয়ে গেছে।'

কমলেন্দু বলল, 'যাচ্চলে। বিয়ে হল আত্মার বন্ধন। আইন কি তাকে ছিন্ন করতে পারে? কি বোকা বোকা কথা।'

সামন্ত বলল, 'আপনি বেরিয়ে যান। স্টুডিওতে যাতে আর কখনও ঢুকতে না পারেন তার ব্যবস্থা আমরা করব।'

কমলেন্দু ঘাড় নাড়ল, 'যাচ্ছি। কিন্তু এরপরে যখন আসব তখন আপনারাই আমাকে জামাই-আদরে ডেকে আনবেন।' বেরিয়ে গেল সে।



[একুশ]

যে মানুষটার সঙ্গে সব সম্পর্ক শেষ হয়ে গিয়েছে সে যে এমন নাছোড়বান্দা হবে অদিতি ভাবতে পারেনি। মেসে গিয়েছিল ঝামেলা পাকাতে, মনে হয়েছিল ওই অবধি ওর দৌড়, কিন্তু স্টুডিওতে পৌঁছে যাবে এতটা কল্পনা করতে পারেনি অদিতি। খবরটা শোনার পর কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়েছিল সে।

এই লোকটা এখন তার কি ক্ষতি করতে পারে? অদিতিকে বিয়ে করার পর ডিভোর্স দিতে বাধ্য হয়েছিল, একথা নিশ্চয়ই বলবে না। উল্টে ওর চরিত্রের উপর খানিকটা নোংরা ফেলে বলবে ওই-ই ডিভোর্স করেছে। এতে লোকে হয়তো মজা পাবে কিন্তু খুব একটা ক্ষতি হবে না। কিন্তু ওর কাছে সেই ছবিগুলো রয়েছে। ভালবাসার সুযোগ নিয়ে আবেগে দুর্বল করে যে ছবি লোকটা এক সময় তুলেছিল, যা ছিল একান্তই স্বামী-স্ত্রীর ব্যাপার তাকেই হাতিয়ার করতে পারে লোকটা। ওই ছবিগুলো দেখিয়ে বলবে এমন জীবনযাপন করত বলে সে অদিতিকে ডিভোর্স করতে বাধ্য হয়েছে। একজন নতুন নায়িকার নগ্ন ছবি পেলে সিনেমার কাগজগুলো নিশ্চয়ই খুব খুশি হবে। তার একটা যদি ছাপা হয়ে যায় তাহলে বাঙালী দর্শকরা কি তাকে নায়িকা হিসেবে মেনে নিতে পারবে?

শরীরে জ্বলুনি শুরু হয়ে গেল অদিতির। তার জীবনের শুরুটা ছারখার করে দিয়ে শান্তি হয়নি লোকটার, এখন এঁটুলির মতো পেছনে লেগে আছে। তার নিজের জীবন যা হবার হবে কিন্তু এতো লক্ষ টাকা খরচ করে যে ছবি তৈরি হচ্ছে, যদি নায়িকার বদনামের জন্যে দর্শকরা দেখতে না চায় তাহলে মিলনদার ভয়ংকর ক্ষতি হয়ে যাবে, প্রযোজকেরও সর্বনাশ। কি করা যায়! অদিতি ভাবল, এই দুজনের সঙ্গে কথা বলা উচিত। ওঁদের সব কথা খুলে বলা উচিত। এই দুজন বয়স্ক মানুষ নিশ্চয়ই একটা পথ বলতে পারবেন।

সুলেখা সামনে এসে দাঁড়াল, 'কি হয়েছে দিদি?'

সজাগ হল অদিতি, 'কই, কিছু হয়নি তো!'

'তোমাকে খুব অন্যরকম দেখাচ্ছে। কোন খারাপ খবর?

সুলেখার উদ্বিগ্ন মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল অদিতি, 'না। তেমন কিছু নয়। শোন, আমি থাকি বা না থাকি কোন লোক যদি দরজায় বেল দেয় তাহলে ঝট্ করে দরজা খুলবি না।'

'খুলব না?' সুলেখা অবাক।

'না!'

'বাঃ, কেউ যদি জরুরি খবর নিয়ে আসে? তাছাড়া তোমার সঙ্গে দেখা করতেও তো কেউ না কেউ আসতে পারে।' সুলেখা অবাক হচ্ছিল।

অদিতি জানলার দিকে তাকাল। একটু ভেবে নিয়ে বলল, 'আমি না থাকলে যে-ই-আসুক খুলবি না। আমি থাকলে নাম জিজ্ঞাসা করে বলবি।'

'কেন গো? কেউ কি ঝামেলা করতে আসতে পারে?

'হ্যাঁ।' মুখ নামাল অদিতি।

'কে?'

'যে লোকটা এক সময় আমার স্বামী ছিল, যে আমার জীবন নষ্ট করতে চেয়েছিল। যার হাত থেকে বাঁচতে আমি ডিভোর্স করেছিলাম।'

'কিন্তু সে তো এখন তোমার কেউ নয়!'

'কোন কোন পুরুষ মনে করে মেয়েরা তাদের খেলনা। খেলনা হাতছাড়া হয়ে গেলেও তারা মেনে নিতে পারে না।'

'তুমি নিশ্চিন্ত থাকো, আমি যতক্ষণ বাড়িতে থাকব তোমার কোন ভয় নেই।'

অদিতি সুলেখার দিকে তাকাল। রোগা কালো গরিব ঘরের এই মেয়েটিকে হঠাৎ তার অন্যরকম মনে হল। কী দারুণ আত্মবিশ্বাসী! অথচ ওর নিজেরই পায়ের তলায় মাটি নেই। এখানে আসার পর প্রথম দু'দিন বের হয়নি সুলেখা। তারপর সব কাজ সেরে ও ওর কাজে যাচ্ছে। দুপুরে অদিতি স্যুটিং-এ গেলে এই ফ্ল্যাট খালি থাকবে। কিন্তু যেদিন স্যুটিং থাকবে না সেদিন যদি সুলেখা তার কাজে বেরিয়ে যায় আর ঠিক সেই সময়ে লোকটা এখানে এসে হাজির হয় তাহলে অদিতি কি করবে?

স্টুডিওতে গেলে নিজের সমস্যা নিয়ে ভাবার অবকাশ পাওয়া যায় না। কেউ না কেউ এসে কথা বলে যাচ্ছে, সাংবাদিকেরা ইন্টারভিউ করছে আর তার মধ্যে সামন্ত তাড়া দিচ্ছে ফ্লোরে যাওয়ার জন্যে। দিনটা কেটে গেল কিন্তু আজ কাজ ভাল হল না। কাজ যে ভাল হল না তা সংলাপ বলার সময় মনে হচ্ছিল অদিতির। আজকের দৃশ্য ছিল নায়কের সঙ্গে ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার পর বাড়িতেও যে অশান্তি তার কিছু শট। মাঝখানে একবার মিলনের সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল অদিতি।

'কিছু বলবে?' মিলন জিজ্ঞাসা করেছিল।

'আমি আজ পারছি না।'

'তার মানে?'

'আমার অভিনয় ভাল হচ্ছে না।'

'কই আমার তো মনে হল না। এইসব দৃশ্যে যেরকম হওয়া উচিত ঠিক সেই রকমই তো করেছ। তুমি একটু বেশি ভাবছ অদিতি।'

নায়ক পাশে দাঁড়িয়েছিল। মন্তব্য করলেন, 'ভাল। শুরু থেকেই এমন খুঁতখুঁত ভাব রাখা ভাল। এতে অভিনয়ের মান বাড়ে।'

স্যুটিং শেষ হওয়ার পর মেকআপ তুলে বারান্দায় পা রাখতেই একটি প্রোডাকশন বয় এসে বলল, 'দিদি, মিলনদা একবার অফিসে যেতে বললেন।'

মেকআপ রুমের সামনের চত্বরে বেশ ভিড়। সিনেমা-শিল্পের সঙ্গে জড়িত

মানুষজন কথা বলছেন। কিছু মেয়ে এক পাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। এরা এক্সট্রা। রোজ বিকেলে স্টুডিওতে এসে এরা অপেক্ষা করে পরের দিন যদি কাজ পাওয়া যায়। ছবিতে এদের সংলাপ বলতে দেওয়া হয় না। ভিড় বাড়াতে, পরিবেশ তৈরি করতে এদের প্রয়োজন হয়। অদিতি লক্ষ্য করল মেয়েগুলো তার দিকে জুলজুল করে তাকিয়ে রয়েছে। সে যখন হেঁটে মিলনের অফিস ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন ছেলেরাও তাদের কথা বন্ধ করল। সে চলে যাওয়ার পরই ওরা মন্তব্য শুরু করবে।

'এসো। বসো। তোমার কি হয়েছে?' মিলন জিজ্ঞাসা করল।

'কেন?'

'আমি জানি তুমি মেন্টালি ডিস্টার্বড! মনের এ অবস্থায় ভাল অভিনয় করা সম্ভব নয়। সত্যি কথা বলতে কি, তোমার অভিনয় আমার আজ ভাল লাগেনি।'

'আপনি যে তখন বললেন—!' অদিতি অবাক।

'তখন সবার সামনে একথা বললে তুমি আরও আপসেট হয়ে যেতে।'

'আমি খুব খারাপ করেছি, না?'

'যতটা ভাল করছিলে ততটা করোনি। দ্যাখো অদিতি, তোমাকে আমি এই চরিত্রে নিয়েছি অনেক লড়াই করে। আমাদের প্রযোজক এখন শহরের বাইরে। যাওয়ার আগে আমার বাড়িতে এসে তোমার সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়ে গেছেন। কিন্তু তুমি যদি ভাল না কর তাহলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে অদিতি।'

'মিলনদা, আমি কি করব ভেবে পাচ্ছি না।' অদিতি মাথা নামাল।

সামন্ত ঘরে ঢুকছিল, মিলন তাকে বলল, 'সামন্ত, একটু দেখো তো, এখন কেউ যেন এ ঘরে না ঢোকে। মিনিট পনেরো।'

'ঠিক আছে দাদা।' সামন্ত বেরিয়ে গেল।

'আমাকে সবকথা খুলে বলতে তোমার আপত্তি আছে?' মিলন সরাসরি জিজ্ঞাসা করল। মাথা নাড়ল অদিতি। তারপর আগাগোড়া সব ঘটনা একের পর এক বলে গেল। চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল মিলন, শেষ হলেই জিজ্ঞাসা করল, 'এই লোকটা এখন কোথায় থাকে?'

'কৃষ্ণনগরে থাকত বলেই জানি। ওখানেই বাড়ি।'

চোখ বন্ধ করল মিলন, 'ইস্! ওই ছবিগুলো তুলতে কেন রাজী হলে?'

'তখন আমি ওর স্ত্রী। বিয়ের পর প্রথম প্রথম। ও খুব জেদ করল। বলেছিল, বিদেশে স্বামীর কাছে স্ত্রীরা কোন লজ্জা করে না, শুধু বাঙালী মেয়েরাই বাড়াবাড়ি রকম আড়ষ্ট হয়ে থাকে। তাছাড়া সে আমার স্বামী, স্বামীর কাছে স্ত্রীর লজ্জা করার কোন কারণ নেই। আমাকে জোর করল—!

'আমার এখান থেকে বেরিয়ে তোমার কাছে সে গিয়েছিল?'

'না। ফ্ল্যাটে চলে আসার আগে আমি যে মেসে ছিলাম সেখানে হাজির হয়েছিল আপনার সঙ্গে দেখা করার আগে।'

'তার মানে তোমার ঠিকানা সে এখনও যোগাড় করতে পারেনি।'

'হয়তো!'

'তুমি আমার ছবিতে একজন অত্যন্ত রুচিশীলা আত্মসম্মানবোধ-সম্পন্না চরিত্রে অভিনয় করছ। বাঙালী মেয়েরা যা হতে চায় তাই তুমি ছবিতে হবে। কিন্তু তোমার ওইসব ছবি যদি কাগজে ছাপা হয় তাহলে আমার সব চেষ্টা মাটি হয়ে যাবে। না, এটাকে বন্ধ করা দরকার। কিন্তু কি করে করব? প্রযোজক যদি জানতে পারেন তাহলে ভয়ানক আপসেট হয়ে যাবেন। যা খরচ হয়েছে তা জলে যাক বলে ছবি বন্ধ করেও দিতে পারেন। কি যে করি।' মিলন পেপারওয়েট চটকাতে লাগল।

'বিশ্বাস করুন আমি যদি জানতাম ও এইসব নিয়ে উদয় হবে তাহলে প্রথমেই আপনাকে বলতাম এবং এতবড় ক্ষতি হতে দিতাম না।'

'আমি তোমাকে দোষ দিচ্ছি না অদিতি, তোমার কি দোষ! এক অদ্ভুত পরিস্থিতির শিকার হয়েছ তুমি। কিন্তু এই ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসা উচিত। এক কাজ করি। আমার এক বন্ধু কলকাতা পুলিশের বড় অফিসার, আমরা এক সঙ্গে স্কুলে পড়তাম। ওর সাহায্য নেব।' মিলন বলল।

'পুলিশ!' অদিতি বলল।

'হ্যাঁ, পুলিশ বলে নার্ভাস হওয়ার কোন কারণ নেই। আমি ওর সঙ্গে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে তোমাকে জানাব। আর এর মধ্যে তোমাকে যদি ও ডিস্টার্ব করে তাহলে একেবারে পাত্তা দেবে না। তুমি চেষ্টা করো ব্যাপারটা ভুলে যেতে। একদম ভাববে না এসব নিয়ে। তোমাকে ভাল অভিনয় করতেই হবে। ঠিক আছে?' মিলন হাসার চেষ্টা করল।

এই সময় সামন্ত এসে দাঁড়াল দরজায়, 'দাদা!'

মিলন মুখ তুলে তাকাল। সামন্ত বলল, 'মিসেস দত্ত আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কি বলব?

মিলন অবাক হয়ে গেল। মিসেস দত্ত এককালের নামী অভিনেত্রী। এখনও তিনি ফেলু বোসের ছবিতে লিডরোল করছেন। মিলনের প্রযোজকের আগের দুটি ছবির নায়িকা ছিলেন তিনি। ছবি দুটোর ভাগ্য ভালো হয়নি।

মিলন বলল, 'আরে! ওঁকে নিয়ে এসো।'

অদিতি বলল,'আমি চলে যাব?'

'না না, মিসেস দত্ত মানে সুতপা দত্ত। বাংলা ছবির এককালের নামকরা নায়িকা। এখনও তিনি নিজেকে অবশ্যই তাই মনে করেন। তবু আলাপ হওয়া উচিত।' মিলনের কথা শেষ হতেই ভদ্রমহিলা ঘরে ঢুকলেন। অদিতিকে দেখে সরু ভ্রু তুলে ঠোঁট বেঁকালেন, 'ডিস্টার্ব করলাম?'

মিলন উঠে দাঁড়াল, 'কি আশ্চর্য! একথা কেন? আসুন আসুন।'

সুতপা দত্ত পাশের চেয়ারে বসে রুমালে ঠোঁটের কোণ মুছে বললেন, 'এঁকে চিনলাম না তো।'

'এর নাম অদিতি।'

'আচ্ছা! আপনার ছবির নায়িকা? কপাল করে এসেছ ভাই। যাঃ, তুমি বলে ফেললাম। অনেক ছোট, নিশ্চয়ই কিছু মনে করবে না।'

অদিতি নমস্কার করার সময় পেল না। এই ভদ্রমহিলার ছবি সে অনেকদিন থেকেই রাস্তার পোস্টারে দেখেছে। তবে সেই সব পোস্টারে ইনি বেশ রোগা ছিলেন। এখন শরীর ভারী হয়েছে, মুখের মেকআপ বেশ চড়া। অদিতি বলল, 'কপালের কথা বলছেন কেন?'

'বাঃ বলব না। একবারেই নায়িকা। কজন এমন সুযোগ পায়? কপাল ছাড়া আর কি বলব? তা মিলনবাবু, ছবির কাজ কেমন এগোচ্ছে?'

'ভালই।'

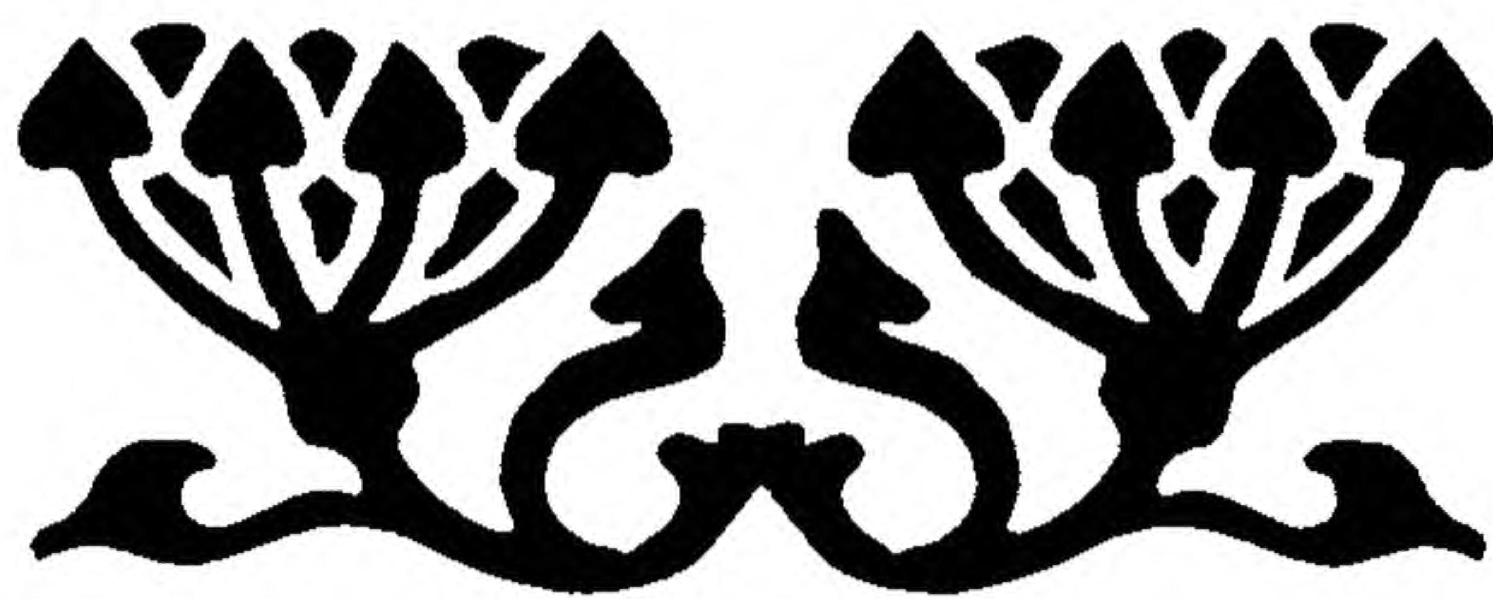
'আপনাদের প্রোডিউসার খুশী?'

মিলন সতর্ক হল। এই মহিলার সঙ্গে প্রযোজকের সম্পর্ক আছে। এমন কিছু বলা উচিত হবে না যা বুমেরাং হয়ে ফিরে আসবে। সে বলল, 'মনে হয়। তবে সবকিছু নির্ভর করছে ছবির রিলিজ হওয়ার পর দর্শকদের খুশী হওয়ার উপর। উনি আমাকে সুযোগ দিয়েছেন, আমি প্রাণপণে চেষ্টা করছি।'

'সেটা করার সময় আমার কথা মনে পড়েনি?' চোখ ছোট করলেন মহিলা।

'আসলে—।'

'আসলে পুরনো হয়ে গেছি, তাই না? আপনাদের প্রোডিউসার বলেছেন আপনার জন্যে তিনি আমাকে নিতে পারেননি? কথাটা সত্যি কিনা সেই জবাব চাইতে এখানে এসেছি।' সোজা হয়ে বসলেন সুতপা দত্ত।



[বাইশ]

মিলন আড়চোখে অদিতির দিকে তাকাল। এই নতুন মেয়েটির সামনে সুতপা দত্ত তাকে অপমান করতে চাইছেন! সুতপা দত্তকে সে দেখল। মুখ শক্ত। বয়স হলেও মেয়েরা হাসিখুশী থাকলে মুখে নরমভাব এনে বয়সটাকে কমাতে পারেন। কিন্তু মনে রুক্ষতা এলে মুখে যে কাঠিন্য আসে তা বয়সটাকে অনেক বাড়িয়ে দেয়। মিসেস সুতপা দত্তকে এই মুহূর্তে সেইরকম দেখাচ্ছে।

মিলন বলল, 'আপনি আমাকে ভুল বুঝছেন। আপনার সঙ্গে কাজ করার সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য বলে মনে করব। সত্যিকথা বলতে কি আপনার সঙ্গে কাজ করার খুব ইচ্ছে ছিল। কিন্তু আমার এই ছবিতে আপনাকে মানাবে এমন কোন চরিত্র নেই। আর যা আছে, তার কাজ এত সামান্য যে আপনাকে অফার করার ধৃষ্টতা আমার হয়নি।'

'এই গপ্পো আপনার প্রোডিউসারের মুখে আমি শুনেছি। হ্যাঁ, আমি একটু ওয়েট গেইন করেছি বটে কিন্তু মাসখানেক ড্রিঙ্ক বন্ধ করে আর জিমে গেলে আমি আবার আগের মত ঝরঝরে হয়ে যেতে পারি, একথা বিশ্বাস করেন?'

'আপনি যখন বলছেন তখন অবশ্যই বিশ্বাস করব।'

'তাহলে স্যুটিং বন্ধ করুন।'

'মানে?'

'আপনার প্রোডিউসারের সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। স্যুটিং বন্ধ করে নতুন করে শিডিউল করব।'

'কই, উনি তো আমাকে কিছু বলেননি।'

'বলবেন!'

'আমি বুঝতে পারছি না, স্যুটিং বন্ধ করলে ওঁর তো প্রচুর ক্ষতি হবে।'

'সেটা নিয়ে আপনি কেন ভাবছেন?'

মিলন বুঝতে পারল কেন প্রযোজক সেদিন হন্তদন্ত হয়ে তার বাড়ি গিয়ে বলেছিলেন যে কলকাতার বাইরে চলে যাচ্ছেন। সে মুখ নিচু করল, 'বেশ, ভাবব না। উনি আমাকে বললেই স্যুটিং বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

'আমি আপনাকে বলছি ওঁর সঙ্গে কথা হয়ে গেছে।'

'মানছি। কিন্তু ম্যাডাম আমি ওঁর মুখ থেকে কথাটা শুনতে চাই।'

'তার মানে আপনি আমাকে উপেক্ষা করছেন?'

'আমি বাস্তবের কথা বলছি। আপনি একটু ভেবে দেখুন।'

সুতপা দত্ত কাঁধ নাচালেন। তারপর অদিতির দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কোথায় থাকো ভাই?'

'রসা রোডে।'

'রসা রোডে অনেক দিন আছ?'

'না।'

মিসেস সুতপা দত্ত মিলনের দিকে তাকালেন, 'ওখানে আপনার প্রোডিউসারের একটা ফ্ল্যাট আছে, তাই না? সেটা কি এখন খালি আছে?'

'কোন্ ফ্ল্যাটের কথা বলছেন জানি না তবে অদিতিকে কিছুদিন থাকার জন্যে ওখানে একটা ফ্ল্যাট দেওয়া হয়েছে।' মিলন জানাল।

'আ-চ্-ছা!' চোখ বড় করে মাথা নাড়লেন মিসেস সুতপা দত্ত। তারপর ঘড়ি দেখলেন, 'আর আপনাদের বিরক্ত করব না। আজ উঠছি।'

মিলন হেসে বলল, 'আচ্ছা!'

মিসেস সুতপা দত্ত শরীরটাকে এমনভাবে তুললেন যে মনে হল বেশ কিছু স্প্রিং পায়ে লাগানো আছে। দরজার দিকে পা বাড়িয়েই থেমে গেলেন তিনি, 'হ্যাঁ, আজ রাত্রে আপনার সঙ্গে ফোনে কথা বলা যেতে পারে?'

'আপনি যদি চান তাহলে ফোন করতে পারি।'

'খুব ভাল। তার চেয়ে একবার আমার বাড়িতে চলে আসুন না। এর মধ্যে আপনার প্রোডিউসারের সঙ্গে আমি কথা বলে নেব। বাই।' ভদ্রমহিলা চলে গেলেন। ওঁর যাওয়া দেখল অদিতি। তারপর মুখ ফেরালো, 'কি হবে?'

'কোন্ ব্যাপারে জানতে চাইছ?'

'উনি যা বললেন তাতে তো ছবিটা বন্ধ হয়ে যাবে!'

'ওঁর ইচ্ছে সেই রকমই।'

'তাহলে—?' মুখে মেঘ জমল অদিতির।

'ওঁর ইচ্ছে মানেই তো প্রোডিউসারের ইচ্ছে নয় অদিতি। এই আবদার উনি পাঁচ বছর আগে করলে হয়তো কাজ হত। এসব নিয়ে তুমি চিন্তা করো না। সময়কে মেনে নিতে যারা পারে না তারা ওই মহিলার মত হতাশায় ভোগে। যাকগে, তোমার ব্যক্তিগত সমস্যা এখন তোমার একার নয়, আমাদেরও। যাও, বাড়িতে গিয়ে বিশ্রাম করো।'

স্টুডিওর গাড়িতে রসা রোডে ফেরার সময় অদিতি ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল। স্টুডিওর গেটে অথবা পেছনের ট্যাক্সিতে সেই লোকটা কি তার জন্যে অপেক্ষা করে আছে? তার গাড়ি অনুসরণ করছে? সঙ্গে মেকআপ বক্স রয়েছে নইলে তার ফ্ল্যাটবাড়ির সামনে সে নামত না। লোকটা যদি কোন ট্যাক্সিতে অনুসরণ করে তাহলে তো তার ঠিকানা জেনে ফেলবে। কিন্তু গাড়ি তাকে নির্দিষ্ট বাড়িটার সামনে নামিয়ে দিল। ড্রাইভার মেকআপ বক্স পৌঁছে দিল ফ্ল্যাটে। সুলেখা তখনও ফিরে আসেনি। চাবি ঘুরিয়ে ভেতরে ঢুকে শূন্য ফ্ল্যাটে দাঁড়িয়ে অদিতির হঠাৎ মনে হল সে এত ভয় পাচ্ছে কেন? আজ যে কথা সে মিলনদাকে বলে এল সেই কথা সমস্ত পৃথিবীকে জানাতে তো তার কোন দ্বিধা নেই। কোন মানুষ অকপট হলে দর্শকরা

তাকে অবিশ্বাস করবে কেন?

প্রোডিউসারের বাড়িতে টেলিফোন করেছিল মিলন। তাঁর মেয়ে বললেন, 'উনি হঠাৎই বাইরে গিয়েছেন। আমায় বলেছেন আপনাকে জানিয়ে গিয়েছেন। তাই না?'

'হ্যাঁ। তবু ভাবলাম, যদি কোন কারণে যাওয়া না হয়। কবে ফিরবেন?'

'সেটা ঠিক বলেননি। কাল সকালে ফোন করলে জেনে নেব। আপনার স্যুটিং ঠিক চলছে তো? কোন অসুবিধে হয়েছে নাকি?'

'না না। সব ঠিক আছে। কাল ইনডোর শেষ হবে। এরপর আউটডোর।'

ফোন রেখে স্বস্তি পেল মিলন। যাক ভদ্রলোক কথা রেখেছেন। কিন্তু সাপ যত নির্বিষই হোক কামড়ালে ঘা তো হতেই পারে। মিসেস সুতপা দত্তকে শান্ত করা দরকার। এখন ঘড়িতে সাড়ে সাতটা। মিলন দ্বিতীয় ফোনটা করল তার পুলিশ অফিসার বন্ধুকে। আগামীকাল সন্ধ্যের পর অ্যাপয়েন্টমেন্ট করে নিল।

স্টুডিও থেকে বেরুবার সময় সামন্ত সঙ্গে ছিল। মিলন তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি মিসেস দত্তর ঠিকানাটা জানো?'

'জানি। কেন দাদা?'

'ওঁর ওখানে একবার চল তো!'

সঙ্গে সঙ্গে হাতজোড় করল সামন্ত, 'মাপ করবেন দাদা, আমাকে যেতে বলবেন না। আমি আপনাকে বাড়িটা দেখিয়ে দিয়ে বাইরে অপেক্ষা করছি, আমাকে ভেতরে যেতে বলবেন না।'

'কেন?'

'আমি ওই ভদ্রমহিলাকে খুব ভয় পাই দাদা।'

মিসেস সুতপা দত্ত থাকেন ম্যুর এভিন্যুর একটি প্রাচীন বাড়িতে। দেখলেই বোঝা যায় এই বাড়ির এক সময় আভিজাত্য ছিল। সামন্ত উল্টোদিকের একটা চায়ের দোকানে ঢুকে গেল। গেট পেরিয়ে বেল টিপল মিলন। দ্বিতীয়বারে একটা কাজের লোক দরজা খুলেই জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন? ডিরেক্টর প্রোডিউসার ছাড়া দিদি এখন কারও সঙ্গে দেখা করবেন না।'

মিলন হাসল, 'তাঁকে বল মিলনবাবু এসেছেন।'

এই সময় একটি লোক ভেতর থেকে বেরিয়ে এল। পাজামা ফতুয়া পরা বেশ রোগা এবং খাটো চেহারার লোকটি চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল। কাজের লোকটি ভেতরে চলে যাওয়ামাত্র লোকটি বলল, 'আপনি ছবি করেন?'

মিলন মাথা নাড়ল, হ্যাঁ।

'আমার কাছে দারুণ দারুণ গল্প আছে। সুপারহিট হয়ে যাবে ছবি। আমার বউ যখন বাড়িতে থাকবে না তখন চলে আসুন, শুনিয়ে দেব গল্প। আরে না, না, টাকা পয়সা নিয়ে কিছু ভাববেন না। ওটা পরে হবে। কত টাকা দেন স্টোরি রাইটারকে আপনারা?'

'সেটা নির্ভর করে গল্প কার তার ওপর।'

'অ। যাক, আমি গানও লিখি। আরে মশাই আমার গানগুলো মেরে কত লোক বিখ্যাত গীতিকার হয়ে গেছে। আমি ভাল লোক বলে মামলা করিনি। এই তো আজই লিখেছি, দুজনে সেদিন দুলেছিনু কত ফুলে ফুলে বনে বনে। কেমন?'

'রবীন্দ্রনাথের কথা মনে পড়ছে।' মিলন বলতেই কাজের লোক ফিরে এল, 'আপনাকে দিদি ডাকছেন। দাদাবাবু, আপনি ওঁর সঙ্গে কথা বলেছেন?'

'না তো!' দ্রুত মাথা নাড়ল লোকটি।

'আমি শুনলাম আপনি কথা বলছেন। দিদি নিষেধ করেননি?'

'কি আশ্চর্য! উনি গানের লাইন শুনতে চাইলে আমি চুপ করে থাকব? আমার প্রতিভা চিরকাল চাপা পড়ে থাকতে পারে না।' লোকটি দ্রুত পাশের ঘরে চলে গেল। কাজের লোকটি বলল, 'আসুন।'

দোতলার যে ঘরে মিলনকে বসানো হল সেটি সুন্দরভাবে সাজানো। এই আধুনিক আসবাবপত্রগুলো এ বাড়ির চরিত্রের সঙ্গে মানায় না। দেওয়াল জুড়ে সুতপা দত্তের যৌবনের নানান ভঙ্গির ছবি টাঙানো। ভদ্রমহিলা যে সুন্দরী ছিলেন তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

সুতপা দত্ত ঘরে এলেন টাইট জিনস আর গেঞ্জি পরে। এই পোশাক তাঁর শরীরের বাড়তি মেদ আরও প্রকট করে তুলেছে। ঘরে ঢুকেই সুতপা দত্ত বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'কেন?'

'বসুন। আপনি যে আমার বাড়িতে এসেছেন এই জন্যে ধন্যবাদ।'

'বলুন কেন আসতে বলেছেন?'

'আপনার প্রোডিউসার কোথায়?'

'আমি জানি না। ওঁর বাড়িতে ফোন করেছিলাম, শুনলাম, উনি বাইরে গিয়েছেন। অবশ্য যাওয়ার আগে স্যুটিং যাতে ভালভাবে চলে তার ব্যবস্থা করে গেছেন।'

'আপনি তাহলে জানেন না?'

'মিথ্যে কথা বলার কোন কারণ নেই।'

'লোকটা বাইরে চলে গেল আমাকে না জানিয়ে? এ ঘটনা গত কুড়ি বছরে কখনও ঘটেনি। এত সাহস পেল কোত্থেকে? আমি যদি চাই তাহলে ওকে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে দিতে পারি তা জানেন?'

'দেখুন এসব আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক?'

'আছে। সম্পর্ক আছে।' শোফার হাতলে শরীর রাখলেন সুতপা দত্ত, 'আপনি ওই নতুন মেয়েটাকে নিয়ে এসে ওর মাথা ঘুরিয়ে দিয়েছেন!'

'কি বলছেন? অদিতি ওঁর মেয়ের বয়সী।'

'চুপ করুন। পুরুষ মানুষকে আমার চেনা আছে। মেয়ের বয়সী! রসা রোডের

নিজের ফ্ল্যাটে নিয়ে গিয়ে তুলেছে যাতে গোপনে রাসলীলা করতে পারে। ওর ওই ভাল মানুষের মুখোশটাকে আমি টেনে ছিঁড়ে ফেলব। আপনি ওকে নতুন মেয়ে ভেট দিয়ে ছবির কাজ বাগিয়েছেন।' ফোঁস ফোঁস করছিলেন সুতপা দত্ত।

'দেখুন, আপনি আমাকে অপমান করছেন। ওই কাজ করতে পারলে আমাকে শেষ ছবি করার পর এতদিন বসে থাকতে হত না। আমি এত নিচে নামতে পারিনি মিসেস দত্ত। তাছাড়া অদিতিকে পাওয়ার আগে আমরা অনেক চেষ্টা করেছি নতুন কাউকে পেতে। প্রোডিউসার শর্ত দিয়েছিলেন পুরনো নায়িকা নেওয়া চলবে না। না পেয়ে প্রজেক্ট বাতিল করে দিচ্ছিলেন উনি।'

'নতুন মেয়ে? হোয়াই? কেউ রিস্‌ক্ নেয়? ও নিল কারণ ওর মুখ বদলাবার বাসনা হয়েছিল।' বড় নিঃশ্বাস ফেললেন সুতপা দত্ত, 'আপনি আমাকে দেখুন, আমি কি খুব মোটা, বুড়ো হয়ে গিয়েছি?'

চোখ বন্ধ করল মিলন। মাথা নাড়ল, 'এভাবে ভাবছেন কেন?'

'সবাই এখন আমাকে নিয়ে হাসাহাসি করবে। বলবে আমি ফুরিয়ে গিয়েছি তাই ও নতুন ফুলে গিয়ে বসেছে।' গলায় এবার কান্না এল।

'না। আপনাকে আমি জোর গলায় বলতে পারি অদিতির সঙ্গে ওঁর কোন সম্পর্ক নেই। আপনি ভাববেন না, উপযুক্ত চরিত্র পেলে আপনাকে এখনও খুব ভাল লাগবে পর্দায়।' মিলন বলল।

'ঠিক আছে। আপনি আমাকে মানায় এমন একটা গল্প খুঁজে বের করুন। এই ছবি শেষ হলেই ওটা শুরু করতে হবে। টাকা-পয়সার ব্যাপারে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার প্রোডিউসারের কাছ থেকেই টাকা আদায় করব আমি। আপনি শুধু ভাল গল্প আর অভিনয় করতে পারি এমন চরিত্র খুঁজে বের করুন। প্লীজ!' সুতপা দত্তের চোখে জল।

মিলন মাথা নাড়ল, 'আমি চেষ্টা করব। আন্তরিকভাবে।'



[তেইশ]

টালিগঞ্জের ব্যাপার-স্যাপারের ধরন অদিতির জানার কথা নয়। এতদূর এগিয়ে যাওয়ার পর ছবিটা বন্ধ হয়ে গেলে সে কি করবে? তাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবেই। আবার একটা চাকরি খোঁজা, সেইসঙ্গে থাকার আস্তানা জোটানোর কথা ভাবলেই গায়ে জ্বর আসছিল। তাকে ফিরে যেতে হবে কৃষ্ণনগরে। সেখানে সে মাকে যে প্রস্তাব দিয়ে এসেছিল তাতে ওঁরা আশার আলো দেখছে। মা চিঠি লিখেছে, অদিতির আশ্বাস পেয়ে বাবাকে নিয়ে আগামী সপ্তাহেই মাদ্রাজের নেত্রালয়ে যেতে চায়। সে যেন টিকিট কেটে দিনটা জানিয়ে দেয়। তাহলে কৃষ্ণনগর থেকে সরাসরি হাওড়া স্টেশনে চলে যাবে। অদিতি যেন সেখানে দেখা করে টিকিট এবং টাকা দেয়।

এই অবস্থায় সে যদি কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে কিছুদিনের জন্যে হলেও কৃষ্ণনগরে গিয়ে আশ্রয় নেয় তাহলে ওঁদের সঙ্গে সম্পর্ক থাকবে? চিন্তায় ঘুম হচ্ছিল না অদিতির। অবশ্য ভদ্রমহিলা ওইভাবে শাসিয়ে যাওয়ার পরও মিলন স্যুটিং করেছেন। কিন্তু প্রোডিউসার ফিরে এলে যদি ভদ্রমহিলার কথা মেনে নেন?

সুতপা দত্তর ছবি দেখেছে সে। এমন কিছু সুন্দরী ছিলেন না কিন্তু ওঁর ফিগার খুব ভাল ছিল। এখন অবশ্য সেসব অতীত। কিন্তু প্রোডিউসারের সঙ্গে ওঁর সম্পর্ক এত নিবিড় যে তিনি এত টাকা নষ্ট করে ছবি বন্ধ করে দিতে পারেন? একজন বয়স্কা বিবাহিতা মহিলা কি করে একজন প্রৌঢ় বিবাহিত পুরুষের বান্ধবী হয়ে এমন কর্তৃত্ব করতে পারেন? ওঁর স্বামী কিছু বলেন না? অথবা এঁর স্ত্রী? ফিল্ম লাইনের নিয়ম কি আলাদা? অদিতির ইচ্ছে হচ্ছিল ভদ্রমহিলার কাছে গিয়ে অনুরোধ করে যেন তার কোন ক্ষতি না করেন। কিন্তু সেটা করলে মিলনদা যদি রেগে যান।

সুলেখা ঘরে এল, 'একি, ঘুমাওনি দিদি?'

'ঘুম আসছে না রে!'

'তুমি মিছিমিছি ভাবছ। অত ধমক খাওয়ার পর লোকটা আর আসবে না।'

অদিতি সুলেখার দিকে তাকাল। ও মনে করছে কমলেন্দুর কথা ভেবে তার ঘুম আসছে না। ওঃ কমলেন্দু! আর একটা জ্বালা! আর একটা ভয়! সে হাসল। নিজের কথা ভেবেই হাসি পেল তার।

আর তিনদিন স্যুটিং হলেই ছবির কাজ শেষ হয়ে যাবে। টালিগঞ্জে রটে গেছে মিলনের ছবির সুবর্ণার চরিত্রে যে নতুন মেয়েটি কাজ করেছে সে নাকি সবাইকে টেক্কা দেবে। তাই শেষ পর্যায়ের স্যুটিং দেখতে ফ্লোরে ভিড় বাড়ছে। মিলনকে বাধ্য হতে হয়েছে ফ্লোর থেকে লোক সরাবার ব্যবস্থা করতে। লাঞ্চ ব্রেকে প্রযোজক

এলেন স্টুডিওতে। অফিসে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন হচ্ছে কাজ?'

'ভাল। পরশু স্যুটিং শেষ হচ্ছে।' মিলন জবাব দিল।

'কোন প্রব্লেম হয়নি তো?

'আপনি ছিলেন না বলে আমাকে সামলাতে হয়েছে।'

'কি রকম?'

'মিসেস দত্ত হুকুম করেছিলেন ছবির স্যুটিং বন্ধ করতে।'

'ও।' প্রযোজক গম্ভীর হলেন।

'উনি ছবিটা ফেলে দিয়ে নতুন করে শুরু করতে বলেছিলেন।'

'তারপর?'

'আমি বলেছিলাম আপনি এসে না বললে আমি সেরকম কিছুই করতে পারি না। উনি খুব রেগে গিয়েছিলেন। আপনি কোথায় গিয়েছেন জানতে চেয়েছিলেন। শেষে আমাকে বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছিলেন।'

'বাড়িতে? সেকি?'

'আমি অনেক বোঝানোর পর উনি প্রস্তাব দিয়েছেন এই ছবির পর ওঁকে মানায় এমন গল্প নিয়ে ছবি করতে, টাকার অভাব হবে না।'

'টাকার অভাব হবে না? দেবে কে?'

'তা আমি জানি না।'

'বয়স বাড়লে মেয়েমানুষ এমন খিটখিটে হয়ে যায় যে সহ্য করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। আর যদি তাদের বাচ্চা না হয় তাহলে তো সোনায় সোহাগা। সব তাতে সন্দেহ, ঝগড়া। আমাকে কিভাবে জ্বালিয়ে যাচ্ছে তা আমিই জানি। কথা-বার্তা নেই রাত দুটো তিনটের সময় ফোন। কেন তুমি ওই মেয়ের দিকে তাকিয়েছ? ওর কি আছে যা আমার নেই? এইসব প্রশ্নের কোন উত্তর হয়?' প্রযোজক ক্রমশ অন্যমনস্ক গলায় কথা বলছিলেন।

'এ বিষয়ে আমার কোন কথা বলা সমীচীন নয়।'

'হ্যাঁ। ওকে কোনরকম প্রশ্রয় দেওয়ার দরকার নেই। সেটা দিলে উনি এখনই এই বয়সে স্ত্রীকে ডিভোর্স করে ওকে বিয়ে করতে বাধ্য করবেন।'

'বাধ্য করবেন কি করে?'

'মিলন, মানুষ যখন অনেস্ট হয় তখন তার দুর্বলতাগুলো লুকিয়ে রাখে না। পরবর্তীকালে কেউ যদি ওই দুর্বলতাগুলোকে কাজে লাগায় তখন সে নিজেকে অনেক শক্তির অধিকারী বলে ভাবে। ঠিক আছে। ও হ্যাঁ, তোমার নায়িকার প্রশংসা শুনলাম, ভাল। কেমন আছে মেয়েটি?'

'খুব ভয় পেয়েছিল মিসেস দত্তের কথা শুনে।'

আঃ, ওকে বলার কি দরকার ছিল?'

'উনি যখন হুমকি দিতে এসেছিলেন তখন অদিতি এঘরে ছিল।'

'না না। ওকে ওসব কথায় কান দিতে নিষেধ করো। ওর থাকার কোন সমস্যা

হচ্ছে না তো! আমি ইচ্ছে করেই কাউকে ওখানে খোঁজ নিতে পাঠাচ্ছি না।'

'না। হলে নিশ্চয়ই বলত। তবে—!

প্রযোজক তাকালেন। মিলন মাথা নাড়ল, 'এমন কিছু ব্যাপার নয়। পরে আপনার সঙ্গে কথা বলব। আমাকে আবার এখনই স্যুটিং শুরু করতে হবে।' সে উঠল।

ছবি শেষ। এখন শুধু অলসভাবে বসে থাকা। ছবি হিট করলে হয়তো অন্য ছবির কাজ পাওয়া যাবে, এই আশা নিয়ে দিন গোনা। ইতিমধ্যে সুলেখাকে দিয়ে মাদ্রাজ যাওয়া আসার টিকিট কাটিয়ে মা-বাবাকে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে ট্রেনে তুলে দিয়ে এসেছে সে। ব্যাপারটা যে বাস্তবে ঘটবে তা আশা করেননি ওঁরা। স্বাভাবিকভাবেই খুব খুশী দেখাচ্ছিল ওঁদের। অদিতি বলে দিল, 'যদি ওঁরা বলেন অপারেশন করতে হবে তোমরা রাজি হয়ে যেও। এই আমার টেলিফোন নাম্বার। কাউকে বলে লাইন ধরিয়ে কথা বলো। আমি টাকা পাঠিয়ে দেব।'

মা বলল, 'তোর টেলিফোন হয়েছে?'

'আমার নয়। আমি যেখানে থাকি সেখানে টেলিফোন রয়েছে।'

মাদ্রাজ থেকে কোন খবর আসেনি। ছবির আগাম বাবদ যে টাকা সে পেয়েছিল তা প্রায় শেষ। মোট কুড়ি দিন সে কাজ করেছে। এখানকার কোন কোন সাধারণ নায়িকা দিনে পাঁচ হাজার করে পায় বলে লক্ষ্মণ মেকআপ ম্যান তাকে জানিয়েছে। নতুন হিসেবে সে এই টাকা আশা করতে পারে না। তাকে বলা হয়েছিল ছবির জন্যে সে মোট তিরিশ হাজার টাকা পাবে। প্রথমে দেওয়া হয়েছিল পাঁচ হাজার। মাঝখানে আবার দশ হাজার টাকা। সেই টাকা শেষ হয়ে যাওয়ার মুখে। অথচ সে মিলনকে মুখ ফুটে টাকার কথা বলতে পারছে না।

তার এবং সুলেখার জন্যে খরচ বেশি হয় না। শুধু খাওয়ার খরচ। ফ্ল্যাটের ভাড়া, ইলেকট্রিক অথবা টেলিফোনের বিল তার কাছে আসছে না। কিন্তু কিছু মেকআপের জিনিস অথবা মেকআপম্যানের কথামত বিউটি পার্লারে যাওয়া তো আছেই। আর টাকা না পেলে এসব বন্ধ করতে হবে।

এই সময় সামন্ত এল ফ্ল্যাটে, 'দিদিভাই, কাল সকাল নটায় রেডি থেকো।'

'কেন?'

'বাঃ, ডাবিং করবে না?'

'ডাবিং?'

'আরে এতদিন যে সব সংলাপ স্যুটিংয়ের সময় বলেছ তা দর্শকরা খুব স্পষ্ট শুনতে পাবে না বলে ছবিতে তোমার ঠোঁট নাড়া দেখে সংলাপ বলিয়ে রেকর্ড করে জুড়ে দেওয়া হবে। এই স্ক্রিপ্ট দিয়ে গেলাম। চোখ বুলিয়ে রেখো।'

ডাবিং করতে গিয়ে খুব মজা পেল অদিতি। পর্দা জুড়ে যখন তার ছবি আসছে তখন যেন নিজেকেই অজানা অচেনা মনে হচ্ছে। সেই ছবি কোন কথা বলছে না।

ঠোঁট নড়ছে, চোখ ঘুরছে, কোন শব্দ নেই। মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি স্যুটিং-এর সময় কিভাবে সংলাপ বলেছ তা কি শুনে নিয়ে বলবে?'

'যেভাবে ভাল হয়—?' অদিতি বুঝতে পারল না।

একটা হেডফোন এল। সেটা মাথায় পড়ে সুইচ অন করতে এবার ছবির ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে সংলাপ শুনতে পেল। অনেকটাই স্পষ্ট কিন্তু মাঝে মাঝে অন্য শব্দ আছে। ডাবিং শুরু হল। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদে তার মনে হল এভাবে শুনে শুনে বললে কি রকম আবৃত্তির মত হয়ে যাচ্ছে। সে মিলনকে কথাটা জানাতেই হেডফোন খুলে সংলাপ লেখা কাগজটি হাতে পেল। একবার ঠোঁট নাড়া দেখে সে সংলাপ বলল। প্রথমবারেই ঠোঁট নাড়ার সঙ্গে এমন সুন্দরভাবে মিলে গেল যে সাউন্ড রেকর্ডিস্ট পর্যন্ত চেঁচিয়ে 'সাবাস' বলল। গতকাল চিত্রনাট্য হাতে পাওয়ার পর অদিতি অনেকবার বাড়িতে বসে রিহার্সাল দিয়েছে। যে সংলাপ সে ক্যামেরার সামনে বলেছে তা এখন আবার বলতে গিয়ে নিজের কাছেই ভাল লাগছিল।

রোজ সকালে বেরিয়ে রাত্রে ফেরার পরিশ্রম গায়ে লাগছিল না কারণ অদিতির কাছে ডাবিং করা স্যুটিং-এর চেয়েও ভাল লাগছিল। স্যুটিং-এ সামনে ক্যামেরা থাকে। আর এখানে সামনের পর্দায় আর এক অদিতি। যেন সেই মূক অদিতির মুখে কথা বলিয়ে দিচ্ছে সে।

ডাবিং শেষ হল যেদিন সেদিন পনেরো হাজার টাকার চেক পেল। আর অদিতির মনে হল সে বেঁচে গেল। এখন কিছুদিনের জন্যে তো নিশ্চিন্ত।

মিলন ওর সামনে এল, 'তাহলে অদিতি, তোমার কাজ শেষ!'

অদিতি তাকাল। সে কি বলবে?

'মনে হয় পূজোয় ছবি রিলিজ করবে। এখন ভাগ্যের ওপর ভরসা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। তবে তোমার কাজে আমি খুশী।'

'আমি এখন কি করব?'

মিলন অবাক হল। তারপর বলল, 'কেন? বই পড়, সিনেমা দ্যাখো নিজেকে আরও শিক্ষিত করো। আগের অভিনেত্রীদের অভিনয় দ্যাখো।'

'কিন্তু আমাকে তো ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে।'

'কেন?'

'আমাকে বলা হয়েছিল ছবি রিলিজ হওয়া পর্যন্ত ওখানে থাকতে পারব।'

'রিলিজ তো এখনই হচ্ছে না। হোক আগে, তারপর দেখা যাবে।' মিলন হাসল, 'দ্যাখো অদিতি, আমরা সবাই ঝুঁকি নিচ্ছি, নিচ্ছি না?'

অদিতি মাথা নাড়ল।

'ও হ্যাঁ। কমলেন্দু কি এর মধ্যে তোমাকে বিরক্ত করেছে?'

'না।'

'আর আসেনি?'

'বোধ হয় জানে না আমি কোথায় থাকি!'

'যে লোক এই স্টুডিও পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে সে অতটা নির্বোধ নয়। ঠিক আছে, কিছু হলে আমাকে জানিও।' মিলন বলল।

কমলেন্দুর হঠাৎ এই চুপচাপ হয়ে যাওয়া বিস্ময়ের। লোকটার যা চরিত্র তাতে এমন হওয়ার কথা নয়। এই সময় সুলেখা একদিন বাড়ি ফিরল উৎফুল্ল হয়ে, 'জানো দিদি, তোমার ছবি দেখলাম রাস্তায়।'

'আমার ছবি?'

'হ্যাঁগো। তোমার বিরাট ছবি। মিনার বিজলী ছবিঘরে মুক্তি পাচ্ছে তোমার সিনেমা। কী ভাল লাগছে দেখতে।'

'সত্যি?'

'দাঁড়াও। এসো, এদিকে এসো।' হাত ধরে তাকে নিয়ে গেল সুলেখা ব্যালকনিতে, 'দ্যাখো, দ্যাখো।'

রাস্তার ওপাশের দেওয়ালের বিশাল পোস্টারে অদিতির মুখ। অদিতি ঈষৎ চিবুক তুলে হাসছে। এতদূর থেকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সে।

'কি বিশ্বাস হল?'

'হুঁ।'

'এখন থেকে তুমি আর বাইরে হেঁটে যেতে পারবে না।'

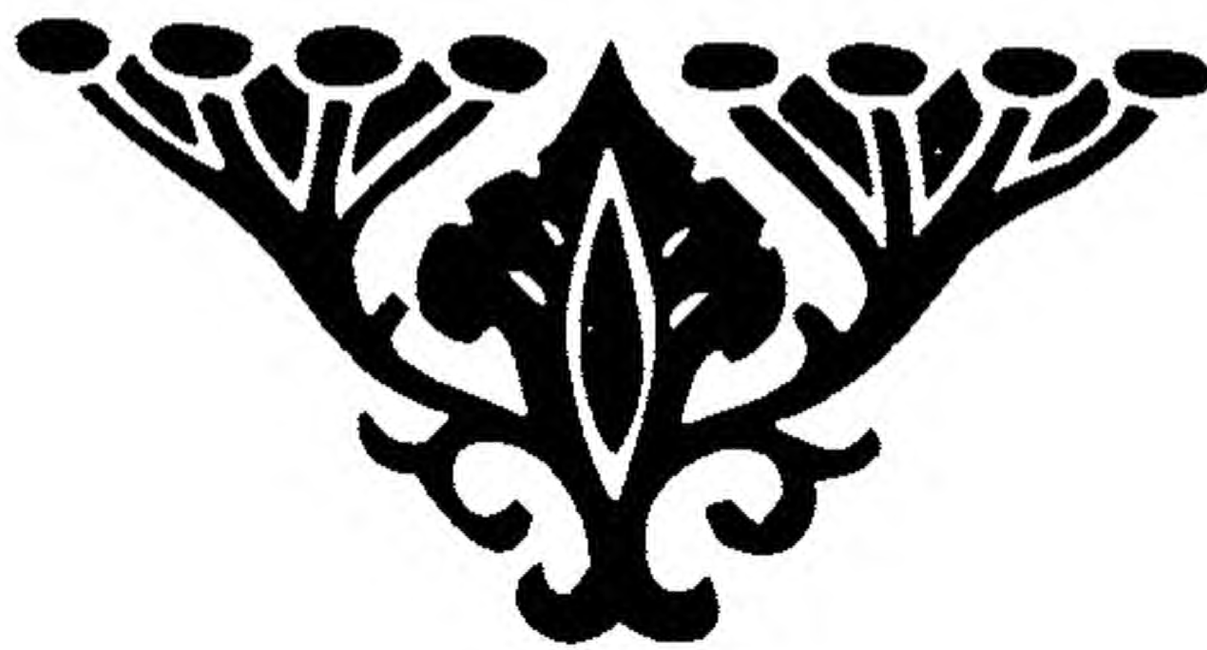
'কেন?'

'লোকে তোমায় চিনে ফেলবে না? অটোগ্রাফ চাইবে।'

'দূর!'

'হ্যাঁগো। তুমি এখন থেকে আমাদের থেকে আলাদা হয়ে গেলে।'

এই সময় টেলিফোন বেজে উঠল। সুলেখা দৌড়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো। হ্যাঁ।' তারপর ওর মুখ আচমকা শুকিয়ে গেল। রিসিভার ধরা হাত কাঁপতে লাগল। অদিতি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কিরে? কি হয়েছে?'



[চব্বিশ]

সুলেখা কিছু না বলে রিসিভার নামিয়ে রাখল।

অদিতি আবার জিজ্ঞাসা করল, 'কেউ খারাপ কথা বলল?'

সুলেখা মাথা নাড়ল। হ্যাঁ।

'কি বলল?'

'সেকথা আমি তোমার সামনে বলতে পারব না।'

'ও। এই বোধহয় শুরু হল। শুনেছি বাড়িতে টেলিফোন থাকলেই নাকি এমন আজেবাজে ফোন আসে। যাদের মন খুব বিকৃত তারাই এসব করে। যা, জামাকাপড় ছাড়। আমি চা বানাচ্ছি।' অদিতি বলল।

'তোমাকে করতে হবে না। আমি চায়ের জল বসিয়ে বাথরুমে যাচ্ছি।'

সুলেখা চলে গেল রান্নাঘরে, অদিতি আবার এসে দাঁড়াল ব্যালকনিতে। পোস্টারের ছবিটা এখন উজ্জ্বল। প্রত্যেক ছবির মুক্তির আগে রাস্তায় এমন পোস্টার পড়ে। ছবির আয়ুর উপর এদের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এরকম কত মুখ হারিয়ে গিয়েছে বিস্মৃতিতে তার হিসেব নেই। ওই মুখের ভাগ্যে কি লেখা আছে তা ঈশ্বর জানেন।

আবার ফোন বাজছে। অদিতি ভেতরে এল। লোকটা বোধহয় ঠিক করেছে যতটা পারে জ্বালাবে। রিসিভার না তুললে কিরকম হয়? কিন্তু খানিকটা বাজতেই বাথরুম থেকে চেঁচিয়ে সুলেখা বলল, 'ধরো না, নিশ্চয়ই সেই লোকটা!'

কিন্তু কানে যন্ত্রণা হচ্ছিল। অদিতি প্রচণ্ড রেগে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'কে?'

'বাব্বা! হ্যালো না বলে একেবারে কে?' পুরুষ কণ্ঠে খুক্‌খুক্ হাসি।

'কে আপনি?'

'আশ্চর্য! ফিল্মের নায়িকা হয়ে নিজের স্বামীর গলা চিনতে পারছ না?'

চমকে উঠল অদিতি। কমলেন্দু তার ফোন নাম্বার পেয়ে গিয়েছে? সে নিজেকে সামলে চেঁচিয়ে উঠল, 'একটু আগের ফোনটা তাহলে তুমিই করেছ? একটা বাচ্চা মেয়েকে অশ্লীল কথা বলতে তোমার সংকোচ হয় না। কি চাই তোমার?'

'দাঁড়াও দাঁড়াও। এ কী রকম ব্যাপার? আসামী জানিল না অথচ তাহার ফাঁসি হইয়া গেল? আমি তো এই প্রথম ফোন করছি। আগে করিনি তো।'

'কি চাই তোমার?'

'আমি আর কি চাইব? আমি এখন গরিব মানুষ, তুমি বড়লোক। রাস্তায় তোমার পোস্টার পড়েছে। হাসিহাসি মুখ, আমি শুধু চাই না ওই মুখের হাসি চিরকালের জন্যে নিভে যাক। বুঝতেই পারছ।'

'না। পারছি না। যা বলার তাড়াতাড়ি বল।'

'দ্যাখো, মধু থাকলে যেমন মৌমাছি আসে তেমনি মরার গন্ধ পেলে শকুনরা আকাশ থেকে নেমে আসে। এসেছেও। তোমার সেইসব ছবিগুলোর কথা বলছি। তিন তিনটি সিনেমা পত্রিকা আমাকে পাগল করে দিচ্ছে ওগুলো পাওয়ার জন্যে। মোটা টাকা দাম দিতে চাইছে তারা। আমি বলেছি, দেখুন মশাই, এ আমার স্ত্রীর নগ্ন শরীরের ছবি। তার অনুমতি ছাড়া তো আমি এগুলো হাতছাড়া করতে পারি না। তাই তোমার অনুমতির জন্যে আমি ফোন করছি।'

'তুমি!—তুমি ওঃ, ভগবান।' অদিতি চোখ বন্ধ করল।

'না না। তোমার আমার মধ্যে ভগবান আসুক আমি চাই না। তোমার কাছে এখনই তেমন টাকা পয়সা নেই আমি জানি। কিন্তু তোমার পরিচালককে বলো। হারামিটা খুব অপমান করেছিল আমাকে। বেশি নয়, মাত্র দু'লাখ টাকা চাই। সামনের শুক্রবারে তোমার ছবি হল্এ দেখাবে। তোমার নগ্নছবি সিনেমা পত্রিকায় ছাপা হলে ছবির বারোটা বেজে যাবে। আমি সেটা চাই না। তাই ওরা টাকাটা দিয়ে দিক, আমিও ছবি ফেরৎ দিয়ে দেব। কাল সকালে ফোন করব। ঠিক আছে?' কট্ করে লাইনটি কেটে গেল।

অদিতির মনে হল পায়ের তলার মাটি টলমল করছে, এখনই আছাড় খাবে সে। রিসিভার নামিয়ে রেখে সে চেয়ারে বসে পড়ল। এই লোক টাকার জন্যে সব কিছু করতে পারে। তার মনে পড়ল মিলন একবার বলেছিল কোন এক পুলিশ অফিসারের কাছে তাকে নিয়ে যাবে যিনি সাহায্য করতে পারেন। তালেগোলে নিশ্চয়ই মিলন ভুলে গেছে কথাটা। কিন্তু এখন যদি মিলন বা প্রোডিউসার বলেন তার জন্যে কেন তারা ঝামেলায় জড়াবে? দু'লাখ টাকা কেন তারা দিতে যাবে? ছবি বাঁচানোর জন্যেই? অদিতি কি করবে বুঝতে পারছিল না। তার ব্যক্তিগত সমস্যার জন্যে ছবি যদি ডুবে যায় তাহলে এরা তাকে ক্ষমা করবে না। আর যত ভাল অভিনয় সে করুক, অন্য কেউ তাকে কাজ করতে ডাকবে না।

তবু বলতে হবে। স্টুডিওতে ফোন করে সে অনেক চেষ্টার পর সামন্তকে ধরতে পারল। সামন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার দিদিভাই?'

'মিলনদা কোথায়?'

'মিলনদা প্রোডিউসারের অফিসে গিয়েছে। মিটিং আছে।'

'সেখানকার টেলিফোন নাম্বার পেতে পারি?'

সামন্ত নাম্বারটা দিতেই ডায়াল করল অদিতি।

'হ্যালো!'

'আচ্ছা, ওখানে মিলনবাবু আছেন?'

'কে বলছেন?'

'ওকে বলুন, আমি অদিতি।'

'ও, আচ্ছা! কি খবর তোমার? পোস্টার দেখেছ?'

এই গলা প্রোডিউসারের। অদিতি নিঃশ্বাস ফেলল, 'হ্যাঁ।'

'কয়েকটা জায়গায় বড় হোর্ডিং পড়েছে। কাল থেকে সব কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুচ্ছে। সামনের শনিবার আমি একটা পার্টি দিচ্ছি, তোমার কাছে কার্ড যাবে। সময়মত চলে এসো।' প্রোডিউসার হাসলেন।

'হ্যালো।' মিলনদার গলা, 'কি ব্যাপার অদিতি?'

'মিলনদা, আমার খুব বিপদ। আপনি একবার আসতে পারবেন?'

'কি হয়েছে?'

'ও ফোন করেছিল। ব্ল্যাকমেইল করতে চাইছে।'

'তুমি অপেক্ষা কর। আমরা এখনই আসছি।'

রিসিভার নামিয়ে খেয়াল হল মিলনদা আমি না বলে আমরা বললেন। তার মানে সঙ্গে কি প্রোডিউসারকে নিয়ে আসছেন? নিজেকে সে কখনই ক্ষমা করতে পারবে না ছবির কোন ক্ষতি হলে। সিনেমা লাইনের লোকজন সম্পর্কে আগে সে যা শুনেছিল এদের সঙ্গে মেলামেশার পর তার ধারণা একদম বদলে গিয়েছে। এই লাইনে তো এঁদের মত মানুষও আছেন।

আধঘণ্টা পরে বেল বাজতে সুলেখা দরজা খুলে দিল। অদিতি এগিয়ে গিয়ে বলল, 'আসুন।'

ওঁরা ঘরে এসে বসলেন। দুজন নয়, তিনজন এসেছেন। প্রোডিউসার প্রথম কথা বললেন, 'এসব ব্যাপার আমি জানতাম না। এখানে আসার পথে মিলনের মুখে সব শুনলাম। আজ তোমার এক্স হাজব্যান্ড কি বলেছে?'

'দু'লক্ষ টাকা চেয়েছে নইলে ছবিগুলো সিনেমা পত্রিকায় ছাপার জন্যে বিক্রি করে দেবে।' লজ্জায় দু'হাতে মুখ ঢাকল অদিতি।

প্রোডিউসার মিলনের দিকে তাকালেন, 'তোমাকে বলেছিলাম না, অনেক মানুষ তার দুর্বলতা প্রিয়জনের কাছে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু পরে সেটাই হয়তো তার সর্বনাশ ডেকে আনে।'

মিলন বলল, 'অদিতি। ইনি আমাদের বন্ধু। কলকাতা পুলিশের একজন বড় অফিসার। উনি যা জিজ্ঞাসা করবেন তার জবাব দাও।'

অফিসার বললেন, 'আপনাদের ডিভোর্স হয়ে গেছে?'

'হ্যাঁ। কৃষ্ণনগরের কোর্টে।'

'কেন হল?'

'ও টাকার জন্যে আমার উপর অমানুষিক অত্যাচার করত।'

'ডিভোর্স করার পর দেখা করত?'

'না। তবে আমি যখন কলকাতায় চাকরি করতে আসি তখন একদিন কৃষ্ণনগরের বাড়িতে গিয়েছিল। তারপর মেসে এসেছিল।'

'ওকে কি খুব বুদ্ধিমান মনে করেন?'

'আমি ঠিক বুঝতে পারি না।'

'ও কবে ফোন করবে বলেছে?'

'আগামীকাল।'

'বেশ। ফোন করলে বলবেন ছবিগুলো নিয়ে আপনার কোন মাথা-ব্যথা নেই। আপনার প্রোডিউসার সব শুনে বলেছেন ওইসব ছবি কাগজে ছাপা হলে ছবি সুপারহিট করবে কারণ লোকে আপনাকে দেখতে ছুটবে।'

'অ্যাঁ? কি বলছেন আপনি?'

'ঠিকই বলছি। এটা শুনলে লোকটা ঘাবড়ে যেতে পারে। হয়তো টাকার অঙ্ক কমাতে পারে। কলকাতার সিনেমা পত্রিকাগুলোর এমন আর্থিক অবস্থা নয় যে লাখ টাকা দিয়ে ছবি কিনবে। যারা পারে তাদের রুচিতে লাগবে। ও যদি টাকার অঙ্ক কমায় তাহলে পার্ক স্ট্রীটের ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে আসতে বলবেন।' ভদ্রলোক একটা কার্ড বের করল, 'এটা রাখুন, ওর ফোন পাওয়ামাত্র আমাকে জানিয়ে দেবেন।'

মিলন জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ব্যাপারটা বুঝেছ?'

'হ্যাঁ।' অদিতি মাথা নাড়ল।

প্রেডিউসার বলেন, 'দ্যাখো অদিতি, অফিসার যা বললেন তা করলে আমাদের কোন ক্ষতি তো হতই না, লাভ হতে পারত। তোমাকে কেউ তো চেনে না। তোমার সম্পর্কে কারও কোন এক্সপেক্‌টেশন নেই। ওইসব ছবি ছাপা হলে একটা হৈচৈ হতই। তোমার সম্পর্কে আগ্রহ জন্মাতো পাবলিকের। যদিও ছবি দেখতে গিয়ে সেসব দৃশ্য দেখতে না পেয়ে একদল হতাশ হত, আবার তোমার অভিনয় ভাল লাগলে প্রশংসা করত। যা হোক, আমরা একটা নেগেটিভ পাবলিসিটি পেতে পারতাম কিন্তু আমি বা মিলন সেটা চাইছি না। আমরা চাই তুমি সসম্মানে ছবির জগতে থাকো।'

মিলন জিজ্ঞেস করল অফিসারকে, 'আচ্ছা, কাল যখন ফোন করবে তখন লাইন ট্যাপ করে ও কোথায় তা ধরা যায় না।'

'যায়। কিন্তু এসব লোক পাবলিক টেলিফোন থেকেই ফোন করে। বুথটা কোথায় ধরার পর সেখানে পৌঁছে দেখা যাবে অনেক আগেই হাওয়া হয়ে গিয়েছে। কোন লাভ হবে না।'

'কিন্তু ও যদি ফ্লুরিসে না যেতে চায়?'

'এই বাড়ি ছাড়া যেখানে যেতে চাইবে সেখানেই রাজি হবেন। আপনি একবারে দু'লাখ টাকায় রাজি হচ্ছেন না বলে ও আপনাকে বিশ্বাস করে ফেলবে, ফাঁদ বলে ভাববে না। কিন্তু কখনই এই ফ্ল্যাটে ওকে ডাকবেন না।'

প্রোডিউসার মাথা নাড়লেন, 'ঠিক। এখানে যদি পুলিশ ওকে অ্যারেস্ট করে তাহলে লোকাল মানুষ তোমার সম্পর্কে কৌতূহলী হয়ে যাবে।'

ওঁরা চলে যাওয়ার পর সুলেখা তাকে যতই সান্ত্বনা দিক কিছুতেই স্বস্তি পাচ্ছিল

না অদিতি। এই সময় টেলিফোন বাজল। সুলেখা ফোন ধরল। তারপরই সে চিৎকার করে উঠল, 'তোমার মা!'

অদিতি ছুটে গেল, 'হ্যালো? তোমাদের কি খবর? এতদিন ওখানে আছ কোন খবর দাওনি কেন? বাবা কেমন আছে?'

'তোর বাবা ভাল আছে। আমরা সাঁইবাবার আশ্রমে গিয়েছিলাম। খুব ভাল ছিলাম। কাল তোর বাবার অপারেশন হবে। পাঁচ হাজার টাকার খুব দরকার। তুই কি টাকাটা পাঠাবি?'

'নিশ্চয়ই পাঠাবো। ঠিকানা বল।'

মায়ের কাছ থেকে ঠিকানা লিখে নিল অদিতি।

এখন ব্যাংক বন্ধ হয়ে গিয়েছে। কাল সকালের আগে টাকা তুলে পাঠানো সম্ভব নয়। অথচ কালই চোখের অপারেশন। কি করবে বুঝতে পারছিল না সে। আবার আগামীকাল বাড়িতে থাকতে হবে কমলেন্দুর ফোনের জন্যে।

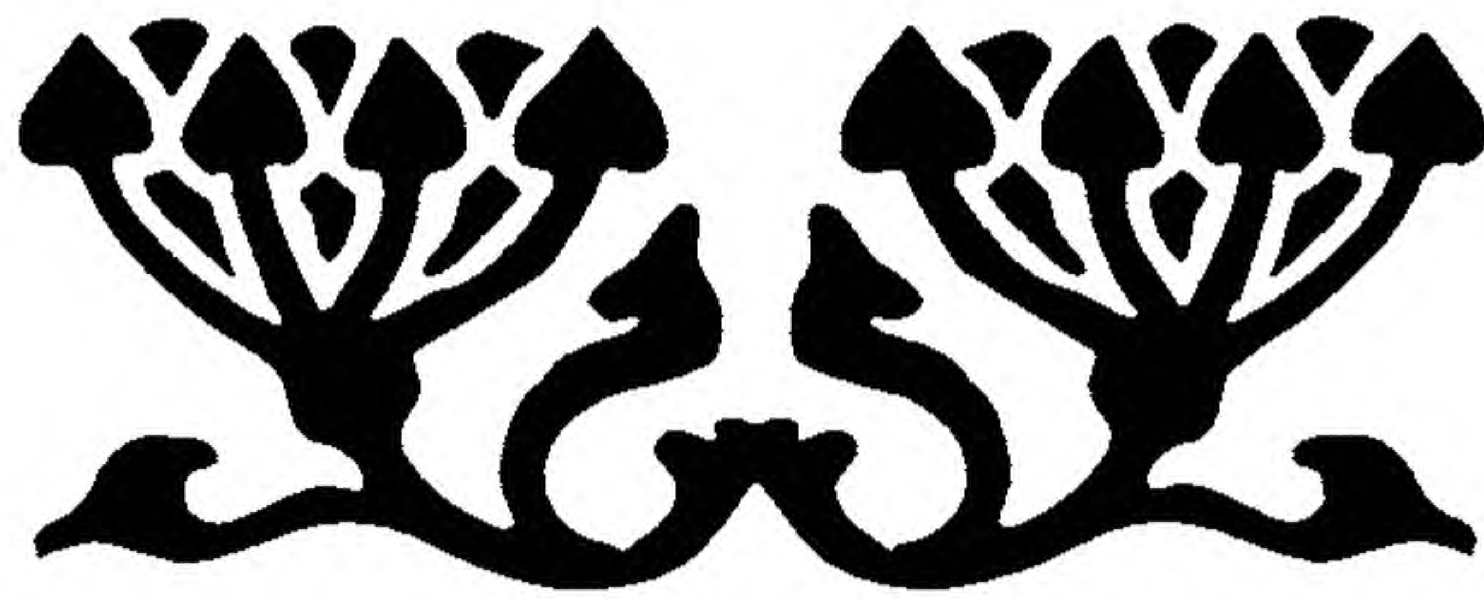
শেষ পর্যন্ত লজ্জা ঝেড়ে ফেলে সে প্রোডিউসারকে ফোন করল। কিন্তু অফিস বলল তিনি সেখানে নেই, আজ আর আসবেন না। নিজের পরিচয় দেওয়ার পর বাড়ির নাম্বার পেল সে।

ঠিক তখনই প্রোডিউসার বাড়িতে পৌঁছেছেন। সমস্যা শুনে বললেন, 'কাল সকালে তুমি আমার লোককে পাঁচ হাজার টাকার চেক দিয়ে দেবে। আর তোমার মায়ের ঠিকানাটা আমাকে বল।'

ঠিকানা বলে অদিতি জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু মা কি করে টাকা পাবে?'

'উনি আজ রাতেই পেয়ে যাবেন। মাদ্রাজে আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁকে ঠিকানা জানিয়ে টাকাটা পৌঁছে দিতে বলছি। তুমি এ নিয়ে চিন্তা করো না। রাখছি।'

অদিতি চোখ বন্ধ করল। এইসব ঋণ সে শোধ করবে কি করে?



[পঁচিশ]

ঠিক দশটা বাজতেই টেলিফোনটা থেকে শব্দ বের হল। সুলেখা রান্না শেষ করে তার কাজে বেরিয়ে গিয়েছে। একটু আগে প্রোডিউসারের লোক এসে পাঁচ হাজার টাকার চেক নিয়ে গিয়েছে। শুধু তাই নয়, মা আবার ফোন করেছিল মাদ্রাজ থেকে কাল রাত্রে। বলামাত্র দিনে দিনে টাকা পেয়েছে মা, এটা যেন কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছে না। কথা বলতে গিয়ে গলা আবেগে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছিল। মা বলেছিল, 'তোর যে এত ক্ষমতা হয়েছে আমি ভাবতে পারিনি।'

ক্ষমতা! মা তো জানে না তার ক্ষমতার শক্তি একবিন্দুও নয়।

অদিতি উঠল। রিসিভার তুলে হ্যালো বলল।

'যাক। আমি ভাবলাম তুমি হয়তো রিসিভার তুলবে না।' কমলেন্দুর গলা, 'অবশ্য আমি ফোন করেই যেতাম সারাদিন।'

'কি চাও?' কড়া গলায় জিজ্ঞাসা করল অদিতি।

'তুমি মাইরি এমন ইয়ার্কি মারো, জানো না কি চাই।'

'তুমি ওই ছবিগুলো নিয়ে যা ইচ্ছে তাই করতে পারো, আমার কাছ থেকে এক পয়সাও পাবে না।'

'অ্যাঁ? ভেবে চিন্তে বলছ তো?'

'হ্যাঁ। তুমি বলেছ ওগুলো সিনেমা পত্রিকার কাছে বিক্রি করে দেবে। তুমি তো কখনও আমার কোন উপকার করোনি, এই উপকারটা করো।'

'উপকার? তুমি উপকার বলছ? আরে, তোমার বাঁশ হয়ে যাবে। তোমার ল্যাংটা ছবি ছাপা হলে বাঙালি মা-বোনেরা, গ্রামের মেয়েরা তোমার নামে থুথু দেবে। ক্যারিয়ার একদম বরবাদ।'

'তুমি মধ্যযুগে বাস করছ।'

'তার মানে?'

'এখন আমাকে কেউ চেনে না। সিনেমায় আমি নতুন তাই আমার সম্পর্কে কারও কোন কৌতূহল নেই। কেউ আমার নামে একটাও টিকিট কাটবে না। কিন্তু ওই ছবি ছাপা হলে আমার পাবলিসিটি হয়ে যাবে। লোকে আমার নাম জানবে। আমাকে ভাল করে দেখার জন্যে ছবি দেখতে ছুটবে।'

'তোমাকে এসব জ্ঞান কে দিল?'

'কে আবার দেবে। কালই একজন ফটোগ্রাফার এসেছিল আমার অল্পপোশাকের ছবি তুলতে পাবলিসিটির জন্যে। তখনই মনে হল এর চাইতে তোমার ছবিগুলো ছাপা হলে বেশি উপকার হবে।'

কয়েক সেকেন্ড চুপ করে রইল কমলেন্দু। তারপর বলল, 'কিন্তু তোমার

ইজ্জত? লোকে ছবিতে তোমার শরীর দেখুক তা চাও? তাছাড়া তোমার বাবা-মা আত্মীয়-স্বজন কি বলবে? কি করে তাদের কাছে মুখ দেখাবে?'

'একটু অসুবিধে হবে কিন্তু ফিল্মে নেমে ওসব ভাবলে চলে না।'

'তুমি এত সাহসী হয়ে গেলে কি করে?' কমলেন্দুর গলায় বিস্ময়।

'আমি এখন রাখছি।'

'না না। দাঁড়াও শোন, তুমি তোমার বাবা-মায়ের কথা ভাবো।'

'ভেবে কি করব? তোমাকে দু'লক্ষ টাকা দেব?'

'না। ঠিক আছে, অত দিতে যদি অসুবিধা হয় তাহলে লাখখানেক অন্তত দাও। এই উপকারটা আমি তোমার জন্যে করতে পারি।'

'দ্যাখো কমলেন্দু, আমার টাকার গাছ নেই।'

'একি? তুমি আমার নাম ধরে কথা বলছ?'

'আমার কাছে তোমার অস্তিত্ব ওই নাম ছাড়া আর কিছুতেই নয়!'

'কত দিতে পারবে? পঞ্চাশ? পঞ্চাশ হাজার?'

অদিতি নিঃশ্বাস ফেলল। 'পাঁচমিনিট পরে ফোন করো।' সে রিসিভার রেখে দিল। লোকটা ঘাবড়ে গেছে। কমলেন্দুর মুখটা মনে করে খুশি হল সে। দু'লাখ থেকে পঞ্চাশ হাজার।

ঠিক পাঁচ মিনিট বাদে আবার ফোন বাজল। কমলেন্দু জিজ্ঞাসা করল, 'কি হল?'

'আমি আমার প্রোডিউসারের সাথে কথা বললাম। উনি প্রথমে দিতে রাজি হচ্ছিলেন না। শেষে রাজি হয়েছেন। টাকাটা আমি আধঘণ্টার মধ্যে পেয়ে যাব। দশ হাজার টাকার পাঁচটা বান্ডিল।'

'বাঃ গুড। আমি এখনই যাচ্ছি।'

'কোথায়?'

'তোমার বাড়িতে। আমি ঠিকানা জানি।'

'আমার বাড়িতে নয়।'

'কেন?'

'এখানে সবসময় ফিল্মের লোক আসছে যাচ্ছে। তোমাকে অত টাকা দিলে সন্দেহ করবে। কিন্তু টাকা দেওয়ার আগে আমার সব ছবি চাই।'

'পেয়ে যাবে। ডান হাতে নেব বাঁ হতে দেব।'

চালাকি করার চেষ্টা করবে না। নেগেটিভ নিয়ে আসবে।'

'আরে বাবা, এসব ট্রানজ্যাকশনে বিশ্বাসই হল মূলধন।'

'তুমি যদি ভাবো কি কি ছবি তুলেছ আমি ভুলে গেছি তাহলে খুব ভুল করবে। আমি সব দেখে তবে তোমায় টাকা দেব।'

'বলছি তো, আমি বেইমানি করব না', কমলেন্দু হাসল, 'বাড়িতে যেতে মানা করছ, কোথায় যাব?'

'ফ্লুরিস রেস্টুরেন্টে।'

'ওটা তো পার্ক স্ট্রিটে।'

'হ্যাঁ। এগারোটা নাগাদ চলে এস সব ছবি নিয়ে।'

'থ্যাঙ্ক ইউ। খুব কম হয়ে গেল, কিন্তু—।'

লাইনটা কেটে দিল অদিতি। আর কথা বলতে একটুও ইচ্ছে করছে না। সে নিঃশ্বাস ফেলল। যে রাতে কমলেন্দুর বারবার অনুরোধে সে ছবিগুলো তুলতে দিতে রাজি হয়েছিল সে রাতে কি একবারও ভাবতে পেরেছিল এ রকম একটা দিন আসবে?

কার্ড দেখে পুলিশ অফিসারকে ফোন করল সে। ভদ্রলোক বললেন, 'বাঃ, খুব ভাল হয়েছে।'

'আমি কি করব?'

'কিছু না। বাড়িতে থাকুন।'

'তাহলে!'

'ওকে আপনার পরিচালক চেনে। মিলন আমাকে চিনিয়ে দেবে। আপনি স্পটে গেলে খবরটা যদি ফাঁস হয়ে যায় তাহলে কাগজের নিউজ হয়ে যাবেন। কি দরকার!'

যেতে হল না বলে যেন রক্ষা পেল অদিতি। কিন্তু কিছুক্ষণ বাদেই তার কৌতূহল হতে লাগল। যদি কমলেন্দু রেস্টুরেন্টে না যায়। যদি বাইরে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য করে সে আগে রেস্টুরেন্টে ঢুকছে কিনা। না দেখলে ফিরে যেতে পারে। অথবা গেল কিন্তু সঙ্গে ছবিগুলো রাখল না। সেক্ষেত্রে পুলিশ ওর কিছুই করতে পারবে না। এই ফ্ল্যাটের ঠিকানা ও জানে বলেছে, প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে উঠবে তখন।

রক্তচাপ এভাবে কখনও বেড়ে যায়নি অদিতির। পৌনে বারোটা নাগাদ ফোনটা বাজল। ভয়ে ভয়ে রিসিভার তুলল সে। মিলনদার গলা। 'কাজ হয়ে গেছে অদিতি।'

'মানে?'

'কমলেন্দুকে পুলিশ অ্যারেস্ট করেছে। ওর সঙ্গে ছবি এবং নেগেটিভ ছিল। ওগুলো এখন পুলিশের হেফাজতে। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

'ও কিছু বলেছে?' অদিতি কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'খুব ঘাবড়ে গিয়েছে। পুলিশ যে ওকে ধরবে ভাবতেই পারেনি। ঠিক আছে আমি রাখছি এখন। নিশ্চিন্তে ঘুমাও এবার।' মিলন ফোন রেখে দিল।

অদিতির মনে হল পুকুরের তলা থেকে একটানে কেউ তাকে ওপরের বাতাসে এনে দিল। আঃ। কী আরাম।

সেদিনই কার্ড এল। সন্ধ্যেবেলায় নন্দনে প্রেস শো এবং রাত্রে গ্র্যান্ড হোটেলে

ককটেল এবং ডিনার। কার্ড হাতে নিয়ে ছবির শিল্পী-তালিকায় নিজের নাম পড়ল সে। একেবারে সবার শেষে লেখা 'এবং নবাগতা নায়িকা অদিতি।' কার্ডের ওপরে তার মুখের আদল, কায়দা করে ঝাপসা ছাপা হয়েছে।

সন্ধ্যেবেলায় সুলেখা এসে কার্ড দেখে লাফাল। 'আমি যাব, আমি যাব।'

অদিতির মনে হল সুলেখা সঙ্গে গেলে ভাল হয়। অত বিখ্যাত মানুষের ভিড়ে সে কার সঙ্গে কথা বলবে। অস্বস্তি নিয়ে একা দাঁড়িয়ে থাকার বদলে যদি সুলেখা সঙ্গে থাকে তাহলে সময় কাটাতে পারবে। কিন্তু কার্ডের ওপরে শুধু তার নাম লেখা রয়েছে। ওদের কি মাথাগুণতি নিমন্ত্রিত? কার্ডের নিচে প্রোডিউসারের নাম লেখা। কিন্তু তাকে টেলিফোন করতে লজ্জা করল। মিলনদার সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিলেই হবে, সে ভাবল।

অনুষ্ঠানের দিন সকালে মিলনই ফোন করল, 'আসছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'শোন, তুমি কি ছবিটা দেখবে আজ?'

'হ্যাঁ।'

'অতক্ষণ বসে থাকার পর ককটেল পার্টিতে যাওয়ার সময় মেকআপ ঠিক থাকবে তো? প্রেডিউসার চাইছেন তোমাকে যেন পার্টিতে খুব সুন্দরী দেখায়।'

'কোন অসুবিধা হবে না।'

'তোমার বউদি অবশ্য সিনেমাটা দেখবে কিন্তু পার্টিতে যাবে না।'

'কেন?'

'ওখানে সব হাইফাই ব্যাপার। মদ্যপান হবে। ও ওই পরিবেশ নিজেকে নাকি মানাতে পারবে না।'

'আমি না হয় বউদির সঙ্গে কথা বলব।'

'দেখো, বলে দেখো, সিনেমা দেখতে গিয়ে তো দেখা হবে।'

'আচ্ছা, আমি সুলেখাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?'

'কে সুলেখা?'

'আমার সঙ্গে যে আছে। খুব ভাল মেয়ে।'

'ওকে গ্র্যান্ডে নিয়ে যাওয়া ঠিক হবে না। বুঝতেই পারছ। তবে ওকে নন্দনে নিয়ে আসতে পারো। ওখান থেকে একা ফিরে যেতে পারবে তো?'

'মনে হয় পারবে।'

'আর হ্যাঁ। চারটার সময় একজন মেকআপম্যান আর হেয়ার ড্রেসারকে নিয়ে সামন্ত যাবে তোমার ওখানে। সাড়ে পাঁচটার মধ্যে ওরা তৈরি করে দেবে তোমাকে। ওইসময় গাড়ি যাবে। গাড়িটা পার্টি শেষ হলে তোমাকে পৌঁছে না দেওয়া পর্যন্ত থাকবে।'

সুলেখার জন্যে খারাপ লাগল অদিতির। ও যে অতবড় পার্টিতে মানানসই নয় একথা সে ওকে বলবে কি করে? কিন্তু মেয়েটা সহজ। মিলনের কথাগুলো ওকে

বলতেই চোখ বড় করল, 'ওরে বাব্বা! তোমাকে বাড়ি থেকে মেকআপ করিয়ে নিয়ে যাবে? তাহলে আমি যাচ্ছি না।'

'কেন?'

'দূর। হাঁসের মধ্যে কাক হয়ে ঘুরব নাকি আমি? তার চেয়ে সামনের শনিবার ম্যাটিনি শোতে সিনেমা দেখে নেব। এই তো কাছেই হচ্ছে। কিন্তু মদ খাওয়ানো হবে বললে, তুমি যেন খেয়ো না।'

'পাগল!' অদিতি হেসে ফেলল।

ঠিক চারটের সময় সামন্ত এসে গেল, 'দিদিভাই, রেডি?'

'রেডি মানে?'

'লক্ষ্মণকে একটা জায়গা করে দাও। লক্ষ্মণ, একেবারে পার্টির মেকআপ। রাত বারোটা পর্যন্ত ঠিক থাকে যেন!'

'শিবের বাবার সাধ্য নেই বিকেল চারটেয় মেকআপ করে রাত বারোটা পর্যন্ত ঠিক রাখা। ছবি কখন ভাঙবে?'

'আটটায়।'

'আমি তখন গাড়িতে থাকব। দিদিভাইকে আর একবার মেরামত করে দেব। তোমার কোন চিন্তা নেই।'

অদিতি জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা, আমি স্বাভাবিকভাবে গেলে কি ক্ষতি হবে? তোমরা তো বল আমি দেখতে খারাপ নই।'

হো হো করে হেসে উঠল সামন্ত, 'দিদিভাই, এটা হল শো ওয়ার্ল্ড। ব্যবসাটার নাম শো বিজনেস। এখানে স্বাভাবিকতার কোন মূল্য নেই। সবকিছু নকল, সাজানো, বুঝলে?'



[ছাব্বিশ]

নন্দনের সামনে ভাল ভিড়। গাড়ি থেকে নামামাত্র সামন্ত তাকে যেভাবে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে লাগল যে সবার চোখ পড়ল তার উপর। অদিতির সংকোচ বেড়ে গেল। একেই স্যুটিং-এর আগে মেকআপ নেওয়ার মত এরা তাকে দেড় ঘণ্টা ধরে সাজিয়েছে, সুলেখা সেই সাজ সম্পূর্ণ হলে চোখ কপালে তুলে বলেছে, 'ও মাগো, তোমাকে একদম সিনেমার নায়িকার মত দেখাচ্ছে!' সামন্ত তাকে কপট ধমক দিয়েছিল, 'সিনেমার নায়িকাই তো, ঠিকই দেখাচ্ছে।' আর এসবের পর সামন্তর হাত নেড়ে এগিয়ে যাওয়া, অথচ কিছুই করার নেই।

ওপরের চাতালে ওঠামাত্র মিলন এগিয়ে এল, 'আর পাঁচ মিনিট বাকি আছে ছবি শুরু হতে। এখন কারও সঙ্গে কথা বলো না। যাও।'

গেটের দিকে এগোতেই ক্যামেরার ফ্ল্যাশ জ্বলল। তিন-চারজন লোক, তারা নিশ্চয়ই সাংবাদিক। এগিয়ে এসে প্রশ্ন করতে লাগল। সামন্ত চেঁচালো,'এখন নয়, এখন নয়। মুখ নিচু করেই প্রেক্ষাগৃহে ঢুকে গেল অদিত। তার ঘাম হচ্ছিল। কিন্তু প্রেক্ষাগৃহের ঠাণ্ডা তাকে আশ্বস্ত করল।

তখনও আলো নেভেনি। অদিতিকে ওরা দ্বিতীয় সারিতে বসাতেই সে দেখতে পেল পাশে মিলনদার স্ত্রী বসে আছেন।

'তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।'

অদিতি মুখ নিচু করল। এখন সামনে পেছনের মানুষজন তাকে দেখছে। একটু বাদেই ছবির নায়ক এসে তার আর একপাশে বসল, 'হ্যালো।' অদিতি মাথা নাড়ল।

'তোমাকে যা দেখাচ্ছে তাতে আফসোস হচ্ছে!' নায়ক বলল।

'কেন?'

'আগেই বিয়ে করে ফেলেছি বলে!'

'ভ্যাট!' মুখ তুলল অদিতি, 'মিসেস কোথায়?'

'বাচ্চা হবে। এই অবস্থায় আসতে লজ্জা পেলেন।'

'ও। অভিনন্দন।'

'ধন্যবাদ।'

ছবি আরম্ভ হয়ে গেল। নায়ক গাড়ি চালাচ্ছে। আকাশে মেঘ। পথ নির্জন। নায়ক একটু অন্যমনস্ক। ঘড়ি দেখল। চোখ তুলতেই সামনে একজন মানুষকে রাস্তা পার হতে দেখল। দ্রুত ব্রেক কষল নায়ক। কিন্তু সংঘর্ষ এড়ানো গেল না। দ্রুত দরজা খুলে রাস্তায় নেমে এসে দেখল যে উপুড় হয়ে পড়ে আছে সে একজন মেয়ে। নায়ক তার পাশে বসে চিৎ করে দিতেই পর্দায় নিজেকে দেখতে পেল অদিতি। মাথা থেকে রক্ত গড়িয়ে এল কপালে, গালে।

দু'ঘণ্টার ছবি দেখতে দেখতে একবারও মনে হচ্ছিল না সে নিজের অভিনয় দেখছে। পর্দায় তখন সুবর্ণা, দুর্ঘটনার পর পর স্মৃতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। প্রতিটি দৃশ্যে দর্শকের সহানুভূতি আদায় করে নিচ্ছে সুবর্ণা। তার হাবভাব, কথা বলা, হাসি যেন অন্য স্বাদ এনে দিচ্ছে দর্শকদের। চার চারটি গান আছে সুবর্ণার মুখে। প্রতিটি গানই অনবদ্য। ছবি যখন শেষ হল তখন সুবর্ণার বিদায় নেওয়ার পালা। নিজের চোখে জল আবিষ্কার করল অদিতি। পাশ থেকে, পেছন থেকে কান্না চাপার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছিল। মিলনের স্ত্রী ওর হাত জড়িয়ে ধরল! 'কী ভাল অভিনয় করেছ অদিতি। তুমি অনেক ওপরে উঠবে, দেখো।'

'সব আপনার জন্য বউদি।'

'আমার জন্যে?'

'আপনি যদি দাদাকে না বলতেন তাহলে আমাকে এখনও ওই সেলসগার্লের চাকরি করতে হত।' অদিতি হাত ধরে বলল।

এই সময় আলো জ্বলে উঠল। নায়ক বলল, 'অভিনন্দন।'

'মানে?'

'তুমি বাংলা ছবিতে থেকে গেলে।'

ওরা উঠে দাঁড়াতেই দর্শকরা চিৎকার করে উঠল। তারা দাবি জানাতে লাগল নায়িকাকে স্টেজে উঠতে হবে, একেবার দেখতে চায় সবাই। এরকম কোন পরিকল্পনা ছিল না। স্টেজের কোন ব্যবস্থা করা নেই। তবু প্রযোজকএকপাশের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠলেন। হাতজোড় করে বললেন, 'আমার মনে হচ্ছে ছবিটি আপনাদের ভাল লেগেছে। আমি প্রথমে এই ছবির পরিচালকের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিচ্ছি।' একে একে পরিচালক এবং নায়ককে মঞ্চে তোলার পর তিনি যখন অদিতির নাম ঘোষণা করলেন তখন প্রেক্ষাগৃহ হাততালিতে ফেটে পড়ল।

অদিতি মঞ্চে উঠল। তার পা কাঁপছিল। কোনমতে দু'হাত জড়ো করে নমস্কার করেই সে নেমে এল।

নন্দনের পাশে দাঁড়ানো গাড়িতে তাকে তুলে দিল সামন্ত। মিলন ও সে ড্রাইভারের পাশে বসল। গাড়ি একাডেমি ছাড়িয়ে একটা নির্জন জায়গায় দাঁড়াতেই পাশে বসা লক্ষ্মণ বলল, 'আলো বড় কম, তবু, এদিকে তাকাও দিদিভাই।'

রাস্তায় লোকজন নেই। মাঝে মাঝে গাড়ি যাচ্ছে হুশহাশ করে। স্ট্রিট লাইটের আলোয় অদিতির মুখ দেখে লক্ষ্মণ বলল, 'এঃ, সব মেকআপ একদম গলে গেছে।এত ঘামলে কেন দিদিভাই?'

অদিতি কি করে বলবে কেন সে ঘামল?

মিনিট পনেরো হাত চালাল লক্ষ্মণ। এই সময় একটা পুলিশের জিপ এসে দাঁড়াল পাশে, 'কি হচ্ছে এখানে?'

'মেকআপ।' সামন্ত জবাব দিল।

'কিসের মেকআপ?'

'শ্যুটিং হবে দাদা, তাই ফিনিশিং টাচ দেওয়া হচ্ছে।'

'হিরোইন?'

'হ্যাঁ।'

'কে? দেবশ্রী রায়?'

'না নতুন।'

'ওঃ। এখানে বেশিক্ষণ দাঁড়াবেন না, চলে যান।'

মেকআপ হয়ে গিয়েছিল। লক্ষ্মণ নেমে গেল তার জিনিসপত্র নিয়ে পরের বাসস্টপে।

সামন্তকে মিলন বলল, 'ওকে একদিনের পেমেন্ট দিয়ে দিও।'

'নেবে না।'

'নেবে না! সেকি? কেন?'

'ওকে পেমেন্টের কথা বলেছিলাম। ও বলল, দিদিভাই-এর আজ অভিষেক হতে যাচ্ছে। শ্যুটিং তো নয়। এর জন্যে টাকা নেব কেন?'

কথাগুলো শুনল অদিতি। কৃতজ্ঞতা বেড়েই চলেছে।

গ্র্যান্ড হোটেলের ব্যাঙ্কোয়েট গম গম করছে। কলকাতার সব বড় বড় মানুষ আজ এখানে নিমন্ত্রিত। তাদের সাজগোজ চোখে পড়ার মত। অনেক সুন্দরী মহিলা এক জায়গায় জড়ো হলে কাউকে আলাদা করে সুন্দরী বলে মনে হয় না। প্রোডিউসার এগিয়ে এসে অদিতির দিকে তাকালেন, 'গুড। এখন আমি তোমার সঙ্গে অনেকের আলাপ করিয়ে দেব। ব্যক্তিগতভাবে। এসো।'

শ দুয়েক মানুষ। কারও হাতে হুইস্কির গ্লাস, কারও হাতে শীতল পানীয়। ইনি শিল্পপতি অনীল দত্ত, মিসেস দত্ত। নমস্কার, নমস্কার। আমার ছবির নায়িকা অদিতি। নমস্কার। ইনি বিখ্যাত পরিবেশক, ইনি আই এ এস অমুক, ইনি বিরাট ব্যবসায়ী, ইনি বোম্বের বিখ্যাত প্রোডিউসার অমুক। নমস্কার করতে করতে হাত ব্যথা হয়ে গেল ওর।

এবার সাংবাদিকরা ওকে ঘিরে ধরল।

'আপনি কিভাবে এই ছবিতে কাজ পেলেন?'

মিলন চলে এল পাশে, 'নতুন ছবির জন্যে নতুন মেয়ে খুঁজছিলাম, আমার স্ত্রীর সঙ্গে ওঁর পরিচয় ছিল। সেই সূত্রেই ওকে নির্বাচিত করেছি।'

'ফিল্মে আসার আগে কি করতেন?'

'সদ্য পাস করেছিল ও। আর কিছু করতে না দিয়ে ফিল্মে নিয়ে এলাম।'

'আপনি কি কলকাতার মেয়ে? আপনি বলুন ম্যাডাম।'

'না। আমার বাড়ি কৃষ্ণনগরে।'

'নিজের অভিনয় কিরকম লাগল?'

'আপনারা বলবেন!'

'আমাদের খুব ভাল লেগেছে। খুব ফ্রেশ।'

'ধন্যবাদ।'

'আপনি কি বিবাহিত?'

এক সেকেন্ড দ্বিধা। তার মধ্যেই মিলন বলল, 'প্রশ্নটা কি অবান্তর নয়। শুনলেন তো পাস করেই ফিল্মে এসেছে।'

'ও হ্যাঁ। আপনার নিশ্চয়ই বয়ফ্রেন্ড আছে?'

অদিতি মাথা নেড়ে না বলল।

'নেই? কেন?'

'সময় পাইনি, ইচ্ছেও হয়নি।'

'আর কোন ছবিতে অফার পেয়েছেন?'

'না।'

এইসময় একজন সাংবাদিক বললেন, 'আপনাকে সুখবর দিচ্ছি। আজ আপনার অভিনয় দেখে অন্তত তিনজন প্রোডিউসার আপনাকে নায়িকা হিসেবে ভেবেছেন। দু-একদিনের মধ্যেই জানতে পারবেন।'

'আপনি কি খেতে ভালবাসেন?'

'জল। পাব?'

'রঙিন না সাদা।'

'একেবারে সাদা। আমি বাঙালি মেয়ে, সাদা জলই আমার জীবন।'

সঙ্গে সঙ্গে একগ্লাস জল এসে গেল। সেটায় দুটো চুমুক দিতে গলা ভিজল অদিতির। এইসময় গুঞ্জন উঠল। একজন সাংবাদিক বলল, 'উনি এখানেও নিমন্ত্রিত? ভি ভি আই পি ব্যাপার!'

প্রোডিউসার তড়িঘড়ি এগিয়ে এলেন, 'এবার ওকে একটু ছেড়ে দিন ভাই। গেস্টরা অপেক্ষা করছেন।' সাংবাদিকদের কাছ থেকে অদিতিকে নিয়ে তিনি এগিয়ে গেলেন আলাপরত দুই ভদ্রলোকের সামনে। একজন অবাঙালি, বয়স্ক। অন্যজনের বয়স বেশ কম, তিরিশের আশপাশে।

'মিস্টার সেন। আপনি শেষ পর্যন্ত এসেছেন বলে আমি খুব খুশী।' বেশ আনন্দের সঙ্গে বললেন প্রোডিউসার।

'ইটস মাই প্লেজার।' যুবক ভদ্রলোক হাসলেন।

'ইনি মিস্টার সেন। বিখ্যাত শিল্পপতি। এত অল্প বয়সে দেশবিদেশে এর আগে কেউ ওঁর মত বিখ্যাত হননি। আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ওঁর বাবা। আর ইনি আমার এই ছবির নায়িকা, অদিতি।' প্রোডিউসার কথা শেষ করতেই দু'হাত তুলেছিল অদিতি নমস্কার জানাতে। কিন্তু দেখা গেল মিস্টার সেন তার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন।

অদিতি বলল, 'নমস্কার।'

প্রোডিউসারকে কেউ একজন এসে কিছু বলতে তিনি ব্যস্ত হয়ে চলে গেলেন। অদিতি দেখল ভদ্রলোক তখনও একইভাবে দেখছেন।

পাশের অবাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'মিস্টার সেন, আপনি তো সবসময় ভাগ্যবান কিন্তু নমস্কারটা ফিরিয়ে দিলেন না এখনও!'

যেন খেয়াল হল ওঁর। সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'নমস্কার, আমি জয়ন্ত।'

অবাঙালি ভদ্রলোক বললেন, 'আপনারা কথা বলুন। আমি মিস্টার ছাবাড়িয়ার সঙ্গে আলাপ করে আসি।'

জয়ন্ত সেন পকেট থেকে পার্স বের করে একটা সুন্দর কার্ড দুই আঙুলে ধরে বললেন, 'আমার কথা যদি মনে রাখেন তাহলে খুশী হব।'

অদিতি কোন কথা বলতে পারল না, কার্ডটা নিল।

'আপনি অভিনয় করেন?'

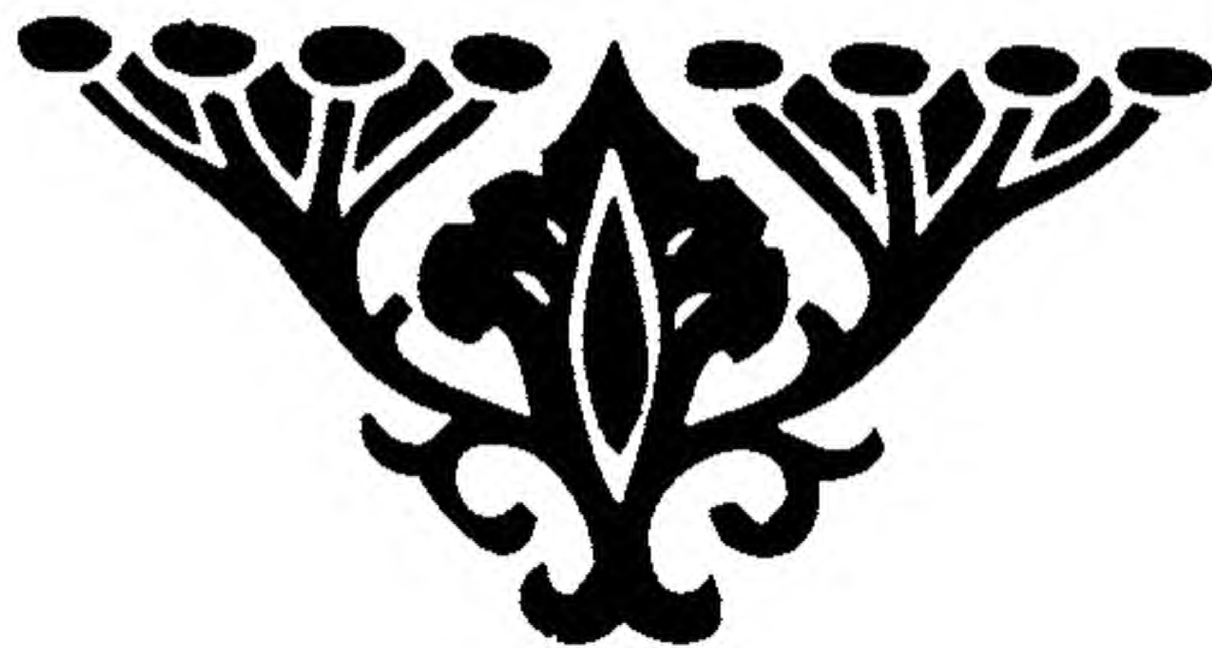
'এই প্রথম।'

'আচ্ছা—!'

প্রোডিউসার ফিরে এলেন। জয়ন্ত সেন তার সঙ্গে কথা বলতে শুরু করলে অদিতি সরে এল। কিন্তু সে লক্ষ্য করছিল ভিড়ের মধ্যেও জয়ন্ত সেন তার দিকে তাকাচ্ছে ঘন ঘন। অদিতির শরীরে আচমকা একটা শিরশিরানি শুরু হল। সে মিলনের কাছে গিয়ে বলল, 'আমি বাড়ি যাব।'

'সেকি? এখনই?' মিলন অবাক, 'খাবে না?'

'না। শরীরটা ভাল লাগছে না।' মিথ্যে বলল অদিতি। তার কেবলই মনে হচ্ছিল এখান থেকে এখনই চলে যাওয়া উচিত।



[সাতাশ]

সুলেখা বেরিয়ে গেছে তার কাজে। সারাটা দিন অদিতিকে একাই থাকতে হয় ফ্ল্যাটে। এই সময় যদি কেউ বেল বাজায় তাহলে মুশকিলে পড়তে হয়। ছোট শেকলের আড়াল রেখে দরজা খুলে কথা বলতে হয় অদিতিকে। অবশ্য বেশিরভাগ লোকই ফেরিওয়ালা। যেহেতু এই ফ্ল্যাটে বেশিদিন থাকা যাবে না, ছবি রিলিজ করা পর্যন্ত প্রযোজক থাকতে দিয়েছেন, তাই এখানে গুছিয়ে বসতে পারছে না অদিতি। তাহলে ফাইফরমাশ খাটার জন্যে একটা বাচ্চা ছেলেকে রাখা যেত। ফ্ল্যাটটাকেও সাজানো যেত মনের মত করে।

সাজানোর কথা মনে আসতেই খেয়াল হল, টাকা ফুরিয়ে যাচ্ছে হু হু করে। সবাই তাকে নিয়ে যতই মাতামাতি করুক ডালভাত তরকারি কেনার জন্যেও তো খরচ করতে হবে। হাতে যা আছে তাতে বড়জোর মাস দুয়েক চলবে। এখন যদি ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে হয় তাহলে অগাধ-জলে পড়তে হবে। অদিতির একমাত্র আশা, ছবিটা ভাল চললে প্রযোজক তাকে এখনই উৎখাত করবেন না।

অদিতি টেলিফোনের কাছে আসতেই কার্ডটাকে দেখতে পেল। সঙ্গে সঙ্গে শক্ত হয়ে গেল সে। সেই রাতে পার্টি থেকে ফিরে এসে বারংবার নিজেকে সতর্ক করেছে সে। ভালবেসে একবার বিয়ে করার পর তার কাছে পুরুষের চাহনি, কথা বলার ধরন অস্পষ্ট নয়। অথচ বারংবার ইচ্ছে হয়েছে ওই কার্ডের নম্বরে ফোন করতে। ভদ্রলোক কি বলেন তা শুনে না হয় ফোন রেখে দেবে। অতবড় মন্ত্রীর ছেলে হয়েও যিনি তাকে অত গুরুত্ব দিয়েছেন তার সঙ্গে না হয় একটা কি দুটো ভদ্রতা করে কথা বলা গেল। একেবারে শেষ মুহূর্তে ইচ্ছেটাকে লাগামবন্দী করতে পেরেছিল সে। না, আর কোন সমস্যাকে সে যেচে ডেকে আনবে না।

রাত্রে, বারোটা নাগাদ ফোন বেজেছিল। এক নাগাড়ে অনেকক্ষণ। ঘুম থেকে উঠে সুলেখা ফোন ধরতে গিয়েছিল কিন্তু নিষেধ করেছিল সে। এত রাতে যারা ফোন করে তারা সুস্থ কথা বলতে চায় না। বেজে বেজে ফোন থেমেছিল এক সময়। টিপ্ টিপ্ করছিল বুক, অদিতির মনে হয়েছিল বাঁচা গেল, সুলেখা যদি রিসিভার তুলে শুনত কার ফোন!

বেল বাজল। অদিতি দরজার দিকে তাকাল। তারপর ঠোঁট কামড়ে লক্ খুলল চেনটা লাগিয়ে। এক ইঞ্চি ফাঁক দিয়ে তাকাতেই সে মিলনকে দেখতে পেল। সঙ্গে আর একজন। তাড়াতাড়ি দরজাটাকে চেনমুক্ত করে সে হাসল, 'আরে! আসুন আসুন। আমি ভাবতেই পারিনি।'

মিলনদার সঙ্গী তার সেই বন্ধু পুলিশ অফিসার।

চেয়ারে বসার পর মিলন বলল, 'অদিতি, তোমাকে তো সমস্যার কথা বলা

হয়েছিল। কমলেন্দুকে তো কোর্টে তোলা হয়নি। বুঝতেই পারছ কোর্টে তুললে ওর বিরুদ্ধে তোমার অভিযোগের কথা জানাতে হত। তোমাকে ইনভলভ্ না করলে এই কেস আদালতে তোলাই যাবে না। আমরা চাইনি আজই তুমি আদালতে যাওয়া আসা করতে বাধ্য হও। ছবি রিলিজ করছে, সঙ্গে সঙ্গে তোমার সম্পর্কে নানান গুজব শুরু হয়ে যাবে। তুমি বুঝতে পারছ ব্যাপারটা?'

অদিতি মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলল।

অফিসার বললেন, 'এরকম ক্ষেত্রে একটা সমস্যা হয়। আসামী যেই বুঝে যায় তাকে আদালতে তোলা হবে না অমনি সে অ্যাডভানটেজ নিতে শুরু করে। কাউকে গ্রেফতার করে দিনের পর দিন থানায় ধরে রাখা যায় না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আদালতে তুলতেই হয়। মিলনের কাছে শুনলেন কেন ওকে আদালতে তোলা হয়নি। ওর নামে একটা মিথ্যে কেস সাজানো যেতে পারে। ওই কেসের সঙ্গে আপনার কোন সম্পর্ক নেই। আপনার আপত্তি নেই তো?'

অদিতি বলল, 'আপনারা যা ভাল মনে করবেন তাই করুন।'

অফিসার মাথা নাড়লেন, 'না, সিদ্ধান্ত আপনাকেই নিতে হবে। যখন সোজা পথে ওকে শাস্তি দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না তখন বাঁকা পথে যেতে পারি। এমন মামলায় ওকে জড়াতে পারি যাতে অন্তত চার বছর জেলে থাকতে বাধ্য হয়। বিচারক যদি মনে করেন আরও বেশি সময় শাস্তি হতে পারে। আপনি সম্মতি দিচ্ছেন তো?'

'আমার ছবিগুলো?'

অফিসার ব্রিফকেস খুলে একটা বড় খাম টেবিলের ওপর রেখে বললেন, 'এর মধ্যে নেগেটিভ আর প্রিন্ট রয়েছে। মনে হয় ব্ল্যাকমেইল করার মত আর কোন প্রিন্ট ওর হাতে নেই।'

মিলন বলল, 'আমরা কিন্তু নিশ্চিত নই। কমলেন্দু বলেছে এই খামের বাইরে আর কোথাও ছবি নেই। হয়তো ঠিক! তবে যারা এসব কাজ করে তারা কতটা সত্যি কথা বলে তা বোঝা মুশকিল।'

'ও কি এখনও থানায় আছে?' অদিতি জিজ্ঞাসা করল।

'না। থানায় রাখা যাবে না।' অফিসার হাসলেন, 'অবশ্য এখনও ও যেখানে আছে সেখান থেকে সহজে বেরুতে পারবে না।'

মিলন বলল, 'আর একটা রাস্তা আছে। কমলেন্দু মুচলেকা দিয়েছে। সে কথা দিয়েছে ওই ছবিগুলো দেখিয়ে কখনও তোমাকে ব্ল্যাকমেইল করবে না। তোমার ধারে-কাছে সে কখনও আসবে না। অবশ্য এধরনের লোক কখনই সত্যি কথা বলে না, আর কমলেন্দু যদি কথার খেলাপ করে তাহলে—!'

পুলিশ অফিসার বললেন, 'ওটা নিয়ে পরে ভাবলেও চলবে। হ্যাঁ, আপনি যদি মনে করেন কমলেন্দু চুপচাপ হয়ে যাবে তাহলে ওকে ছেড়ে দিতে পারি।'

অদিতি মাথা নাড়ল, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

মিলন বলল, 'স্বাভাবিক। ওর কাছ থেকে ছবি কিনে যদি কোন কাগজ ছাপতো তাহলে যতলোক জানতে পারত আইন আদালত কলমে খবর বের হলে তার চেয়ে অনেক বেশি লোক ইন্টারেস্টেড হবে। তোমার ক্যারিয়ার এবং আমার ছবির স্বার্থে সেটা হতে দিতে পারি না।'

'তাহলে ওকে ছেড়ে দিন।' নিচু গলায় বলল অদিতি।

দু-একটা কথা বলার পর ওরা চলে গেলে অদিতি খামটার দিকে তাকাল। এই খামটাকে সে চেনে। এপরে কমলেন্দুর হাতের লেখা 'অদিতি।' সে খামটা তুলল। উঁচু করে ধরতেই ছবিগুলো ছড়িয়ে পড়ল টেবিলে। দু'চোখ বন্ধ করল অদিতি। এই সব ছবি সে কি করে তুলতে দিয়েছিল। ছবির সঙ্গে নেগেটিভ রয়েছে। সবগুলোকে জড়ো করে সে রান্নাঘরে নিয়ে গেল। টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে দেশলাই জ্বেলে আগুন ধরিয়ে দিল। মেঝের ওপর ছবিগুলো আগুনে পুড়ছে। ধোঁয়া বের হচ্ছে। কুঁকড়ে কুঁকড়ে যাচ্ছে নেগেটিভ, প্রিন্ট। তারপর এক সময় সব ছাই হয়ে গেল। সব। ঝাটা দিয়ে ছাই জড়ো করে ময়লার বালতিতে ফেলে দিল অদিতি। তারপর বেরিয়ে এল বারান্দায়। রাস্তার ওপাশে হোর্ডিং-এ যে অদিতি হাসছে তার সঙ্গে ছাই হয়ে যাওয়া অদিতির কোন সম্পর্ক নেই। আর পেছনে ফিরে তাকাবে না সে।

এই সময় বেল বাজল। আবার কে? সেলসগার্ল? তার মত কেউ জিনিস বিক্রি করতে এসেছে? তা না হয়ে যদি কমলেন্দু হয়? হলে হবে। চূড়ান্ত অপমান করবে লোকটাকে। দ্বিতীয়বার বেল বাজতেই সে প্রায় দৌড়ে দরজায় চলে গেল। নব্ ঘুরিয়ে দরজা ফাঁক করতেই চম্‌কে উঠল। খুব তাড়াতাড়ি দরজা খুলে চিৎকার করে উঠল, 'একি তোমরা?'

বাবার চোখে কালো চশমা, বেশ অসহায় অবস্থা, মায়ের মুখ চোখে একটু অপরাধীভাব, 'ফিরে এলাম। স্টেশন থেকেই বাড়ি চলে যেতাম কিন্তু তোর বাবা বলল একবার তোর সঙ্গে দেখা করে গেলে ভাল হয়।'

'ঠিক করেছ। এস, ভেতরে এস। মালপত্র কোথায়?' একমাত্র ব্যাগটা তুলে নিল অদিতি। বেশ ভারী।

ভেতরে ঢুকে মা বলল, 'ওতেই সব আছে।'

দরজা বন্ধ করে অদিতি বলল, 'আগে বসো এখানে। জল খাও, জিরোও, তারপর কথা বলবে।'

সে দ্রুত রান্নাঘরে গিয়ে দ'গ্লাস জল নিয়ে এল।

সেটা খেয়ে মা বলল, 'এখ্যানে তুই থাকিস?'

'হ্যাঁ।'

'একা?'

'না, আমার সঙ্গে আর একটি মেয়ে থাকে, সুলেখা। আমি আগে যে মেসে ছিলাম সেখানে ও ছিল। সুলেখাই সব করে দেয় আমার।'

'কোথায় সে?'

'সে তার কাজে গিয়েছে। এখন বল, বাবার অপারেশন কেমন হল?'

'খুব ভাল। ডাক্তার বলেছে আরও কদিন চশমা ব্যবহার করতে। চোখে আলো যেন না পড়ে। হ্যাঁরে, এটা কি ভাড়ায় পেয়েছিস?'

'না। আমি যাদের সঙ্গে কাজ করি তারা থাকতে দিয়েছে।

বাবা বললেন, 'কোয়ার্টার্স। অফিস থেকে সাধারণত দেয়।'

অদিতি হাসল, 'এখানে কিভাবে এলে?'

'আমাদের সঙ্গে একজন আসছিল। তাকে ঠিকানাটা দেখাতে বলল সে এদিকে আসছে। ওই ট্যাক্সিতে আমাদের এখানে পৌঁছে দিয়ে গেল। এত ভাল বাড়িতে আমি কোনদিন থাকি নি রে!'

'এ এমন কি বাড়ি!'

'কি বলছিস? কী সুন্দর দেওয়াল, মেঝে, আলো, পাখা। হ্যাঁরে তোর ঘর কটা?' মা উঠে দাঁড়াল।

হঠাৎ মায়ের জন্যে কষ্ট হল অদিতির। কৃষ্ণনগরের পুরনো প্রায় নোনাধরা বাড়িতে মা যে কোনদিন সুখ পায়নি তা এই মুহূর্তে বোঝা গেল। ঘর দেখতে দেখতে মা বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। তারপরই উত্তেজিত গলায় বলে উঠল, খুকী, অ্যাই খুকী, এ যে দেখছি তোর ছবি।'

মায়ের পাশে গিয়ে দাঁড়াল অদিতি। কি রকম লজ্জা লাগল তার। মা ওর দিকে একবার তাকাচ্ছে আর একবার ছবির দিকে। সে বলল, 'এতদূরে এলে স্টেশন থেকে, পথে চোখে পড়েনি?'

'না তো! আমি তো রাস্তার দিকে তাকাইনি। হ্যাঁরে, তোর ছবি কি সমস্ত কলকাতায় এখন দেখা যাচ্ছে?' মায়ের চোখে বিস্ময়।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে তো রাস্তায় বেরুলে তোকে সবাই চিনে ফেলবে?'

'আমি রাস্তায় বেরুচ্ছি না। যখন কাজে যাই গাড়িতেই যাই।'

'এই শুনছ!' মা চিৎকার করল।

বাবা এগিয়ে এল বারান্দায়, 'বল।'

'খুকীর ছবি সমস্ত কলকাতায় টাঙানো হয়েছে। ও তো সিনেমায় নেমেছে। ওই দ্যাখো।'

'আমি তো এখন দেখতে পাব না।'

'ও তাই তো। আমার যে কি ভাল লাগছে!'

'হয়েছে।' অদিতি বলল, 'এখন একে একে জামাকাপড় ছাড়ো, আমি ভাত বসাচ্ছি, খেয়ে নেবে। অতদূর থেকে এসেছ!'

অদিতি ওদের নিয়ে ভেতরে এল।

মা বলল, 'আমি ভেবেছিলাম বিকেলে কৃষ্ণনগরে চলে যাব।'

'তো?' অদিতি তাকাল।

'ভাবছি তোর এখানে কদিন থেকে যাই।' মা বলল।

'থাকো না। কাজ না থাকলে মুখ বুজে বসে থাকি। তোমরা থাকলে আমার খুব ভাল লাগবে।' অদিতি হাসল।

হঠাৎ বাবা নাক টানলেন, 'কি যেন পুড়ছে!'

'পুড়ছে? তুই কিছু রান্না করছিলি?' মা জিজ্ঞাসা করল।

'না তো!'

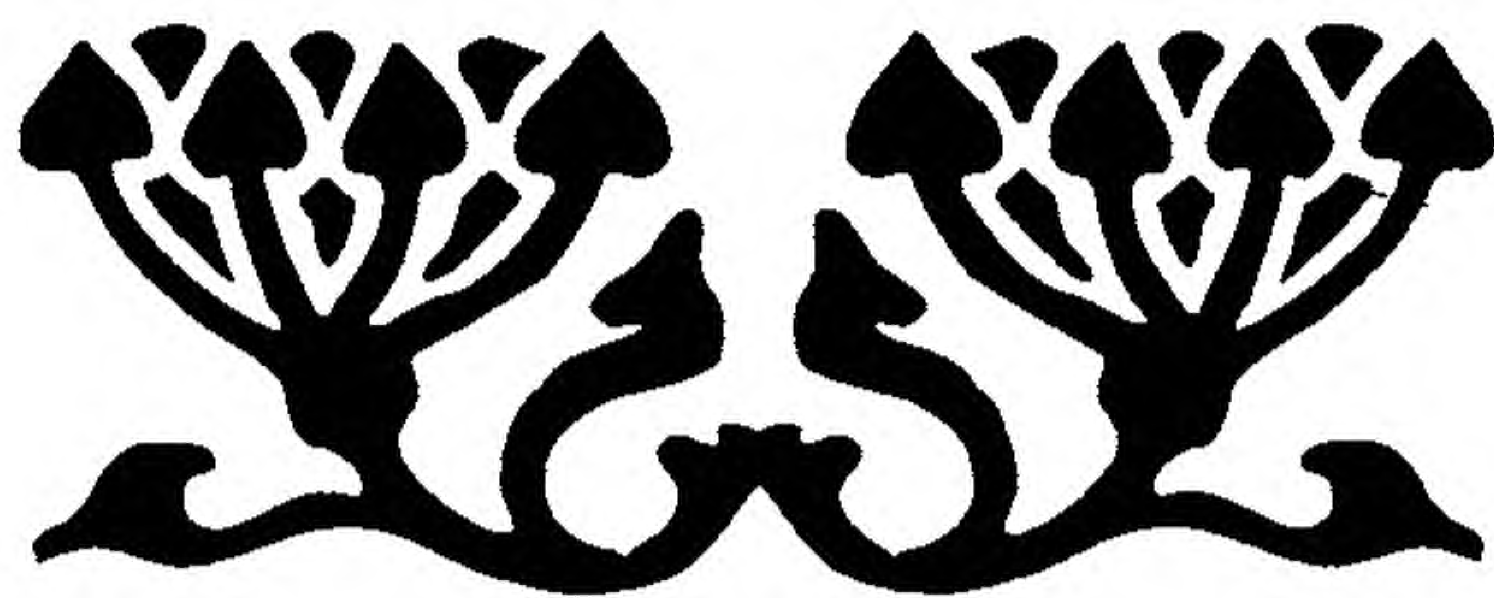
'উহুঁ। আমি চোখে দেখতে পাচ্ছি না ঠিক, কিন্তু নাকে গন্ধ পাচ্ছি। পোড়া পোড়া গন্ধ।' বাবা বললেন।

মা রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল, 'হ্যাঁ রে, রান্নাঘর থেকেই আসছে। দেখি কি পুড়ছে?'

মা রান্নাঘরে ঢুকে গেল। তারপর মায়ের গলা পাওয়া গেল, 'না। কিছুই তো পুড়ছে না।'

বাবা মাথা নাড়লেন, 'উহুঁ, আমি স্পষ্ট গন্ধ পাচ্ছি, কাগজ পোড়ার গন্ধ। দ্যাখো, নইলে ঘরবাড়ি পুড়বে।'

এই সময় টেলিফোন বাজল। অদিতি তাকাল। তারপর এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে বলল, 'হ্যালো!'



[আটাশ]

'অদিতি দেবী বলছেন?' টেলিফোনে পুরুষকণ্ঠ।

'হ্যাঁ।'

'নমস্কার। আমি রঙিন পর্দা কাগজ থেকে বলছি। সেদিন আপনার অভিনয় আমরা দেখেছি। আমাদের আন্তরিক অভিনন্দন গ্রহণ করুন।' ভদ্রলোকের গলায় তুমুল উচ্ছ্বাস।

অদিতি হাসল। এই অবস্থায় কি বলা উচিত ভেবে পাচ্ছিল না।

'ম্যাডাম, আমাদের কাগজে আপনার একটা এক্সক্লুসিভ ইন্টারভিউ ছাপতে চাই। এখন পর্যন্ত কোন নবাগতা অভিনেত্রীকে এই সম্মান দেখানো হয়নি। বলুন, কবে কখন গেলে আপনার সুবিধে হয়!'

অদিতি কিন্তু কিন্তু করল, 'আগে ছবিটা রিলিজ হোক— ।'

'ওটা নিয়ে ভাবছি না। আমার চোখ জহুরীর।'

'না। আমি আগে জনসাধারণের অভিমত জানতে চাই। আপনি কিছু মনে করবেন না। ছবি রিলিজ করার সাতদিন পরে ফোন করবেন। আচ্ছা, নমস্কার।' রিসিভার নামিয়ে রাখল অদিতি।

মা এগিয়ে এল, 'কি হয়েছে রে? কে ফোন করেছিল?'

'একজন রিপোর্টার।' অদিতি বলল।

'রিপোর্টার?' মা বুঝতে পারছিল না।

'ওহো, রিপোর্টার মানে বুঝতে পারছ না?' বাবা মাঝখান থেকে বলে উঠলেন, 'সাংবাদিক। খবরের কাগজে যারা লেখে। বিখ্যাত লোকদের ফোন করে তারা। তোমার মেয়ে বিখ্যাত হয়ে গেছে, বুঝলে?'

মা বলল, 'তাই? এই তো সেদিন তুই চাকরি করতে কলকাতায় এলি, এরই মধ্যে কি করে বিখ্যাত হয়ে গেলি খুকী?'

এই দুজনকে পেয়ে সময়টা মন্দ কাটছিল না। স্নান খাওয়া শেষ করে ওরা ঘুমোলেন। নিজের খাটটা ছেড়ে দিয়েছিল অদিতি। রান্নাও করেছিল। ঘুমন্ত দুটো মানুষের দিকে তাকিয়ে মনে হয়েছিল এত স্বস্তিতে ওরা অনেকদিন ঘুমোয়নি।

সন্ধ্যার মুখে সুলেখা ফিরল। ফিরে সে অবাক। পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আধঘণ্টা বাদে অদিতি দেখল মায়ের সঙ্গে চমৎকার ভাব হয়ে গেছে সুলেখার। সুলেখা একটা সাধারণ মেয়ে। অনিশ্চিতের ভেলায় ভাসছে। বিত্তহীন এই মেয়েটার সম্বল বলতে শুধু সারল্য যার কোন মূল্য এই সময়ে নেই। তাকেই খুব নিজের মানুষ বলে মনে হচ্ছে মায়ের। যে গলায় ওর সঙ্গে কথা বলছে সারাদিনে তার সঙ্গে বলেনি। তার ছবি দেওয়ালে দেখার পর থেকেই মায়ের ব্যবহারে আড়ষ্টতা

এসে গিয়েছে। বুঝতে অসুবিধে হচ্ছে না মা তাকে একটু সমীহ করছে।

ছবি রিলিজ করল। অ্যাডভান্স টিকিট কিনে এনেছিল সুলেখা। টিকিট নিয়ে এসে বলেছিল, 'কাউন্টার ফাঁকা। গেলেই টিকিট পাওয়া যাচ্ছে?' শুনে বুক ছ্যাঁত করে উঠেছিল অদিতির। সে কল্পনা করেছিল নামকরা নায়ক-নায়িকার হিন্দী ছবি কলকাতায় রিলিজ করতে যখন কাউন্টার খোলা হয় তখন প্রেক্ষাগৃহের সামনে যেমন বিশাল লাইন পড়ে, মারপিট হয় তেমন না হলেও কাছাকাছি ভিড় হবে। ক্রমশ অদিতির ভয় করতে লাগল। যদি লোক টিকিট না কাটে, যদি হল ফাঁকা যাচ্ছে বলে কদিন বাদেই ছবিটা তুলে নেওয়া হয়? এরকম তো কত ছবির ক্ষেত্রেই হয়ে থাকে। একদিন সামন্ত বলেছিল, 'বুঝলে দিদি, পোস্টারের আঠা না শুকোতেই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলে নতুন ছবির পোস্টার পড়ে। কোন্ ছবি হিট করবে তা শিবের বাবাও জানতে পারে না।'

এরকম হলে প্রথমেই প্রোডিউসার বলবেন ফ্ল্যাটটা ছেড়ে দিতে। কোথায় যাবে সে? কৃষ্ণনগরে? এই মা তখন কি বলবে? সেলসগার্লের চাকরিটা হয়তো চেষ্টা করলে ফিরে পাওয়া যাবে কিন্তু লোকে পেছন থেকে আঙুল তুলে দেখাবে, ওই দ্যাখ, ফিরিওয়ালিটা নায়িকা হয়ে গিয়েছিল।

অদিতির মনে হচ্ছিল মিলনকে ফোন করতে। সেটা সে করল যেদিন ছবিটা দেখানো শুরু হল সেদিন সকালে। মিলন বলল, 'গুডমর্নিং, অদিতি, আজ তোমার আমার সকলের ভাগ্য পরীক্ষা।'

'টিকিট বিক্রি হয়েছে?'

'হচ্ছে ধীরে ধীরে। মনে হচ্ছে ম্যাটিনিটা ফুল হয়ে যাবে।'

'ইভনিং?'

'অর্ধেক হয়েছে। সাধারণত ম্যাটিনির দর্শকদের রিঅ্যাকশন থেকে ইভনিং-এর টিকিট বিক্রি হয়। আমার ছবিতে তো স্টার নেই যে প্রথম থেকেই হাউসফুল বোর্ড ঝুলবে। অবশ্য উত্তমকুমার চলে যাওয়ার পর পশ্চিমবাংলায় আর স্টার কোথায়। হল্এ যাবে?'

'আমার খুব ভয় করছে মিলনদা!'

'দূর। যা হওয়ার হবে। আমরা পরিশ্রম করেছি, ফাঁকি দিইনি। এরপর ভাগ্যে যদি মন্দ লেখা থাকে তো কি করতে পারি।' মিলন হাসল, 'মনে সাহস আনো, বুঝলে!'

মিলনদা তো বলল সাহস আনতে কিন্তু সাহস যে আসতেই চাইছিল না। বাবাকে তার জিম্মায় রেখে মা সুলেখার সঙ্গে দুপুরে বেরিয়ে গেল সিনেমা দেখতে। বাবা ঘুমিয়ে পড়লেন নিশ্চিন্তে। কিন্তু এক জায়গায় বসে থাকতে পারছিল না অদিতি। শুতে গিয়ে মনে হচ্ছিল নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাবে। বুকের মধ্যে ভয় ঘাপটি মেরে বসে আছে। চারটে নাগাদ সে ব্যালকনিতে এসে দাঁড়াতেই চমকে উঠল।

হোর্ডিং-এর যে পোস্টার এতদিন ছিল তার এক পাশের আঠা খুলে গেছে। তার মুখের খানিকটা বাতাসে উড়ছে।

ঠোঁট কামড়ালো অদিতি। ছবি শুরু হতে না হতেই পোস্টার ছিঁড়ে ফেলছে বাতাস! তার ভাগ্যে যা লেখা রয়েছে সেটা কি আগাম জানিয়ে দিচ্ছে কেউ! অদিতির মনে হচ্ছিল দৌড়ে নিচে নেমে আবার নতুন করে আঠা লাগিয়ে ছবিটাকে ঠিকঠাক করে দিতে। কিন্তু অত ওপরে সে উঠবে কি করে?

ছটা দশে বেল বাজল। বাবা তখনও ঘুমোচ্ছেন। সেই চারটে থেকে একটা চেয়ারে ঠায় বসেছিল অদিতি। বেল বাজলেও দরজা খুলতে যেন শক্তি পাচ্ছিল না। দ্বিতীয়বার ঘণ্টার শব্দ হতে কোনমতে উঠল।

দরজা খুলতেই সামনে মা, পেছনে সুলেখা চিৎকার করে উঠল, মা তাকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে ঢুকে পড়ল ঘরে। 'কী ভাল লাগল রে খুকী। তোকে যে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল! তুই যখন দুঃখ পেয়ে কেঁদে উঠলি তখন আমাদের আশপাশের সবাই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছিল।'

সুলেখা বলল, 'আর তুমি? তুমি কি করছিলে মাসীমা?'

মা বলল, 'যাই বলিস, তোকে দেখতে দেখতে মনেই হচ্ছিল না যে তুই আমার পেটে জন্মেছিস, আমি তোর মা!'

'এ আবার কি রকম কথা!' ভেতর থেকে শব্দগুলো বেরিয়ে এল।

'হ্যাঁরে। একেবারে স্বপ্ন স্বপ্ন মনে হচ্ছিল।' মা হাসল।

সুলেখা বলল, 'আমি ভাবতে পারিনি দিদি তুমি এত ভাল অভিনয় করতে পার। তুমি যখন গান গাইছিলে তখন মাসীমা ফিস্‌ফিস্ করে জিজ্ঞাসা করল তুমি নিজে এত ভাল কি করে গাইতে শিখলে? আমি যত বলি এটা প্লেব্যাক মাসীমা কিছুতেই বিশ্বাস করে না। তাহলে বোঝ!'

'লোক হয়েছিল?' কাঁপা গলায় জিজ্ঞাসা করল অদিতি।

'হয়েছিল তবে অনেক সিট খালি ছিল!'

'ও।' গলা শুকিয়ে গেল অদিতির।

'তারপর যখন শো ভাঙল, সবাই প্রশংসা করতে করতে বের হচ্ছিল তখন দেখলাম ইভনিং-শো হাউসফুল হয়ে গেছে। বোর্ড ঝুলিয়ে দিয়েছে।' সুলেখার কথা শেষ হতে না হতেই ফোন বাজল। সুলেখাই ছুটে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো। হ্যাঁ। কে বলছেন? হ্যাঁ, ধরুন।' রিসিভার পাশে রেখে সুলেখা বলল, 'দিদি তোমার ফোন।'

'কে?'

'প্রোডিউসার!'

তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল অদিতি, 'হ্যালো।'

'অদিতি! আমার আন্তরিক অভিনন্দন নাও। ম্যাটিনি শো-এর যে রিপোর্ট আমি পেয়েছি তাতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে দর্শকরা তোমাকে খুব ভালভাবে নিয়েছে।'

'আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' গলা বন্ধ হয়ে আসছিল অদিতির।

'না না, আমি নয়, মিলনের কাছে তোমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত।'

'মিলনদা তো নিশ্চয়ই কিন্তু আপনি যদি নতুন নায়িকা না চাইতেন তাহলে তো আমি সুযোগ পেতাম না।'

'ওসব কথা বাদ দাও। কথায় বলে সকাল দেখে দিনটাকে আন্দাজ করা যায়। আবার সবসময় কথাটা যে সত্যি হয় তাও না। তবু আজকের রিপোর্ট দেখে আশা করছি ছবিটা খুব ভাল চলবে। সাধারণত বাংলা ছবি এখন নাইট শো-তে হাউসফুল হয় না। আজ একটু আগে সেটা হয়ে গেল।' প্রোডিউসারের গলায় বেশ উচ্ছ্বাস।

অদিতি বলল, 'এখন আমি কি করব?'

'কি করবে মানে? এখন দেখবে পরিচালক প্রোডিউসাররা তোমার কাছে শুধু ছবির অফার নিয়ে যাচ্ছে। আমার কথা যদি শোন তাহলে বলব, ভাল করে চিত্রনাট্য শোনার পর ঠিক করবে অভিনয় করবে কি না। টাকার জন্যে গাদাগাদা ছবি হাতে নিলে তোমার আখেরে ক্ষতি হবে।'

'আমি এই ফ্ল্যাটের কথা বলছিলাম।'

'ফ্ল্যাট?'

'আপনি বলেছিলেন ছবি রিলিজ না হওয়া পর্যন্ত আমি এখানে থাকতে পারি।'

'ও হ্যাঁ। তা তো বটেই। তোমার পাশের ফ্ল্যাটের ভাড়া মাসে পাঁচহাজার টাকা। এ পর্যন্ত তোমাকে থাকার জন্যে কোন ভাড়া দিতে হবে না। এখন থেকে ওই টাকা আমাকে ভাড়া হিসেবে দেবে। এখন বিনা পয়সায় থাকতে তোমারই আত্মসম্মানে লাগবে। ঠিক আছে?'

'পাঁচ হাজার? এতটাকা আমি কিভাবে দেব?'

প্রোডিউসার শব্দ করে হাসলেন, 'এই কথাটা তুমি সাতদিন বাদে আর বলবে না। বেশ, আমি প্রতিবছর একটি করে ছবি করেছি, করব। আমার ছবিতে তুমি বড়জোর কুড়িদিন শ্যুটিং করবে। তার পারিশ্রমিক বাবদ তুমি এখন সহজেই ষাট হাজার টাকা চাইতে পারো। অর্থাৎ একবছরের ভাড়াটা আমার ছবি থেকে তুমি রোজগার করবে। টাকাটা হাতে না নিয়ে তুমি ভাড়ার সঙ্গে না হয় অ্যাডজাস্ট করবে। তোমার সমস্যার সমাধান হয়ে গেল, তাই না?'

'আপনি আমার জন্যে এতটা করছেন!'

'দূর, ছবি ফ্লপ হলে অথবা তোমার অভিনয় লোকের খারাপ লাগলে নিশ্চয়ই এসব কথা বলতাম না। ঠিক আছে ভাই, রাখছি!'

'মিলনদার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

'হ্যাঁ। একটু আগে বেরিয়ে গেল। এই ছবি সুপারহিট হলে মিলনের কপালও খুলে যাবে। হোক, সবার ভাল হোক।'

'আপনাকে একটা কথা বলব।'

'কি কথা?'

'আমার ফ্ল্যাটের উল্টোদিকের রাস্তায় একটা হোর্ডিং-এ সিনেমার বিজ্ঞাপনটা এতদিন ভাল সাঁটা ছিল, ওটা খুলে গিয়ে বিশ্রীভাবে উড়ছে।'

'তো?'

'ওটাকে ঠিকঠাক লাগিয়ে দেওয়া যায় না?'

হা-হা করে হাসলেন প্রোডিউসার, 'যা ছিঁড়ে গেছে তাকে নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছ কেন? নতুন পোস্টার ছাপতে দিলাম একটু আগে। প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন পোস্টার পড়বে। তুমি চিন্তা করো না।'

ফোনটা নামিয়ে রাখা মাত্র বেল বাজল। সুলেখা এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতেই শোনা গেল, 'ম্যাডাম বাড়িতে আছেন?'

'ম্যাডাম?' সুলেখা অবাক।

'অদিতি দেবী!'

'আপনি?'

'আমি কমল সেন। ফিল্ম ডিরেক্টার।'

সুলেখা তাকাল অদিতির দিকে। অদিতি মাথা নাড়তেই সুলেখা ভদ্রলোককে ঢুকতে দিল। ঘরে ঢুকেই কমল নমস্কার করল হাত জোড় করে, 'নমস্কার ম্যাডাম, আপনার ছবি দেখেই এখানে ছুটে এসেছি। আমার ছবি শুরু হচ্ছে আগামী সপ্তাহে। তাতে নায়িকার চরিত্রে আপনাকে অভিনয় করতে হবে।'

'আগামী সপ্তাহে শুরু যখন তখন কাউকে ঠিক করেননি?'

'করেছিলাম। কিন্তু আপনার অভিনয় দেখার পর তাকে আর নিতে চাই না।'

'সেকি! আপনি কি করে ভাবলেন আর একজনকে সরিয়ে আমি আপনার ছবিতে কাজ করব? আপনি তার অনুমতি নিয়ে এসে আমার সঙ্গে কথা বলবেন।' বলার সময় অদিতির গলার স্বর তার নিজের কাছেই অচেনা ঠেকল।



[ঊনত্রিশ]

পৃথিবীর চেহারা রাতারাতি বদলে গেল যেন। নতুন অভিনেত্রী হিসেবে যারা তাকে এতদিন অবজ্ঞার চোখে দেখত তারাই এখন সমীহ করতে লাগল। গত সাত দিনে আটটা ছবির অফার পেয়েছে অদিতি। দুজন ছাড়া বাকি সবাইকে বলেছে, 'আমাকে স্ক্রিপ্ট দিয়ে যান, ভাল লাগলে নিশ্চয়ই কাজ করব। সবাই স্ক্রিপ্ট দিতে পারেনি। একজনই দিয়েছিল সেটা পড়ে খুব বিনয়ের সঙ্গে ফিরিয়ে দিয়ে অদিতি বলেছিল, 'এই চরিত্রে অভিনয় করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।'

যে দুজনের কাছে স্ক্রিপ্ট চায়নি তাঁরা প্রথিতযশা চিত্রপরিচালক। সে এক কথায় তাঁদের ছবিতে কাজ করতে রাজি হয়েছে। টাকা-পয়সার কথা এই চিত্র পরিচালকরা বলেন না, ওঁদের হয়ে বলতে আসেন প্রোডাকশন ম্যানেজার। অদিতি শুনেছিল, এই বিখ্যাত চিত্রপরিচালকরা অভিনেতা-অভিনেত্রীদের পারিশ্রমিক নিয়ে উদারতা দেখান না। তাঁদের ছবিতে কাজের সুযোগ পেয়ে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা টাকা-কড়ি নিয়ে বেশি কথাও বলেন না। প্রথম যে প্রোডাকশন ম্যানেজার এসেছিলেন তিনি বললেন, 'আপনার দশ দিনের কাজ। দুই ক্ষেপে ডেটগুলো দিতে হবে। বুঝতেই পারছেন দাদার মত ভারত-বিখ্যাত পরিচালকের ছবিতে কাজ করলে আপনার মর্যাদা বেড়ে যাবে। তাই টাকাকড়ির ব্যাপারটা ঠিক করে ফেলুন।'

'ঠিক তো আপনারা করবেন।'

'আপনি প্রথম ছবিতে কত পেয়েছেন?'

'ষাট হাজার টাকা।'

'অ্যাঁ? কি বলছেন?'

'ঠিকই। হিসেব করলে আরও বেশি। যেহেতু দ্বিতীয় ছবিতেও এই টাকা পেয়েছি তাই আপনারা ষাট হাজার টাকা দিলে আমার অসুবিধে নেই!'

'দ্বিতীয় ছবি? কার ছবি?'

'আমার প্রথম ছবির প্রোডিউসারই ছবিটা করছেন!'

'অ। কিন্তু আমরা তো এত টাকা দিতে পারব না। আপনি হয়তো জানেন না, ওঁর ছবিতে উত্তমকুমারও অত টাকা পাননি।'

'দেখুন, এই বিষয়ে বেশি কথা বললে তিক্ততা এসে যাবে। থাক না।'

'আপনি প্রথম ছবি হিট করছে বলে যা তা চাইতে পারেন না।'

প্রোডাকশন ম্যানেজারকে বেশ উত্তেজিত দেখাল। লোকটি দীর্ঘকাল এই লাইনে রয়েছে।

'উত্তমকুমার মারা গিয়েছেন অনেক বছর আগে। তখন তাঁর নায়িকারা কি রকম টাকা পেতেন তা দয়া করে জানাবেন?'

'কত আর! বড় জোর পনেরো হাজার।'

'তাহলে তো ষাট হাজার ঠিকই আছে। এতগুলো বছরে সব জিনিসের দাম অন্তত পাঁচগুণ বেড়ে গেছে। আপনি তখন যা মাইনে পেতেন এখন তার পাঁচগুণ পান, পান না?' হেসেছিল অদিতি।

প্রোডাকশন ম্যানেজার ফিরে গিয়েছিল বিরক্ত হয়ে। কিন্তু সেই সন্ধ্যেবেলায় স্বয়ং চিত্রপরিচালক ফোন করল, 'আমি সব শুনলাম। আপনি যা চেয়েছেন তাই পাবেন। আগামী রবিবার সকালে আমার বাড়িতে স্ক্রিপ্ট পড়ব। গাড়ি যাবে, চলে আসবেন।'

একটু মাস্টার মাস্টার ভাব, কিন্তু ওর বয়স আর কাজের কথা ভেবে সেটাকে আমল দিল না অদিতি।

মা হতভম্ব। বাবার দিকে তাকিয়ে বলল, 'শোন শোন, মাত্র দশদিন কাজ করলেই খুকী ষাট হাজার টাকা পাবে।'

বাবা বললেন, 'ষা-ট হা-জা-র?'

'হ্যাঁ। তুমি ভাবতে পেরেছ কখনও?'

'স্বপ্নেও পারিনি।'

'হ্যাঁরে খুকী, এরকম কাজ তুই বছরে কবার করবি?'

'জানি না মা। হয়তো চার-পাঁচবার!

'পাঁচবার? তার মানে তিনলক্ষ টাকা! তুই তো বড়লোক হয়ে যাবি।'

'মা, ষাট হাজার এমন কিছু বেশি নয়। এই ফ্লাটের ভাড়া বছরে ষাট হাজার। এখানে অনেক নায়িকা আছেন যাঁরা একটা ছবিতে কাজ করে এক দেড় লাখ টাকা পান। বোম্বের হিন্দী ছবির নায়িকারা পায় এক কোটি। বুঝলে?'

'এক কোটি?' মায়ের চোখ বড় হয়ে গেল।

'হ্যাঁ, ওদের তুলনায় আমরা তো কিছুই পাই না।'

'তুই হিন্দী ছবিতে অভিনয় কর্ খুকী!'

'দূর। আমি হিন্দী বলতে পারি না। আমাকে নেবে কেন?'

বাবা বললেন, 'শিখে ফেললেই তো হয়। যাক গে, আমরা আগামীকালই কৃষ্ণনগরে ফিরে যাচ্ছি। সবকিছু গুছিয়ে এখানে আসতে দিন দশেক সময় লাগবে, বুঝলে? খোকাকেও জানাতে হবে।'

মা বলল, 'তা তো হবেই। এখন আর কৃষ্ণনগরে পড়ে থেকে লাভ কি! না এলে লোকে বলবে বড়লোক মেয়ে আপনাদের কি নেয় না? আর আমরা থাকলে ওর তো খুব সুবিধে হবে।'

বাবা বললেন, 'এখন টাকা রোজগার করছ, কিন্তু যত্নে রেখো, বুঝলে?'

মা বলল, 'ওকি টাকাকড়ি কখনও রোজগার করেছে যে বুঝতে পারবে কি করা উচিত। আর এক আধটা টাকা নয়, হাজার হাজার। তুমি এসে হাল না ধরলে হবে না।'

অদিতি সরে এল বারান্দায়। সুলেখা এসে পাশে দাঁড়াল, 'দিদি!'

'বল!'

'আমি কি করব?'

'মানে?'

'ওঁরা যদি এখানে এসে থাকেন।'

'তোর কি! যেমন ছিলি থাকবি!'

'মেশোমশাই মাসীমাকে বলেছেন ঠিকে লোক রাখলেই ভাল হয়, রাত দিনের লোক রাখলে বেশি খরচ হবে।'

'তুই আমার রাত দিনের লোক নাকি?' অবাক হল অদিতি।

সুলেখা মাথা নিচু করল। অদিতি বুঝতে পারল সে কাঁদছে।

'তুই একটা কাজ করতে পারবি?'

সুলেখা মুখ তুলল না।

'কাজের চাপ বাড়লে আমার পক্ষে সব সামলানো তো সম্ভব হবে না। কাল সামন্তদা এসে বলে গেল একজন সেক্রেটারি রাখতে। তুই করবি?'

'আমি?'

'হ্যাঁ। তার জন্যে মাইনে পাবি।'

'যাঃ!' সুলেখার মুখে হাসি দেখা গেল।

'এখন যা বাইরে পাস তার চেয়ে বেশি পাবি।'

'কি করতে হবে?'

'যারা আমার সঙ্গে কথা বলতে আসবে তাদের সঙ্গে তুই কথা বলবি। আমি যদি ছবিতে কাজ করতে রাজি হই তুই টাকা-পয়সার কথা বলবি। আমার কবে কোন্ ছবির শ্যুটিং তা খেয়াল রাখবি। আর যে কোন টেলিফোন এ বাড়িতে আসবে তা তুই ধরবি, প্রয়োজন হলে আমাকে দিবি।'

'এ তো এমন কঠিন কাজ নয়। আমি পারব।' সুলেখা হাসল।

পরদিন মা-বাবা কৃষ্ণনগর যাওয়ার জন্যে তৈরি। সুলেখা ওদের সঙ্গে নিচে নেমে ট্যাক্সি ধরে দেবে। যাওয়ার আগে মা বলল, 'তুই কোন দুশ্চিন্তা করিস না। আমরা দিন সাতেকের মধ্যেই চলে আসব পাট চুকিয়ে।'

'পাট চুকিয়ে দিও না।' অদিতি গম্ভীর গলায় বলল।

'কেন?'

'আমার তো পুরোটাই অনিশ্চিত। আজ কাজ আছে কাল নেই। একটা ছবি যদি ফ্লপ করে তাহলে কেউ আর কাজ দেবে না।'

'সেকি?' মা অবাক।

'হ্যাঁ।'

'তাহলে এই যে এতগুলো কাজ এক সঙ্গে পাচ্ছিস?'

'সব কাজ তো আমি নিচ্ছি না।'

'কেন নিচ্ছিস না তা বাবা বুঝতে পারছি না। অত টাকা দেবে।'

'তুমি বুঝবে না।'

'তাহলে আমরা কি আসব না?'

'আমি কি নিষেধ করেছি? এসো, তবে পাট চুকিয়ে এসো না।'

মা বলল, 'আমার মনে হয় তোর এখানে একজন ব্যাটাছেলের থাকা দরকার। মেয়েমানুষের পক্ষে সব কি বোঝা সম্ভব।'

'কেন? আজকাল মেয়ে ছেলেতে ফারাক আছে নাকি?'

'আছে! কমলেন্দু যোগাযোগ করে?'

'হঠাৎ তার কথা?'

'না, এক সময় খারাপ ব্যবহার করেছিল, ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে ঠিকই কিন্তু শুনেছি সে আর বিয়ে করেনি। মাঝেমাঝে আমাদের বাড়িতে এসে নিজের ব্যবহারের জন্যে আফসোস করেছে। তাই বললাম।'

'না। সে আমার কাছে মৃত।'

'কি জানি, তোদের কথা আমি বুঝতে পারি না। তা কমলেন্দু না হয় গেল, ডিভোর্সের পরও তো অনেক মেয়ে বিয়ে করে, তুই করছিস না কেন?'

'মা, আমার এত চিন্তা যে সাধ করে আর কারও গোয়ালে ঢোকার বাসনা নেই। আমি যখন কলকাতায় সেলসগার্লের চাকরি নিয়ে এলাম তখন তো তোমরা এত চিন্তা করোনি। তখন তো কোন পুরুষ মানুষের কথা ভাবোনি।'

'তখন তোর টাকা ছিল না। একে মেয়েমানুষ তার উপর টাকা আছে, জাহান্নামে যেতে তো অসুবিধে নেই। তাই একজন অভিভাবক দরকার হয়।'

বাবা চুপচাপ শুনছিলেন। বললেন, 'ও বোধহয় তোমার কথা পছন্দ করছে না। চল, আর দেরি করো না।'

ওরা চলে গেল। হঠাৎ খুব কান্না পেয়ে গেল অদিতির। দু'হাতে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে কাঁদল খানিকক্ষণ। তারপর চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। কমলেন্দু যে মায়ের কাছে যায় তা মা এর আগে কখনও বলেনি।

পুরুষ মানুষের শরীরে একবার স্বামী-ছাপ পড়ে গেলে তা এক জীবনে তোলা যায় না, এই বিশ্বাস বাঙালী মেয়েরা আর কতদিন বয়ে বেড়াবে?

পরপর পাঁচটা ছবিতে সই করল অদিতি। শেষ ছবিটা পঁচাত্তর হাজার টাকায়। কলকাতায় চার সপ্তাহ হয়ে গেল, এখনও মিলনের ছবি হাউসফুল যাচ্ছে, কাগজগুলো তার প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিভিন্ন সিনেমা পত্রিকায় তার রঙিন ছবি বেরিয়েছে, ইন্টারভিউ ছাপা হয়েছে। একটি কাগজ লিখেছে, বাংলা ছবি অনেকদিন পরে নায়িকা পেল।

এখন সপ্তাহে পাঁচ দিন স্যুটিং। সকালে গাড়ি আসে। অনেক কিছু কিনতে হয়েছে অদিতিকে। মেকআপ বক্স, জলের ফ্ল্যাক্স, টিফিন ক্যারিয়ার। সঙ্গে সুলেখা

থাকে। স্টুডিওতে এখন তার জন্যে আলাদা মেকআপ রুম। সবাই তাকে ম্যাডাম বলে সম্বোধন করে। সেখানে কেউ দেখা করতে এলে আগে সুলেখার সঙ্গে কথা বলতে হয়। সুলেখাও ক্রমশ চৌকস হয়ে উঠেছে।

এক রবিবারে মিলন এল বাড়িতে। সুলেখা তাকে দেখে মন পাল্টে দ্রুত অদিতিকে ডেকে দিল। অন্য পরিচালকের সঙ্গে সে আগে কথা বলে।

মিলন বলল, 'অদিতি, ছবিটা যে এত ভাল ব্যবসা করবে তা ভাবিনি। মফস্বলেও হাউসফুল বোর্ড নামছে না। কিন্তু সমস্যায় পড়ে গেছি।'

'কি সমস্যা মিলনদা!'

'প্রেডিউসার পরের ছবি শুরু করতে তাগাদা দিচ্ছেন। আমি তো যা-তা গল্প নিয়ে ছবি করতে পারি না। যে গল্প বলেছি তাতে তোমার করার মত কোন চরিত্র নেই। পুরুষপ্রধান কাহিনী।'

'তাহলে?'

'হ্যাঁ। প্রোডিউসারের প্রবল আপত্তি এখানেই। উনি তোমাকে ছাড়া ছবি করতে চাইছেন না। তুমি আমাকে একটু সাহায্য করো।'

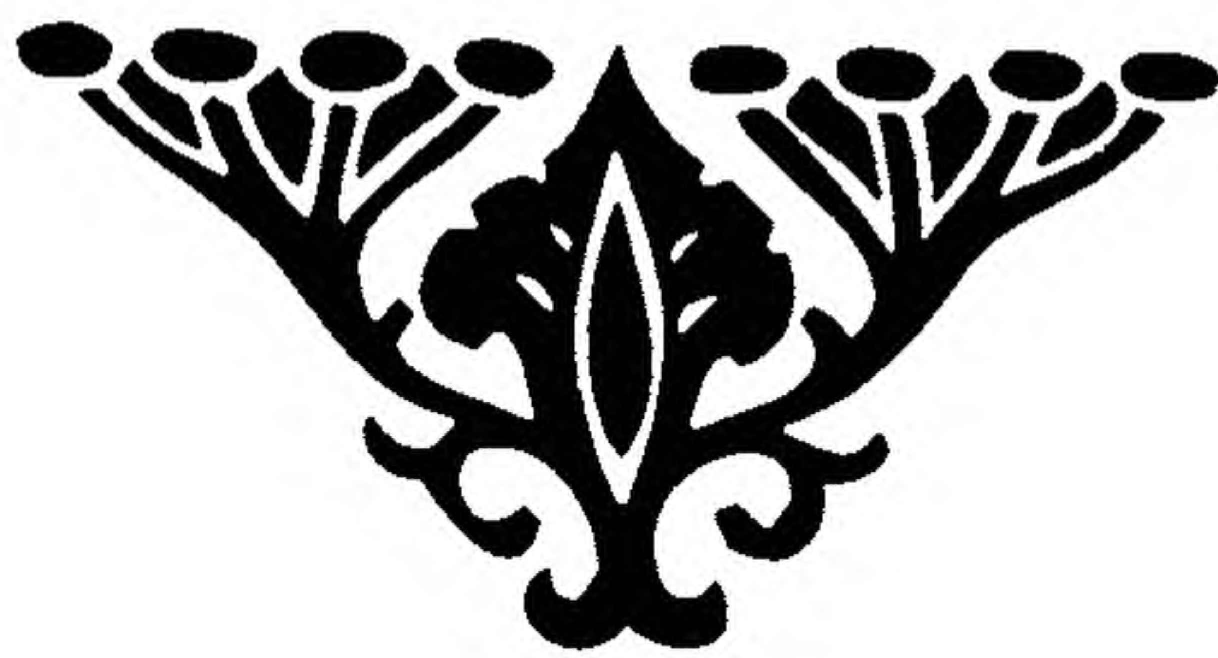
'কি করব বলুন?'

'ওকে ফোন করে বোঝাও, ভাল ছবির স্বার্থে এই গল্পটাই করা উচিত। তুমি বললে উনি রাজি হয়ে যাবেন।'

'কিন্তু উনি বলেছেন পরের ছবির পারিশ্রমিকের সঙ্গে এই ফ্ল্যাটের ভাড়া অ্যাডজাস্ট করবেন।' অদিতি ফাঁপরে পড়ল।

'তোমার হাতে এখন প্রচুর ছবি, তা থেকেই তো ভাড়া মিটিয়ে দিতে পারো। আমি তোমার কাছে এই অনুরোধটা করছি।' মিলন বলল।

অদিতি উঠল। টেলিফোনের ডায়াল ঘোরাল। মিলনের কাছে তার যে ঋণ তা তো শোধ করা যাবে না তবু—!'



[ত্রিশ]

প্রোডিউসার বাড়িতেই ছিলেন। অদিতির গলা শুনে বেশ উৎফুল্ল হলেন, 'আরে! কি খবর? কোন প্রব্লেম থাকলে বলতে পার। তোমার জন্যে আমি এখন সব কিছু করতে পারি। হেঁ হেঁ হেঁ।'

এই গলায় ভদ্রলোককে কখনও কথা বলতে শোনেনি অদিতি। সে হাসল, 'আমার কোন প্রব্লেম নয়। আমার জন্যে ঐ তো আপনি অনেক করেছেন।'

'কোথায়? না না, কিছুই করিনি।'

'বাঃ। কলকাতায় এত ভাল ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিলেন এক পয়সা না নিয়ে, এটা কম উপকার হল? তারপর ম্যাড্রাসে মায়ের কাছে টাকা পৌঁছে দিয়েছেন। সেই টাকা—।'

শেষ করতে দিলেন না প্রোডিউসার অদিতিকে । বললেন, 'কি ব্যাপার হে? আজ সকালে তোমার কি হল?'

'যে-জন্যে ফোন করেছি, 'অদিতি বলল, 'মিলনদা এখানে এসেছেন।' দূরে বসা মিলন হাত তুলে হতাশ ভঙ্গী করল। বোঝা গেল সে যে এসেছে এটা প্রোডিউসারকে জানাতে চায়নি।

'মিলন? অ। দ্যাখো, সাফল্য যে অনেকের মাথা খারাপ করে দেয় তার প্রমাণ হল তোমার মিলনদা।'

'কি রকম?'

'ওর মধ্যে ক্ষমতা আছে, দেখার চোখ আছে। এই ছবিটি দারুণ করেছে, এসবই ঠিক। কিন্তু ওর মাথার মধ্যে প্যারালাল ফিল্মের পোকা মাঝেমাঝেই ছট্‌ফট্ করে। আমি ওকে নেক্সট্ ছবি শুরু করতে বলেছিলাম। ও যে গল্প সিলেক্ট করেছে সেটা নাকি পুরুষপ্রধান। উত্তমকুমার মারা যাওয়ার পর কাকে নিয়ে পুরুষপ্রধান ছবি বানাবে ও? আরে, বাংলা ছবির দর্শক কারা? রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা আর বাড়ির কাজের লোকজন। তারা একজন গ্ল্যামারহীন পুরুষকে আড়াই ঘণ্টা ধরে পর্দায় দেখতে চাইবে? তাছাড়া দর্শক পুরুষ বা মেয়ে যাই হোক না কেন সিনেমায় মেয়েদের গল্প দেখতে চায়। তোমাকে মানাবে এমন কোন চরিত্র নাকি ওই গল্পে নেই। আমি স্পষ্ট বলে দিয়েছি অদিতিকে বাদ দিয়ে আমি কোন ছবি প্রোডিউস করব না।'

'কিন্তু গল্পটা যদি সত্যি ভাল হয় তাহলে তো ছবি সুপারহিট হতে পারে। আমি অবশ্য গল্পটা শুনিনি কিন্তু মিলনদা কখনই ছেলেমানুষি করতে পারেন না।'

'করছেন। একজন বয়স্ক পুরুষ নায়ক, নায়িকা কে হবে?'

হঠাৎ মুখটা মনে পড়ে গেল অদিতির। সে হাসল, 'সুতপা দত্ত।'

'পাগল!'

'কেন?'

'তুমি বয়সে আমার চেয়ে অনেক ছোট। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই না। আমি জানি সুতপা মিলনকে তার বাড়িতে ডেকে নিয়ে গিয়ে খুব করে অনুরোধ করেছে। কিন্তু আমার টাকায় মিলন সেই অনুরোধ রাখবে এটা আমি বরদাস্ত করব না। আমি অনেক ঠকে শিখেছি, ঘনিষ্ঠতা আর ব্যবসা গুলিয়ে ফেললে সর্বনাশ হয়ে যায়। আচ্ছা আমি একটা প্রশ্ন করছি। বাংলা সাহিত্যে কি এই গল্প ছাড়া আর অন্য কোন গল্প নেই? ধরা যাক, এই ছবিটা মিলনকে করতে দেওয়া হল। এর পরে কি সে আর ছবি করবে না? করলে সেই ছবির গল্পটা কি হবে? উত্তরটা তাকে বলো আমার অফিসে এসে দিয়ে যেতে।' প্রোডিউসার রিসিভার রেখে দিলেন।

অদিতি মিলনের কাছে এসে বলল, 'উনি রাজি হলেন না। জিজ্ঞাসা করলেন, এর পরে আপনি যে ছবি করবেন তার গল্প কি?'

'সে ছবি নিয়ে তো আমি কিছুই ভাবিনি।' মিলন হতভম্ব।

'আরও জিজ্ঞাসা করলেন, একটি গল্পে আপনি আটকে আছেন কেন? বাংলা সাহিত্যে কি আর কোন গল্প নেই?'

'থাকবে না কেন? কিন্তু এই গল্পটা আমাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করেছে।'

'আপনি তো এখন হিট ছবির পরিচালক। অন্য প্রোডিউসাররা নিশ্চয়ই আপনার কাছে আসা যাওয়া করছেন। তাদের বলুন—!'

'বলেছি। যারা আগে স্টুডিওতে আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিত তারা এখন বাড়িতে লাইন দিচ্ছে।'

'বাঃ। তাহলে তো সমস্যার সমাধান হয়েই গেল।' অদিতি খুশী।

'না। আমি এখন খবরের কাগজের লাইন তুলে গল্প বানালেও তাদের কোন আপত্তি নেই শুধু একটাই শর্ত তোমাকে নায়িকার চরিত্রে রাখতে হবে। বোঝ! তোমাকে সুযোগ দিয়ে আমার এই উপকারটা হয়েছে।' মিলনদার মুখে এখন রাজ্যের হতাশা।

'আমি তো আপনার হয়ে বললাম। এমন কি সুতপা দত্তের নাম পর্যন্ত প্রস্তাব করলাম আপনার অনুমতি না নিয়েই।' অদিতি বলল।

'কি করা যায়।' বিড়বিড় করল মিলন।

'একটা কথা, অন্য কোন গল্পের কথা ভাবতে পারছেন না কেন?'

'ভাবতে চাই না বলে। আমার বদলে সত্যজিৎ রায় হলে এরা কেউ বলতে পারতেন গল্প বদলাতে?' রেগে গেল মিলন।

আর এই প্রথম খুব খারাপ লাগল অদিতির। মনে হল প্রোডিউসারের কথাটা তাহলে ভুল নয়। সাফল্য মিলনকে আলোড়িত করেছে প্রবলভাবে। তাই নিজেকে সত্যজিতের কাছাকাছি ভাবতে পারছে।

মিলন উঠল, 'চলি।

খেয়াল হল অদিতির, 'আরে যাবেন কি? চা খেয়ে যান।'

'না অদিতি, আজ থাক।'

অদিতি উঠে দাঁড়াল, 'মিলনদা, আপনাকে একটা কথা বলব?

'বল।'

'আপনি আমাকে এই লাইনে এনেছেন। সারাজীবন আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। আমার একটা অনুরোধ রাখবেন?'

মিলন তাকাল। মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করল না।

'এই গল্পটা না হয় সামনের বছরের জন্যে রাখুন। এখন না হয় এমন কোন গল্প নিয়ে ছবি করুন যাতে আমিও আপনার সঙ্গে যুক্ত হতে পারি।'

অদিতির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত হাসল মিলন। তারপর দরজা খুলে বেরিয়ে গেল।

কাজের চাপ অত্যন্ত বেড়ে গেল। সুলেখা অবশ্য বেশ চেষ্টা করছে সবদিক সামলে নিতে। একদিন সে বাড়ি ফিরে হেসে গড়াগড়ি। অদিতি অবাক হল, 'কি হল তোর?'

'আজ একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটেছে।'

'কি রকম?'

'কমল সেন ওঁর ছবির জন্যে তোমার ডেট চাইছিলেন। আমি যত বলি দিদি দু'মাসের আগে খালি নেই, উনি কিছুতেই শুনবেন না। ওঁর ছবির শ্যুটিং এ মাসের শেষের দিকে। তখন তোমাকে অন্তত তিন দিনের জন্যে চাই। আজও এসেছিলেন। তুমি তখন শ্যুটিং করছ। আমি ওঁকে ডায়েরি খুলে দেখিয়ে দিলাম। কোন দিন খালি নেই। তখন কি বললেন জানো?'

অদিতি তাকাল।

'তখন বললেন, সুলেখা, তোমাকে হাজার খানেক টাকা দিচ্ছি, যে করেই হোক তিনটি দিন বের করে দাও।'

'সেকি?'

'হ্যাঁ গো।'

'বের করে দিয়েছিস?'

'দূর। ওই তিনটি দিনে বলাই মিত্রের ছবির শ্যুটিং আছে।'

'তাহলে এখন তোর খুব ইম্পর্টেন্স বেড়েছে, বল?'

'যা কিছু হয়েছে সব তোমার জন্যে।'

'খুব টায়ার্ড লাগছে। স্নান করে ফেলি, তুই চায়ের জল বসা।'

অদিতি উঠতেই টেলিফোন বাজল। সুলেখা এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে হ্যালো বলল। তারপর ওপারের বক্তব্য শোনার পর বলল, 'এক ভদ্রলোক তোমাকে

চাইছেন। খুব মার্জিত গলা।'

'কি নাম?'

'জয়ন্ত সেন?'

'কে জয়ন্ত সেন?' প্রশ্নটা করেই আচমকা মনে পড়ে গেল। তারপর মাথা নেড়ে বলল, 'আমি এখন বাথরুমে আছি, বলে দে।'

দ্রুত সরে গেল অদিতি। কয়েক মিনিট বাদে বাথরুমে শাওয়ারের নিয়ে দাঁড়িয়ে চোখ বন্ধ করে সে ভাবছিল। জয়ন্ত সেন নামে দ্বিতীয় কোন মানুষকে সে চেনে না। ছবি রিলিজের সময় পার্টিতে দেখা চোখ দুটো সে একটু একটু করে ভুলে যাচ্ছিল। এখন কাজের চাপে মানুষটার কথা আর মনে আসে না। আজ পর্যন্ত কোন পুরুষের চোখে সে ওই দৃষ্টি দ্যাখেনি। ভেবেছিল প্রায়ই ফোন আসবে। নিশ্চয়ই দেখা করতে চাইবে। প্রভাবশালী মন্ত্রীর একমাত্র অবিবাহিত পুত্র নিশ্চয়ই এতকাল যা চেয়েছে তাই পেয়ে এসেছে। ফিল্মে নেমেছে নতুন একটা মেয়েকে যদি তার পেতে ইচ্ছে করে তাহলে তো সে চাইবেই। কিন্তু এসব কিছুই হয়নি। এই কয়েক মাসে অদিতির পরিচিতি বেড়েছে সেই সঙ্গে কাজের চাপও। মাস ছয়েক আগে যার নাম শুধু ফিল্মের সঙ্গে জড়িত কিছু মানুষ জানত, দেড় বছর আগে যাকে একটা গলির সব মানুষ চিনত না এখন তার নাম পশ্চিমবাংলার অধিকাংশ মানুষের জানা। এই পর্যায়ে তার আসা পর্যন্ত কি জয়ন্ত সেন অপেক্ষা করছিল? সুলেখার সঙ্গে জয়ন্ত কি কথা বলছে কে জানে! সে যদি নিজে টেলিফোন ধরত আর জয়ন্ত যদি তাকে অনুরোধ করত দেখা করতে তাহলে সে কি করত? হঠাৎ বুক নিংড়ে শ্বাস বেরিয়ে এল। জয়ন্তর মুখ মনে পড়লেই তার সমস্ত শরীর মন এমন অবশ হয়ে যায় কেন?

বাথরুম থেকে বেরুল অদিতি। সে ঠিক করেছিল উপেক্ষা করবে, সুলেখাকে কোন প্রশ্ন করবে না। কিন্তু সুলেখাই জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ভদ্রলোককে চেনো?'

'ঠিক চিনি বলা যায় না, দেখেছি।' ঠোঁট কামড়ালো অদিতি।

'ওমা! উনি বললেন তুমি ওঁকে চিনবে না। এই প্রথম ছবি করতে যাচ্ছেন উনি। তোমাকে নায়িকা হিসেবে ভেবেছেন—।'

'কি নাম বললি তখন?'

'জয়ন্ত সেন। ফিল্ম ডিরেক্টার হতে যাচ্ছেন।' সুলেখা বলল, 'আমি ওঁকে স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দিতে বললাম। আগে তুমি পড়ে দেখবে, তারপর মতামত জানাবে।'

হঠাৎ নিজেকে খুব হালকা লাগল অদিতির, বলল, 'ঠিক বলেছিস।'



[একত্রিশ]

ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে আধঘণ্টা যোগব্যায়াম করে স্নান সেরে একটা শুকনো টোস্ট, কয়েক চামচ কর্নফ্লেকস আর একটা আপেল খেয়ে তৈরি হয়ে নেয় অদিতি। আটটায় গাড়ি আসে। ড্রাইভারের সাহায্যে জিনিসপত্র নামায়। এখন প্রায় গোটা পাঁচেক জিনিস সঙ্গে যায়। মেকআপ বক্স, স্যুটকেসে জামাকাপড়, জল, খানিকটা বরফ আর খাবার। আটটা পনেরো নাগাদ স্টুডিওতে ঢুকে সোজা মেকআপ রুমে চলে যায় সে। তার নিজস্ব মেকআপ রুম। অ্যাটাচড্ বাথ ছাড়া একটা ডিভান রয়েছে একপাশে। যেসব দৃশ্যে অদিতি নেই সেসব দৃশ্য যখন তোলা হয় তখন ডিভানে বিশ্রাম নেয় সে।

প্রথম প্রথম যে যা বলত শুনত। সকালে এসে রাত দশটা-এগারোটা পর্যন্ত শ্যুটিং করেছে। কিন্তু সবাই জেনে গেছে ম্যাডাম সন্ধ্যে ছটার পর শ্যুটিং করবেন না। তারপর মেকআপ তুলে বাড়ি যেতে যেতে সাড়ে ছটা। টালিগঞ্জে স্টুডিওগুলো মোটেই আরামপ্রদ জায়গা নয়। একটু গরম পড়লে ফ্লোরে ফ্যান ছাড়া থাকা মুশকিল। এদিকে শ্যুটিং-এর সময় ফ্যান চালানো যায় না। এরকম সময়ে সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার পর নিজেকে ছোবড়া বলে মনে হয়।

বৈচিত্র্য বলতে একটাই, নিত্য নতুন চরিত্রে অভিনয় করা। তিন দিন রাজেন্দ্রাণীর ভূমিকায় তো পরের তিন দিন খুব গবির মেয়ে। এই বৈচিত্র্যটুকু না থাকলে পাগল হয়ে যেতে হত। কখনও কখনও সহ-অভিনেতার ভুলে একই দৃশ্য পাঁচ-সাতবার টেক্ করার পর ঠিকঠাক হয়। একই কথা অতবার বলে যেতে বিরক্তি লাগলেও কিছু করার নেই। তার নিজেরও যে ভুল হয় না, তা নয়। মন কোন কারণে বিক্ষুব্ধ থাকলে সংলাপ বলতে গিয়ে গোলমাল হয়। স্টুডিওতে থাকার সময় সে নিজেকে খুব শান্ত রাখার চেষ্টা করে। শ্যুটিং-এর ফাঁকে শিল্পীরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আড্ডা মারেন। কিন্তু অদিতি ওসব থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখে। সে পেশাদারী অভিনেত্রী, তার ভুলের জন্যে প্রযোজকের ক্ষতি হোক এটা কখনই কাম্য নয়। একই শট্ একাধিকবার টেক করতে হলে আর্থিক ক্ষতি হবেই, এটা সে প্রথম কয়েকদিনেই বুঝে গিয়েছিল। স্টুডিও মহলে তাই চাউর হয়েছিল নতুন হিট নায়িকা অদিতি শুধু ভাল অভিনেত্রীই নয়, অত্যন্ত ডিসিপ্লিন্ড অভিনেত্রী। প্রোডিউসারকে কখনই বিপদে ফেলে না, নিজের কাজের বাইরে অন্য কিছুতেই আগ্রহী নয়।

এই প্রচার অদিতির সম্পর্কে আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তুলল।

ছয় মাসের মাথায় অদিতির দ্বিতীয় ছবি মুক্তি পেল। এখন পর্যন্ত বাংলা ছবির নতুন নায়িকাদের ক্ষেত্রে যা হয়নি এই ছবিতে তাই হল। প্রথম দিনের ম্যাটিনি শো

থেকেই ছবির যে হাউসফুল বোর্ড ঝুলল তা দ্বিতীয় সপ্তাহে যখন নামছে না তখন এক রবিবার সকালে বিখ্যাত পরিচালক তপন সাহা অদিতির সঙ্গে দেখা করতে এলেন। কলকাতায় যেসব পরিচালক এখন একের পর এক হিট ছবি বানিয়ে যাচ্ছেন তপন সাহা তাঁদের অন্যতম। ওঁর ছবিতে বাংলাদেশের বিখ্যাত নায়ক-নায়িকারা কলকাতায় এসে অভিনয় করেন। কোন ভণিতা না করে তপনবাবু বললেন, 'ম্যাডাম, আপনার সাফল্য কোন যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না। আমার অভিনন্দন গ্রহণ করুন।'

'ধন্যবাদ।' অদিতি অল্প হাসল।

'আমার কোন ছবি কি আপনি দেখেছেন?'

'না, আসলে ইদানীং ছবি দেখার সময় পেতাম না।'

'আমার দুর্ভাগ্য। যাকগে আমি সামনের মাসে দুটো ছবি শুরু করছি। ইনফ্যাক্ট আপনার ছবি দেখেই গল্প মাথায় এসেছে। প্রথম ছবির নাম, সতী অসতী। দ্বিতীয়টির নাম, আইবুড়ো মেয়ে। এই দুটো ছবি নায়িকাপ্রধান। বুঝতেই পারছেন। দুটো ছবির হিরো বাংলাদেশ থেকে নেওয়া হচ্ছে। আমি টানা শ্যুটিং করি। আপনাকে অন্তত দিন বারো আমাকে দিতে হবে।' তপনবাবু মাথা নাড়লেন।

'ডেটের ব্যাপারে আপনি সুলেখার সঙ্গে কথা বলুন।'

'অ্যাঁ? ও। এই যে ভাই, সামনের মাসে ওঁর কি কি দিন খালি আছে? ডায়েরি দেখে বলে ফ্যালো।' তপনবাবু বললেন।

সুলেখা বলল, 'সামনের মাসে সাতদিন একজন নিয়েছিল নতুন ছবির জন্যে। কাল ফোন করে বলেছে শ্যুটিং ক্যানসেল হয়েছে।'

'সাতদিন? ঠিক আছে, তাতেই ম্যানেজ করে নেব।'

'দশদিনের কাজ সাতদিনে করবেন?' অদিতি জিজ্ঞসা করল।

'ও নিয়ে আপনি চিন্তা করবেন না।'

'আমাকে একবার স্ক্রিপ্ট পাঠিয়ে দেবেন?'

'স্ক্রিপ্ট? নিশ্চয়ই দুটো স্ক্রিপ্টই পাঠিয়ে দেব।'

'দুটো কেন?'

'বাঃ, তখন বললাম যে আপনাকে দুটো ছবিতেই নায়িকা করব।'

'দ্বিতীয় ছবির শ্যুটিং কবে শুরু করছেন?'

'একই সঙ্গে?'

হতভম্ব হয়ে গেল অদিতি। সে ঠিক শুনল তো! অদিতি মাথা নাড়ল, 'আমি আপনার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না তপনবাবু।'

'খুব সোজা ব্যাপার। সকাল থেকে লাঞ্চ পর্যন্ত প্রথম ছবির শ্যুটিং করব, লাঞ্চ ব্রেকের পর দ্বিতীয় ছবির কাজ হবে।'

'সেট?'

'আমার তো সামাজিক গল্প, একই সেটে দুটো ছবি করা যাবে।'

'আপনি কি বলছেন?' বেশ জোরে বলে উঠল অদিতি।

'হ্যাঁ ম্যাডাম। আমার দুটো ছবিরই প্রোডিউসার একই মানুষ। আর্টিস্ট কমন। একটু আধটু মেকআপ বদলাতে হবে। অন্য সবাই যে ক'টা দৃশ্য সারাদিনে তোলে আমি সেটা লাঞ্চের আগেই তুলে ফেলি। তারপর ফ্লোর পড়ে থাকবে কেন? সেকেন্ড ছবিটা তুলে নিই।'

'আপনি দুটো ছবির সমস্ত ব্যাপার একসঙ্গে ভাবতে পারেন?'

'অবশ্যই। নাহলে আমার সব ছবি হিট হচ্ছে কেন?'

'আমি ব্যাপারটা ভাবতেই পারছি না।'

'পারবেন। নতুন এসেছেন তো, একটু অভিজ্ঞতা হলেই দেখবেন শু্যটিং-এর সময় এখানে অর্ধেক সময় নষ্ট হয় বাজে কথায়। আলো ঠিকঠাক করতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা নষ্ট হয়। আমি সেই সময় বাঁচিয়ে যদি দুটো ছবি করে ফেলি তাহলে প্রোডিউসারের লাভ। আর প্রোডিউসার না এগিয়ে এলে ছবি তৈরি হবে না। যাকগে, ম্যাডাম, আপনি পঁচাত্তর করে নিচ্ছেন, আমি শুনেছি, আপনাকে ওই কটা দিনের জন্যে এক লাখ দেব। ডান?'

'একটু বুঝতে দিন। আমি আপনার দুটো ছবির নায়িকা হব। ওই সাতদিনে আপনি আমাকে নিংড়ে আমার সব কাজ শেষ করে নেবেন। দুটো ছবি আলাদা আলাদা সময়ে নিশ্চয়ই রিলিজ করবেন। যেহেতু এক সঙ্গে কাজ হচ্ছে। তাই আপনি আমাকে পঞ্চাশ করে এক লাখ দেবেন। তাই তো?'

'এক্কেবারে ঠিক কথা।'

মাথা নাড়ল অদিতি, 'মাপ করবেন তপনবাবু, আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।'

'সম্ভব হচ্ছে না? কেন? টাকাটা কম লাগছে? ঠিক আছে, যা নিচ্ছেন তাই পাবেন। দেড় লাখ। আর তো কোন অসুবিধে নেই?' তপনবাবু বললেন।

'আছে।'

'আবার কি হল?'

'আমি একজন খুব সামান্য অভিনেত্রী। একই দিনে একই ফ্লোরে দুটো চরিত্রে অভিনয় করার ক্ষমতা আমার নেই। যে চরিত্রে আমি অভিনয় করব সেই চরিত্রের বাইরে আমি কিছুই ভাবতে পারি না। এক সঙ্গে দুটো চরিত্র নিয়ে ভাবার মত মনের শক্তি আমার নেই। নমস্কার।'

'আশ্চর্য! এসব কি বলছেন? মনের শক্তি-টক্তির কোন দরকার আছে নাকি? যেমন সংলাপ পাবেন বলে যাবেন। আরে, পাবলিক হল্‌এ বসে শুধু সংলাপ শুনতে চায়, আর কিছু দেখতে চায় না। এখন আপনি হিট হয়ে গেছেন, আপনি যা বলবেন তাই পাবলিক শুনবে।'

'হয়তো, কিন্তু আমি বলতে পারব না।'

'ম্যাডাম, চেষ্টা করলেই পারবেন। আমার আগের ছবিগুলোতে যারা অভিনয়

করেছে তারা ঢাকা-কলকাতার নামী-দামী শিল্পী। এক সঙ্গে দুটো ছবিতে অভিনয় করতে তাদের বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয়নি।' হাসল তপনবাবু।

মাথা নাড়ল অদিতি, 'ধরে নিন আমি ওঁদের মত ক্ষমতা রাখি না। তাছাড়া আমি এখনও বিশ্বাস করি সিনেমা শুধু ফ্যাক্টরি নয়। এটা খুব শক্তিশালী শিল্প-মাধ্যম। আপনার ছবি হিট হচ্ছে তার মানে এই নয় যে, আপনার পথটা খুব অভিনন্দনযোগ্য। আপনি যেদিন একটা গল্প নিয়ে ধীরে সুস্থে ছবি তৈরি করবেন সেদিন যদি আমাকে অভিনয় করতে বলেন আর সেই চরিত্র যদি আমার পছন্দ হয় তাহলে নিশ্চয়ই আমি অভিনয় করব। তখন টাকাটা কোন সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে না।'

তপনবাবু চলে যাওয়ার পর সুলেখা বলল, 'তোমার খুব সাহস আছে দিদি। স্টুডিওতে দেখেছি সবাই ওঁর ছবিতে চান্স পাওয়ার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকে আর তুমি ফিরিয়ে দিলে।'

অদিতি হাসল, 'চিংড়ি মাছ যত দামী হোক খেলে যার অ্যালার্জি হয় সে কখনও ছুঁয়েও দ্যাখে না। যা, আমাকে চা করে দে।'

সুলেখা সরে গেলে অদিতির মনে হল এইবার এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দেওয়া দরকার। তার এখন যা রোজগার তাতে আরও ভাল ফ্ল্যাটে সে স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। এই ফ্ল্যাটের মালিক তার প্রথম ছবির প্রোডিউসার। তাঁকে সে নিয়মিত পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু ভদ্রলোক আর ছবি করছেন না। মিলনদা এখনও নতুন প্রোডিউসার পাননি। ভদ্রলোক খুব চেষ্টা করছেন। এই অবস্থায় প্রোডিউসারের দাক্ষিণ্য নিলে মিলনদা তাকে ভুল বুঝবে। এই বাজারে পাঁচ হাজার টাকা ভাড়া দাক্ষিণ্য ছাড়া কি?

এই সময় ফোন বাজল। কিচেন থেকে সুলেখার গলা ভেসে এল, 'ধরছি।'

অদিতি উঠল, 'থাক, আমিই ধরি।'

অদিতি রিসিভার তুলে নিচু গলায় বলল, 'হ্যালো!'

একটু চুপচাপ, তারপর সুন্দর উচ্চারণ, 'অদিতি?'

'কথা বলছি। কে বলছেন?'

'বিরক্ত করছি না তো!'

'আপনার নামটা বলুন।' অদিতির গলার স্বর উঁচুতে উঠল।

'জয়ন্ত। জয়ন্ত সেন। মনে পড়ছে?'



[বত্রিশ]

কোনমতে নিজেকে শক্ত করতে চাইল অদিতি। সিনেমায় নামার পরে একটু একটু করে তার মধ্যে যে পরিবর্তনটা বিরাট হয়ে দাঁড়িয়েছে বলে সে নিজেই অনুভব করত এখন যেন সেটা নিঃশেষ। যে কোন মানুষ, তা তিনি যতই বিখ্যাত হোন না কেন, বেশ দাপটে তাঁর সঙ্গে পেশাদারী কথা বলতে সে এখন সহজেই পারে। মফস্বলের মেয়ের সঙ্কোচ সে অনায়াসে ঝেড়ে ফেলতে পেরেছে। নতুন নায়িকা হিসেবে যারা টাকা এবং কাজের সুযোগ নিতে আসে তারা রীতিমত জব্দ হয়ে ফিরে যায়। নিজের চারপাশে অদ্ভুত এক পাঁচিল তুলে সে সহজেই অবাঞ্ছিতদের দূরে সরিয়ে রাখতে সক্ষম।

কিন্তু এই ফোনের কণ্ঠস্বর এবং কণ্ঠের মালিকের নাম শোনামাত্র তার হাতের তেলো ঘামছে, দু'পায়ের শক্তি দ্রুত কমে যাচ্ছে।

'হ্যালো!' জয়ন্ত সেন নীরবতা ভাঙল।

'বলুন।' গলা কেঁপে উঠল অদিতির।

'আমি বোধহয় বিরক্ত করলাম।' জয়ন্তর গলায় কুণ্ঠা।

'না, ঠিক তা নয়!'

'তাহলে?'

অদিতি উত্তর দিল না। কি উত্তর দেবে তা সে নিজেই জানে না।

জয়ন্ত সেন হাসল, 'বুঝতে পারছি। আসলে সেই ফিল্মপার্টিতে যাওয়া আমার উচিত হয়নি। মুশকিল হল, আগে থেকে তো জানা যায় না।'

'কেন?'

'না গেলে তো সামনাসামনি দেখা হত না। ব্যবসা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকি যে সিনেমা থিয়েটার দেখার কোন অবকাশই আমার নেই। বাবার সূত্রে শুধু নয়, ব্যবসায়ী হিসেবেও আমি প্রচুর পার্টিতে আমন্ত্রণ পাই। ইচ্ছে থাকলেও যাওয়া হয় না। তাছাড়া গেলে তো সেই একই মুখ, একই কথা। মন্ত্রীর ছেলে বলে ওই যে বিশেষ খাতির করে ওটাও সহ্য হয় না আমার। কি যে দুর্মতি হল, আপনার প্রথম ছবির পার্টিতে চলে গেলাম!'

'এখন তাই আফসোস হচ্ছে?'

'হবে না? [illegible]ানে দেখা না হলে আপনার প্রথম ছবিটা আমি তিনবার দেখতাম না? লোকজ[illegible] অবাক হবে বলে আমাকে লুকিয়ে দেখতে হয়েছে।'

'দেখতে হয়েছে?'

'হ্যাঁ। না দেখে পারিনি। কিন্তু আমি আপনাকে বিরক্ত করিনি। এরপর দ্বিতীয় ছবিটা দেখলাম কয়েকমাস বাদে। দেখে মনে হল কথা বলা দরকার।'

'কেন?'

'আমি শুধু জানাতে চাই, এইভাবে আমাকে আলোড়িত কেউ কখনও করেনি।'

'আমি কি বলব বুঝতে পারছি না।'

'না, আপনাকে কিছু বলতে হবে না।' জয়ন্ত হাসল, 'আমার কার্ডটা নিশ্চয়ই আপনি হারিয়ে ফেলেছেন?'

'না।'

'অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা, এখন রাখি।'

জয়ন্ত টেলিফোন রেখে দিল। রিসিভার নামিয়ে অদিতি ছুটে গেল নিজের ঘরে। ড্রয়ারের ভেতর থেকে কার্ডটাকে বের করল, 'জয়ন্ত সেন।'

বিছানায় বসল সে। আচ্ছা, ফোনটা পাওয়ার পর থেকেই সবকিছু তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেল কি করে? লোকটা কে? বড় ব্যবসায়ী? ব্যবসা করে টাকা জমিয়েছে এমন অনেক মানুষ তো পৃথিবীতে আছে। তাদের কেউ কেউ ফিল্মে টাকা ঢালে অভিনেত্রীদের সঙ্গে ফস্টিনস্টি করবে বলে। এই সময়েই তেমন কয়েকজনকে অদিতি অপমান করে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অতএব একজন শুধু ব্যবসায়ী এই পরিচয় তার কাছে কোন বিশেষ আকর্ষণ তৈরি করে না। ক্ষমতাবান মন্ত্রীর ছেলে? যে মন্ত্রীর নির্দেশে এ রাজ্য নিয়ন্ত্রিত হয়? তাতে তার কি হল? রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রে যাদের প্রবল আকর্ষণ সে তাদের দলে পড়ে না। তাহলে?

চোখ বন্ধ করল অদিতি। পার্টির রাত্রে জয়ন্তর চাহনির কথা মনে আসতেই গায়ে কাঁটা দিল। কি ছিল ওই চাহনিতে? যেন মনে হয়েছিল মানুষটা তার সবকিছু দেখে নিচ্ছে? লোকটাকে এড়াতে সে রাতে সাততাড়াতাড়ি চলে এসেছিল কিন্তু মনে মনে কি একবারও ভাবেনি ওর ফোন আসবে! না ভাবলে রাত্রে আসা ফোনগুলো সে ধরেনি কেন? ফোন আসুক যেমন সে চেয়েছিল তেমনি সেই ফোনে জানান দিতে ভয়ও পেয়েছিল বিস্তর।

কিন্তু এখন ভাল লাগছে। খুব ভাল। ঠিক এরকম অনুভূতি তার কখনও হয়নি। কমলেন্দুর সঙ্গে প্রথম আলাপের সময়েও নয়। কী রকম নেশা নেশা লাগছে। রাতটা ভাল করে ঘুমাতে পারল না অদিতি। ফলে পরদিন শরীরে অস্বস্তি।

সাতসকালে শ্যুটিং-এর গাড়ি এসে হাজির। সুলেখা সামনে এসে বলল, ওমা, একি চেহারা হয়েছে তোমার?'

'কেন?'

'আয়নায় দ্যাখো।'

দেখল অদিতি। একরাত্রে মানুষের চেহারা এমন বদলে যায়? চোখের কোলে পুরু কালি পড়ে গেছে, মুখে কালো ছায়া, যেন মনে হচ্ছে সারাদিন কড়া রোদে হেঁটে এসেছে।

'তুমি এভাবে কি করে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবে?' সুলেখা জিজ্ঞাসা করল।

খুব রাগ হল নিজের ওপর। কে না কে ফোন করেছে আর তাই নিয়ে সে সারারাত ভেবে মরল? সে অভিনেত্রী, পেশাদারী অভিনেত্রী। তার ওপর নির্ভর করে প্রযোজক লক্ষ লক্ষ টাকা ঢালছে। কোনভাবে সেই লোকটার ক্ষতি করার কোন অধিকার তার নেই।

ঈশ্বর আছেন। এইসময় ফোন এল। পরিচালক হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলে আজ শ্যুটিং বন্ধ রাখতে হচ্ছে। সহকারী পরিচালক বারংবার অনুরোধ করতে লাগল অদিতিকে, আজকের বদলে আর একটা তারিখ দিতে। অদিতি জানিয়ে দিল, কোন অসুবিধে হবে না।

সুলেখা বিউটি পার্লারের সঙ্গে কথা বলে সময় ঠিক করে নিল। হঠাৎ পাওয়া এই ছুটি অনেকভাবেই কাজে লেগে গেল। প্রথম কথা এই মুখে মেকআপ বসিয়ে ক্যামেরার সামনে দাঁড়াতে হবে না। বিউটি পার্লারে গিয়ে শরীরটাকে মেরামত করার সুযোগ পাওয়া যাবে।

চা খেতে খেতে সুলেখা বলল, 'দিদি, এবার একটা গাড়ি কেনো।'

'গাড়ি?'

'হ্যাঁ। গাড়ি না থাকলে প্রেস্টিজ থাকছে না।'

'কত দাম?'

'ও নিয়ে চিন্তা করো না। সামন্তবাবুর সঙ্গে আমার কথা হয়ে গেছে। উনি সব ব্যবস্থা করে দেবেন।'

'তারপর যদি ছবি হাতে না থাকে।'

'দূর! অন্তত বছর পাঁচেকের মধ্যে সেই সম্ভাবনা নেই।'

সামন্ত এখন অন্য পরিচালকের সহকারী। মিলন ছবি করার জন্যে প্রোডিউসার পায়নি। তার সহকারী হিসেবে থাকলে সামন্তর পেট চলবে না। মাঝে মাঝেই সে এ বাড়িতে আসে। সুলেখার সঙ্গেই বেশি গল্প করে। সামন্ত বলে, 'মিলনদার সব ভাল, শুধু ওই একটাই দোষ, জেদ। কিছুতেই গল্প পাল্টাবে না। এখন কাজ নেই, অর্থকষ্টে আছে তবু না। জানেন, সুতপা দত্ত অনেক অনুরোধ করেছিল ওকে নিয়ে একটা ছবি করতে কিন্তু মিলনদা রাজি হয়নি। হলে প্রোডিউসার রেডি ছিল।'

অদিতির খুব খারাপ লাগে মিলনের জন্যে। মানুষটার কাছে সে কৃতজ্ঞ। লোকটার যদি জেদ না থাকত তাহলে নায়িকার চরিত্রে তার মত নতুন মেয়েকে কখনই সুযোগ দিত না।

একটা ফ্ল্যাটের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে। কিন্তু দাম চাইছে কুড়ি লক্ষ। অত টাকা এখন স্বপ্নের বাইরে হয়তো নয় কিন্তু নাগালের মধ্যেও নয়। অদিতি হিসেব করে দেখেছে বছর পাঁচেক পরে ওই টাকার ফ্ল্যাট সে কিনতে পারে। কুড়ি লক্ষ টাকার ফ্ল্যাট। ভাবা যায়?

বিকেলে বিউটি পার্লার থেকে ফিরে এসে ওরা দেখল সামন্ত দাঁড়িয়ে আছে দরজায়। সুলেখাই বেশ তৎপর হয়ে দরজা খুলে তাকে বসতে বলল। সামন্ত

হাসল, 'দিদি গাড়িটা একজন ডাক্তারের। মাত্র ছয় হাজার কিলোমিটার চলেছে। টিপ্‌টপ্ কন্ডিশন।'

'কি গাড়ি?'

'মারুতি থাউজেন্ড। ভেতরে সবরকম মডার্ন যন্ত্রপাতি লাগানো আছে। অনেক দরাদরি করে তিন লাখ পনেরোতে রাজি করিয়েছি।'

'পাগল! অত টাকা দিয়ে গাড়ি কিনব?'

'এর চেয়ে সস্তায় আপনি পাবেন না। সুলেখার কাছ থেকে শোনার পর আমি ড্রাইভার যোগাড় করেছি। গ্যারেজও ঠিক করে ফেলেছি।'

এই সময় বেল বাজল। সুলেখা দরজা খুলতেই প্রথমে মাকে দেখা গেল। স্যুটকেস, বেডিং নিয়ে পেছনে বাবা। মা বলল, 'চলে এলাম রে। সবাই বলছে অত নামী মেয়ে থাকতে এখানে পড়ে থাকবে কেন?'

'চলে এসেছ ভালই করেছ। কিন্তু কৃষ্ণনগরের বাড়িটা—?'

'আপাতত তালাবন্ধ। পরে ভেবে দেখব কি করা যায়', বাবা বললেন।

সুলেখা এবং সামন্ত বলল, 'তাহলে দিদি—!'

'আর কমানো যাবে না?' অদিতি জিজ্ঞসা করল।

'এর কমে অসম্ভব। গাড়িটা দেখলে বুঝতে পারবেন।'

'কাগজপত্র?'

'সব ঠিক হয়ে যাবে। আপনি চেকেই টাকাটা দিন।'

বাবা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের টাকা?'

অদিতি বলল, 'গাড়ি কিনছি।'

'সেকি? কত দাম?' বাবা যেন অবাক।

'তিনলাখ পনেরো।'

'সর্বনাশ। এতটাকা দিয়ে গাড়ি কিনছ? তুমি কি টাকা পয়সা সব নয়ছয় করবে? যে গাড়িটা কিনছ তাকে চোখে দেখেছ? নো, নো আমি এটা অ্যালাউ করব না। আমি আগে গাড়ি দেখব, পছন্দ হলে দর করব, তারপর টাকা দেওয়া হবে। আপনার গাড়ি?' বাবা প্রশ্ন করলেন।

সামন্ত মাথা নাড়ল। না।

অদিতি ঠোঁট কামড়ালো।



[তেত্রিশ]

সকালে শ্যুটিং-এ বেরিয়ে গেলে সন্ধ্যের আগে সাধারণত বাড়ি ফেরা যায় না। গোটা দিন ফ্ল্যাটে থাকে মা এবং বাবা। আর সেটাই সমস্যা হয়ে দাঁড়াল। যারা অদিতিকে তাদের ছবিতে নিতে চায় তারা বাড়িতে এলে বাবা সরাসরি কথা বলতে লাগলেন। যে তারিখ আগে থেকেই অন্য কোন পরিচালককে দিয়ে দেওয়া হয়েছে সেই তারিখ বাবা দ্বিতীয়জনকে দিয়ে দিচ্ছেন কোন পরামর্শ না করে। এরকমটা হতে পারে এই আশংকায় সুলেখা বাইরের ঘরে টেবিলের উপর একটা খাতা রেখে এসেছে যার পাতায় পাতায় অদিতির আগামী ছয় মাসের রুটিন লেখা আছে। অথচ তারিখ দেওয়ার সময় বাবা নাকি সেটাকে হাতের কাছে খুঁজে পান না।

শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়ে অদিতি বলল, 'শোন, তুমি আর কাউকে ডেট দেবে না। যখন থাকব না তখন কেউ যদি এসে ডেট চায় তো বলবে স্টুডিওতে গিয়ে দেখা করতে।'

বাবা হতভম্ব, 'সেকি রে! আমি তোর বাবা হয়েও কিছু করব না?'

'করতে গিয়ে তো জট পাকাচ্ছ!'

'ভুল তো হতেই পারে। তাই বলে জট পাকাচ্ছি কি রকম?'

'যারা তোমার কাছে ডেট নিয়েছে তারা চাপ দিচ্ছে। ওসব জানি না, আপনার বাবা যখন ডেট দিয়েছে, তখন ওইদিন আপনাকে কাজ করতেই হবে। তাছাড়া স্টুডিওতে আর একটা কথা রটেছে!'

'কি কথা?'

'তোমাকে এক্সট্রা টাকা দিলে নাকি আমার ডেট পাওয়া যায়।'

'এক্সট্রা টাকা? আরে? আমি কি নিজে থেকে চাইতে গেছি। ওরাই বলল, মেসোমশাই আপনি আমাদের দেখুন, আমরাও আপনাকে দেখব। এদের কাজ তো তুই আগেও করেছিস তাই আমি হ্যাঁ বলে দিলাম।'

'হ্যাঁ বলায় কত টাকা পেয়েছ?'

'কত আর! পাঁচ দিনের জন্যে আড়াই হাজার। মানে আমাকে ওরা আড়াই হাজার দিয়ে গেছে। তোরটা আলাদা।'

'আমাকে কথাটা বলনি কেন?'

'অ্যাই দ্যাখো। পুরনো অভ্যেস। সরকারি অফিসে যারা চাকরি করে তারা এসব পেয়ে থাকে। পেয়ে কি ওপরওয়ালাকে জানায়? তবে তোর মা জানে, ওর কাছে তখনও এসব লুকোতাম না, এখনও লুকোই না।'

'অনেক হয়েছে। তুমি আমার ছবির ব্যাপারে কথা বলবে না।'

'সে কি? তাহলে আমি কি নিয়ে থাকব?'

'সিনেমা থিয়েটার দ্যাখো, লাইব্রেরি যাও। মন্দিরেও যেতে পার।'

মা এতক্ষণ চুপচাপ শুনছিল। আওয়াজ করে নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'এক কাজ কর। আমাদের জন্যে একটা আলাদা ফ্ল্যাট ভাড়া করে দে।'

'আলাদা?'

'একসঙ্গে থেকে যদি চোর অপবাদ শুনতে হয় তাহলে আলাদা থাকাই ভাল। কলকাতায় থাকতে চাইছি কারণ কৃষ্ণনগরে ফিরে যেতে পারব না। গেলে লোকে হাসাহাসি করবে। সব গেছে কিন্তু আত্মসম্মান তো এখনও যায়নি!'

'ঠিক আছে, ভেবে দেখি।' বলামাত্র বেল বেজেছিল। সুলেখা ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতেই তাকে ইশারায় দরজা খুলতে বলে ভিতরে চলে গিয়েছিল অদিতি। মা চাপা গলায় বাবাকে বলেছিল, 'তুমি মুখ বন্ধ করে থাক।'

সুলেখা দরজা খুলে দেখল সুদর্শন এক যুবক দাঁড়িয়ে আছে। সে কিছু বলার আগেই যুবক বলল, 'অদিতি দেবী ফিরেছেন নিশ্চয়ই!'

'আপনি?'

'একটু দরকার ছিল!' যুবক হাসল।

মানুষটার মুখ চোখ ও দাঁড়ানোর ভঙ্গীতে এমন একটা আভিজাত্য ছিল যে সুলেখা তাকে বসতে না বলে পারল না।

সুলেখা বলল, 'আপনি কি ছবির ব্যাপারে—?'

'হ্যাঁ, ছবি তো নিশ্চয়ই। আচ্ছা, আপনারা নিশ্চয়ই—!'

'দিদির মা এবং বাবা।' সুলেখা জানাল।

'নমস্কার। খুব ভাল লাগল। আপনারা তো বাইরে থাকেন।'

মা বলল, 'থাকতাম। এখন থেকে কলকাতায় থাকব। মেয়ে একা কাজকর্ম করবে, আমরা পাশে না থাকলে চলে?'

'ঠিক কথা।' যুবক মাথা নাড়ল।

এই সময় বাবা বললেন, 'আমি কিন্তু ওর ছবির ব্যাপারে কোন কথা বলতে পারব না। আমাকে নিষেধ করা হয়েছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ। আরে ভাই, আপনারা এসে যদি আমাকে জ্বালাতন করেন তাহলে কতক্ষণ আমি মুখ বন্ধ করে বসে থাকব।'

সুলেখা তাড়াতাড়ি বলল, 'আপনি কেন এসেছেন বললেন না তো?'

'আমি? ওহো, অদিতি দেবীর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'আপনি আমাকে বলুন। দিদির এসব ব্যাপার আমিই দেখাশোনা করি।'

'কোন্ সব ব্যাপার?'

'ছবির কাজকর্ম!'

'ও। কিন্তু আমি তো কোন ছবির কাজকর্ম নিয়ে ওঁর সঙ্গে দেখা করতে আসিনি।'

'তাহলে?'

'উনি আমাকে চেনেন। টেলিফোনেও কথা হয়েছিল। জাস্ট!'

'আপনার নাম?'

'জয়ন্ত সেন।'

সুলেখা মাথা নেড়ে ভেতরে চলে এল। অদিতি তখন আয়নার সামনে, চুলে চিরুনি বোলাচ্ছিল। সুলেখাকে ঢুকতে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'কে রে?'

'দূর। অকাজের লোক। তোমার সঙ্গে গল্প করতে এসেছে। ফিরে গিয়ে বলছি তোমার মাথা ধরেছে, কথা বলতে পারবে না।'

হাসল অদিতি, 'বাব্বা! আমার সঙ্গে গল্প করতে কেউ চায়? সবাই তো কাজ আর কাজের কথা বলে।'

'চায় মানে? গেটে দারোয়ন রাখা হয়েছে কেন তুমি জানো না? তুমি এখন বাঙালি যুবকদের স্বপ্নসুন্দরী। এই লোকটাকে ঢুকতে দিতাম না কিন্তু কথাবার্তায় চেহারায় এমন একটা ব্যাপার আছে যে মুখের উপর না বলতে পারলাম না। যাই।' সুলেখা ঘুরে দাঁড়াল।

'কি নাম রে?' অদিতি অলস গলায় জিজ্ঞাসা করল।

'জয়ন্ত সেন।'

'দাঁড়া।' গলা থেকে শব্দটা বেশ জোরেই ছিটকে এল।

সুলেখা দঁড়াল। অবাক তাকাল, 'তাহলে মিথ্যে বলেনি।'

'মানে?'

'বলেছিল তোমার সঙ্গে নাকি পরিচয় আছে, টেলিফোনেও কথা হয়েছে। আমি ভাবলাম গুল মারছে। চেনো, না?'

'এক ভদ্রলোকের সঙ্গে পার্টিতে আলাপ হয়েছিল অনেকদিন আগে। বাবা মা কোথায়?'

'ওখানেই বসে আছে।'

'তুই গিয়ে মাকে পাঠিয়ে দে আর বল্ আমি আসছি।' বলেই অদিতি জিজ্ঞাসা করল, 'ঠিক শুনেছিস? জয়ন্ত সেন তো?'

'হ্যাঁ। অদ্ভুত চোখ দুটো।' সুলেখা বেরিয়ে গেল।

হ্যাঁ। পার্টিতেও অদিতির এই কথা মনে হয়েছিল। মানুষটির চোখের দৃষ্টি অদ্ভুত। যেন সব দেখতে পায়। আচ্ছা, ও কি একই চোখে সুলেখার দিকেও তাকিয়েছে? নইলে সুলেখা বলল কি করে।

'কিরে? ডাকলি কেন?' মা এসে দাঁড়াল সামনে।

নিচুগলায় অদিতি বলল, 'তুমি বাবাকে নিয়ে তোমাদের শোওয়ার ঘরে যাও।'

'কেন? ওখানে থাকলে কি অসুবিধে হবে?'

'ওই ভদ্রলোকের নাম জয়ন্ত সেন। ওর বাবা একজন বিখ্যাত মন্ত্রী।'

'মন্ত্রী? কোন্ মন্ত্রী?'

অদিতি মায়ের কাছে নামটা বলতেই মায়ের মুখের চেহারা বদলে গেল, 'ওরে বাবা! বলবি তো!' মা দ্রুত বেরিয়ে গেল।

মায়ের এই প্রতিক্রিয়ায় অদিতিও অবাক হল। কৃষ্ণনগরের গৃহবধূ বলে এই মুহূর্তে যেন মাকে মনে হচ্ছে না।

এক পা জড়তা অতিক্রম করে হেঁটে এল অদিতি। তাকে দেখামাত্র শূন্য ঘরে উঠে দাঁড়াল জয়ন্ত, 'নমস্কার।'

'নমস্কার।' হাতজোড় করে শব্দটা বলে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল অদিতি, 'কি ব্যাপার,' কিন্তু করতে পারল না। উল্টে বলল, 'বসুন।'

'এদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম, ভাবলাম—।'

'ভালই তো!'

'অসময়ে এসে অসুবিধে করছি না তো?'

'এখন তো অসময় নয়।'

'থ্যাংক ইউ।' জয়ন্ত হাসল। চোখ ফিরিয়ে নিল অদিতি।

কয়েক সেকেন্ড চুপচাপ, তারপর জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'এখন তো কাজের খুব চাপ, তাই না?'

'হ্যাঁ, একটু।'

'বিখ্যাত এবং জনপ্রিয় হলে এমন হয়।'

'আমার কথা থাক।'

'আসলে অনেকদিনের ইচ্ছেটাকে আজ আর চেপে রাখতে পারলাম না। আজ দেখা না করলে আমি অসুস্থ হয়ে যেতাম।'

'কেন?'

'আমি জানি না।'

'আপনি আমাকে বোধহয় খুব বেশি গুরুত্ব দিচ্ছেন।'

জয়ন্ত হাসল, 'এটা আমার ওপর ছেড়ে দিন।'

এই সময় সুলেখা ট্রে নিয়ে এল। তাতে চায়ের পট, কাপ ডিশ। অদিতির ভাল লাগল। মেয়েটাকে আজকাল কিছু বলতে হয় না। সবই নিজের থেকে বুঝে নেয়। জয়ন্তকে যে চা দেওয়া দরকার তা তো অদিতির নিজেরই খেয়াল ছিল না। সুলেখা জিজ্ঞাসা করল, 'আমি সার্ভ করে দেব?'

'থাক। আমিই করছি।' অদিতি বলতেই সুলেখা চলে গেল।

চা ঢালছিল অদিতি, জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'এই ফ্ল্যাটে গোড়া থেকেই তো আছেন, তাই না?'

'গোড়া থেকে বলতে ছবিতে কাজ শুরু করার পর।'

'এখন বোধ হয় একটু বেটার বাড়িতে যাওয়ার সময় এসেছে।'

'তাই?'

'হ্যাঁ, জনপ্রিয়তার সঙ্গে পরিবেশ এবং ঘর বদলানো দরকার।'

'আমার সাধ্যের মধ্যে তো পেতে হবে।'

'আমি জানি না সিনেমার নায়িকা, মানে এমন সফল নায়িকার সাধ্য কতখানি, তবে আমাকে দায়িত্ব দিলে আমি ব্যবস্থা করে দিতে পারি। ইনফ্যাক্ট আলিপুরে আমার এক বন্ধুর ফ্ল্যাট খালি হয়েছে। হাজার দশেক ভাড়া, কোন অ্যাডভান্স নেই, ফার্নিশ্‌ড ফ্ল্যাট।'

'ওখানে এত কম?' চায়ের কাপ বাড়িয়ে দিল অদিতি।

'আমার রেফারেন্স থাকলে বেশি চাইবে না।'

'একবার দেখলে হয়।'

চায়ে চুমুক দিল জয়ন্ত, 'আজ আমি বেকার। আপনার আপত্তি না থাকলে আজই দেখে আসা যেতে পারে।'

'আজই?'

'জানি, আপনি সারাদিন শু্যটিং করে টায়ার্ড।'

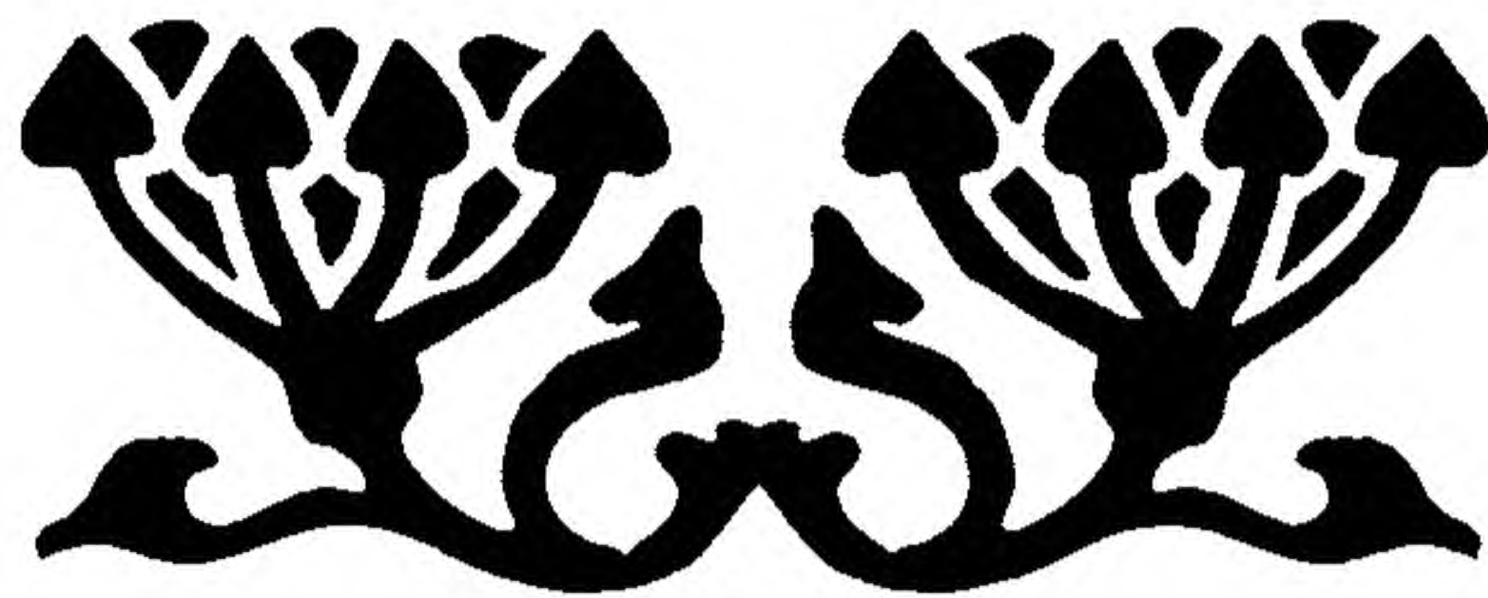
'নট দ্যাট। আসলে আপনার সঙ্গে—।' অদিতি থেমে গেল।

'আমাকে আপনি ভালভাবে চেনেন না। তাই তো?'

'পিতৃপরিচয় জানি।'

'ওটাই তো একমাত্র পরিচয় নয়। আমি ব্যবসা করি। আমদানি-রফতানির। ইদানীং কিছু নতুন প্রজেক্টে হাত দিয়েছি। কলকারখানা। ঠিক আছে, আমরা গাড়িতে বসেও এসব কথা বলতে পারি।'

সঙ্গে সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিল অদিতি, 'তাই ভাল। কোন ভাল কাজ কালকের জন্যে ফেলে রাখার অর্থ হয় না।'



[চৌত্রিশ]

গাড়িটা বিশাল, শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত, আরামদায়ক।

ড্রাইভার নেই, জয়ন্ত নিজেই চালাচ্ছিল, খানিকটা দূরত্বে বসেছিল অদিতি, খুব ভাল লাগছিল তার। সন্ধ্যের রাজপথ যেন আলোয় আলোয় মাখামাখি, চৌমাথায় লাল আলো জ্বলে উঠতেই গাড়ি দাঁড়িয়ে গেল। কিন্তু দাঁড়াতে দাঁড়াতে সাদা লাইন পেরিয়ে থামল। সঙ্গে সঙ্গে ওপাশ থেকে একজন পুলিশ সার্জেন্ট রাগত ভঙ্গীতে এগিয়ে এল।

কাঁচ নামিয়ে জয়ন্ত বলল, 'সরি অফিসার।'

সার্জেন্ট যেন ভূত দেখল। সঙ্গে সঙ্গে সোজা হয়ে দাঁড়াল, 'না, না, ঠিক আছে স্যার। আমার উচিত ছিল গাড়ির নাম্বারটা লক্ষ্য করা।' বলেই সার্জেন্ট ফিরে গেল নিজের জায়গায়।

কাঁচ তুলে স্টিয়ারিং-এ হাত রেখে জয়ন্ত বলল, 'এই হয়েছে এক জ্বালা। আমার বাবা যেহেতু মন্ত্রী তাই আমার সাতখুন মাফ।'

'আপনি এটাকে জ্বালা বলছেন?'

গাড়ি চালু করল জয়ন্ত, 'আমি তাই মনে করি। আর পাঁচটা সাধারণ নাগরিকের থেকে আমার তো কোন পার্থক্য থাকা উচিত নয়। বাবা মন্ত্রী, তিনি নিশ্চয়ই অ্যাডভানটেজ পেতে পারেন। আমি কেন পাব? অথচ না চাইতেই এরা জোর করে সেটা দেবে।'

'আপনি বলতে পারতেন, এক্ষেত্রে অন্য ড্রাইভার যে শাস্তি পায় তাই আপনাকে দিতে।' অদিতি বলল।

'বললে ঝামেলা বাড়ত।'

'মানে?'

'লোকটার হার্ট ফেল করত, ওকে নিয়ে হাসপাতালে ছুটতে হত।'

'যাঃ।'

'হ্যাঁ। এটাই সত্যি।'

'তাহলে বলছেন, ক্ষমতাবান বাবার ছেলে হওয়াটা আপনার একটুও ভাল লাগছে না। সত্যি সত্যি বলছেন?'

'বলছি। মুশকিল হল, বাবার কাছে যারা পৌঁছাতে পারে না তারা আমাকে অনুরোধ করে বাবাকে ব'লে কাজটা করে দিতে। এই কয়েক বছরে সে রকম করলে আমি যে কমিশন পেতাম তাতে কয়েক কোটি টাকার মালিক হয়ে যেতাম। কিন্তু আমি নিজের ভাগ্য নিজে গড়তে চাই। এই যে ব্যবসা, ফ্যাক্টরি, কোথাও বাবাকে জড়াইনি।' জয়ন্ত হাসল।

অদিতি তাকাল। রাস্তায় লোকজন, আলো, গাড়ির মিছিল, অথচ ওরা কী সহজে পথ করে বেরিয়ে যাচ্ছে। জয়ন্ত যে খুব ভাল গাড়ি চালায় তা পরিষ্কার। আবার লাল আলোয় গাড়ি দাঁড়াল। গাড়ির সামনে দিয়ে কয়েকটা ছেলে রাস্তা পার হতে গিয়ে এদিকে তাকাল। সঙ্গে সঙ্গে একজন চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাই, দ্যাখ দ্যাখ, অদিতি!'

সঙ্গে সঙ্গে বাকিরা গাড়ির দিকে তাকাল। দু'পাশে রঙিন কাচ থাকায় এতক্ষণ অদিতি লোকচক্ষুর আড়ালে ছিল। কিন্তু সামনের কাচ সাদা, ওরা সহজেই চিনে ফেলেছে। হৈ হৈ করে ওরা অদিতি যেদিকে বসেছিল সেদিকে ছুটে এল। কপালগুণে তখন লাল আলো সবুজ হওয়াতে গাড়ির ওপর দু-চারটে চড়চাপড় পড়া ছাড়া অন্য কোন ঝামেলা হল না।

গাড়ি চালাতে চালাতে জয়ন্ত বলল, 'বিখ্যাত হওয়ার এই মুশকিল।'

অদিতি কাঁধ নাচাল। স্টুডিও থেকে বাড়ি অথবা বাড়ি থেকে স্টুডিও যাওয়ার পথে এরকম ঘটনা কখনও ঘটেনি। হয়তো স্টুডিও পাড়ার কাছাকাছি মানুষ সিনেমার অভিনেত্রীদের নিয়ে মাথা ঘামায় না।'

'আমি ভাবতেই পারছি না এত তাড়াতাড়ি এই ঘটনা ঘটবে।'

'কোন্ ঘটনা?'

'এই যে আমি গাড়ি চালাচ্ছি আর আপনি পাশে বসে আছেন।'

অদিতি তাকাল, 'আপনি বেশ বাড়িয়ে বলছেন।'

'একটুও নয়।'

'দেখুন, বছর দুই আগেও আমার কোন পরিচিতি ছিল না। আর আপনি এই রাজ্যের সবচেয়ে ক্ষমতাবান মন্ত্রীর ছেলে। আপনার নিজেরই বিশাল ব্যবসা। আপনার কাছাকাছি হওয়ার যোগ্যতা আমার ছিল না।'

'ছিল না। কিন্তু অতীতকে যখন কেউ ম্লান করে ফেলে বর্তমানকে অনেক উঁচুতে তুলে ধরে তখন ওসব নিয়ে মাথা ঘামানোর প্রয়োজন হয় না। এই ধরুন না, আপনাদের লাইনের কথা, শুনেছি উত্তমকুমার পোর্ট কমিশনার্সের কেরানি ছিলেন। কিন্তু উনি নিজেকে যে জায়গায় নিয়ে গিয়েছিলেন তাতে বাঙালি গর্ববোধ করে। ওঁর অতীত নিয়ে কেউ ভাবে না।'

'আপনি কার সঙ্গে কার তুলনা করছেন!'

'আমার কাছে আপনি তো কম কিছু নন।'

'পাগল!' হাসল অদিতি। হাসতে বেশ ভাল লাগল।

বর্ধমান রোড অভিজাত এলাকা। গেট পেরিয়ে গাড়ি ভেতরে ঢুকতেই যেভাবে দারোয়ান ছুটে এসেছিল তাতে স্পষ্ট বোঝা গিয়েছে জয়ন্তকে ওরা খুব ভাল করে চেনে। গাড়ি থেকে নেমে জয়ন্ত ওদের সঙ্গে কথা বলে গাড়ির দরজা খুলল, 'আমার বন্ধু এখন এখানে নেই। আসলে আমরা তো খবর দিয়ে এখানে আসিনি।

যাহোক, কেয়ারটেকার আপনাকে ফ্ল্যাটটা দেখিয়ে দেবে। আপনি যান, আমি নিচে অপেক্ষা করছি।'

'আপনি যাবেন না?'

'আপনার সঙ্গে যাওয়াটা শোভন হত। কিন্তু আমি আপনাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারি এই ভয়ে যাচ্ছি না।' জয়ন্ত হাসল।

নিচে বিশাল কার পার্কিং, দুটো লিফ্‌ট। তার একটায় চেপে অদিতি কেয়ারটেকারের সঙ্গে বাড়ির দশ তলায় উঠে এল। তালা খুলে যে ফ্ল্যাট তাকে দেখানো হল তা এক কথায় অনবদ্য। ব্যালকনিতে দাঁড়ালে সমস্ত কলকাতাকে হীরে হয়ে জ্বলতে দেখা যাবে। পাশের ঘরটার একদিকের দেওয়াল কাচের। আকাশ যেন ঘরের ভেতরে ঢুকে এসেছে। প্রতিটি ঘরে ওয়াল টু ওয়াল কার্পেট। কার্পেটের রঙের সঙ্গে দেওয়ালের রঙে চমৎকার বন্ধুত্ব রয়েছে। এখানে এসে থাকলে একটি অতিরিক্ত আসবাব কিনতে হবে না।

কেয়ারটেকার অবাঙালি, কিন্তু ভাল বাংলা বলে, 'ঠিক আছে?'

'ঠিক তো আছে। কিন্তু লিফট খারাপ হলে?'

'দুটো লিফট তো একসঙ্গে খারাপ হবে না। তাছাড়া এখানে খুব ভাল মেকানিক রয়েছে। কোন ভয় নেই।'

'এই ফ্ল্যাট কতদিন খালি আছে?'

'এখানে তো কেউ থাকে না মেম সাহেব। দু'বছর হল বাড়িটা তৈরি হয়েছে কিন্তু এখানে থাকবেন বলে আপনিই প্রথম এলেন।'

ফ্ল্যাটের মালিক এত কম টাকায় কেন ভাড়া দিচ্ছেন এই প্রশ্ন কেয়ারটেকারকে করা সমীচীন হবে না বলে নিচে নেমে এল অদিতি।

জয়ন্ত দাঁড়িয়েছিল, এগিয়ে এল, 'পছন্দ হয়েছে?'

'নিশ্চয়ই। কিন্তু আপনি বোধ হয় ভুল শুনেছেন।'

'কি?'

'ওই ফ্ল্যাটের ভাড়া পঞ্চাশ হাজার হলেও অবাক হতাম না। কোন রকম অ্যাডভান্স নেই, মাত্র দশ হাজার ভাড়া, বিশ্বাস করতে পারছি না।'

'বিশ্বাস করুন। কখনও কখনও এমন ঘটনা ঘটে। যার ফ্ল্যাট তার টাকার চাহিদা নেই। সে চায় যিনি থাকবেন তিনি যেন ফ্ল্যাটটার একটু যত্ন করেন। দ্যাটস্ অল।'

'কিন্তু তিনি যদি আমাকে ভাড়া দিতে রাজি না হন?'

'দিয়ে ধন্য হয়ে যাবেন।'

অদিতির গালে রক্ত জমল, 'আপনি না—।'

গাড়িতে উঠে জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, 'কবে থেকে আসবেন?'

'যেদিন থেকে উনি বলবেন।'

'ওই ফ্ল্যাটটা?'

‘ওটা যেমন আছে তেমন থাক। বাবা-মায়ের পক্ষে ওই ফ্ল্যাট বেশ ভালই। সুলেখা আমার সঙ্গে চলে আসবে।’

‘কাজের লোকজন যা দরকার কেয়ারটেকারকে বললে পেয়ে যাবেন।’

‘আচ্ছা!’

কিছুক্ষণ চলার পর জয়ন্ত বলল, ‘আপনি কি বলুন তো?’

‘বুঝলাম না।’

‘একটা ভাল খবর হল অথচ চার আনার বাদাম খাওয়ালেন না?’

‘চার আনায় আজকাল বাদাম পাওয়া যায়?’

‘বেশ, চারশো টাকার ডিনার খাওয়ান!’

‘ঠিক আছে, চলুন।’

‘আজ! এখন?’ জয়ন্ত যেন অবাক।

‘নয় কেন? আপনিই তো বললেন, কোন ভাল কাজ কালকের জন্যে ফেলে রাখার অর্থ হয় না।’

গাড়ি ঘুরল। অদিতি জিজ্ঞাসা করল, আমরা কোথায় যাচ্ছি?’

‘যেখানে আপনাকে মানাবে!’

‘নামটা শুনি।’

‘তাজ বেঙ্গল।’

‘উরিব্বাস। আমার ব্যাগে বেশি টাকা নেই কিন্তু।’

‘এবার ক্রেডিট কার্ড সঙ্গে রাখবেন, সমস্যা হবে না।’

‘সেটা তো ভবিষ্যতের কথা।’

‘প্রাচীনকালের একটা প্রবাদ আছে, ঋণ করেও ঘি খাও। ভাল খাওয়ার ব্যাপারে ধার করতে আপত্তি নেই। আজ না হয় তাই করলেন। চলুন, আমরা এসে গেছি।’

অদিতি একটি আলো ঝলমল পাঁচতারা হোটেলের লবি দেখতে পেল। হোটেলের কর্মচারী দরজা খুলে দিয়েছিল। তার হাতেই চাবি দিয়ে জয়ন্ত অদিতির পাশে হাঁটতে হাঁটতে চাপা গলায় বলল, ‘এখন আপনার যা পরিচিতি তাতে এর চেয়ে কমদামী কোন হোটেলে বা রেস্তোরাঁয় গেলে বিপদে পড়বেন, যাওয়া উচিত নয়।’

চমৎকার খাওয়া, বাজনা, আলো, জয়ন্তর কথায় সময়টা যেন মাখনের মত গলে গেল। ওরা যখন আবার গাড়িতে উঠল তখন রাত হয়েছে। অদিতি বলল, ‘খুব ভাল একটা সন্ধ্যের জন্যে ধন্যবাদ।’

‘ওটা তো আমার বলার কথা।’

‘আমারও।’

‘আচ্ছা, আপনি যা বলেন তা কি মন থেকে বলেন?’

‘আপনার ক্ষেত্রে তো নিশ্চয়ই।’

‘আপনি কি চান?’

'বন্ধুত্ব।'

'ব্যাস?'

'এর বেশি চাওয়ার সাহস আমার নেই।'

'সেটা বুঝতেই পারছি।'

'কি রকম?'

'এখন নয়। ফিরে গিয়ে ফোন করবেন, বলব।'

বাড়ির সামনে গাড়ি থামিয়ে জয়ন্ত চেয়েছিল তাকে ফ্ল্যাটের দরজা পর্যন্ত পৌঁছে দিতে। অদিতির আপত্তিতে সে ফিরে গিয়েছিল।

সুলেখা দরজা খুলে জিজ্ঞাসা করল, 'পছন্দ হয়েছে?'

'কি?' হকচকিয়ে গেল অদিতি।

'বাঃ, ফ্ল্যাট দেখতে গেলে যে!'

'ও হ্যাঁ। হয়েছে। খুব ভাল ফ্ল্যাট। বাবা মা কোথায়?'

'খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছেন।'

এইসময় টেলিফোন বাজল। সুলেখা ধরার আগেই অদিতি এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল, 'হ্যালো? ও, কি ব্যাপার? এত তাড়াতাড়ি?'

ওপাশ থেকে জয়ন্তর গলা শোনা গেল, 'ধৈর্য রাখতে পারছি না।'

অদিতি তাকাল সুলেখার দিকে। সুলেখা সঙ্গে সঙ্গে শোওয়ার ঘরে চলে গেল। গলাটা যতখানি সম্ভব নিচে নামিয়ে অদিতি বলল, 'আমার আর ''আপনি'' শুনতে ভাল লাগছে না।'



[পঁয়ত্রিশ]

এখন তার সব ইচ্ছাই যেন ঈশ্বর পূর্ণ করে দিতে ব্যগ্র। মানুষের জীবনে এমন সময় কদাচিৎ আসে। কিন্তু যখন আসে তখন ধুলো ধরলে সোনা হয়। পাকা জুয়াড়িরা বলে থাকেন, হারতে হারতে হঠাৎই জেতার পালা চলে আসে এবং তখন ভাগ্য তুঙ্গে থাকে। কিন্তু সেই সময়টা যখন চলে যায় তখন বেশির ভাগ জুয়াড়ি বুঝতে পারে না। চাকা ঘোরার মত দুর্ভাগ্যের সময় এলেও তারা খেলে যায় এবং হেরে যায়।

জুয়ো খেলা আর অভিনেত্রী হিসেবে সাফল্য অবশ্যই এক নয়। পশ্চিমবাংলার ছায়াছবির জগতের এক নম্বর নায়িকা হয়ে অদিতি সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য দু'হাতে পেয়ে যাচ্ছিল। সে জানে, দেহপট সনে নট সকলি হারায়। শরীরে যখন বয়সের ছাপ পড়বে তখনই নায়িকা হিসেবে তার দিন শেষ হবে। কিন্তু কবে সেদিন আসবে তার জন্যে এখনই হাহুতাশ করার কোন কারণ নেই।

ইতিমধ্যে অদিতির সাংসারিক ব্যবস্থার কিছু পরিবর্তন হয়েছে। পুরনো ফ্ল্যাটে বাবা এবং মা রয়েছেন। তঁদের যা যা প্রয়োজনীয় তার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়েছে। সুলেখাকে নিয়ে অদিতি চলে এসেছে আলিপুরের ফ্ল্যাটে। সেখানে অনেক বেশি আরাম। আরামের অন্যতম কারণ ফিল্মের নায়িকা সম্পর্কে প্রতিবেশীদের অনাবশ্যক কৌতূহল নেই।

ফ্ল্যাটটা বড়। সুলেখা ইতিমধ্যে গুছিয়ে নিয়েছে। নতুন গাড়ি এসেছে গ্যারাজে। সন্ধ্যে ছটার পর শ্যুটিং করে না অদিতি। সাড়ে ছটার মধ্যে বাড়িতে ফিরে আসে। সাতটায় বেল বাজে। অদিতি দরজা খোলে। ওই বেল জয়ন্তর।

এ বাড়ি থেকে জয়ন্ত যায় ঠিক দশটায়। প্রতিটি দিন তাদের ঘনিষ্ঠ করছে। অদিতির বিশ্বাস হয় জয়ন্ত আসার পর তার জীবনটা বদলে গেছে। তার ভয় হয়েছিল সেদিন যেদিন সে জয়ন্তকে নিজের জীবনবৃত্তান্ত শুনিয়েছিল। অবশ্য ঠিক শুনিয়েছিল না বলে শোনাতে বাধ্য হয়েছিল।

জয়ন্ত তাকে ভালবেসেছে, তাকে জড়িয়ে স্বপ্ন দেখছে একথা স্পষ্ট করে জানার পর প্রচণ্ড দ্বিধায় পড়েছিল। ধনী এক মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে আলাপ হয়েছে, ভদ্রলোক বন্ধুত্ব করতে চান, সেটা একধরনের ব্যাপার। কিন্তু যে তাকে সমস্ত জীবন জুড়ে পেতে চায় তার সঙ্গে ছলনা না রাখাই ভাল। ছলনা যদিও সে ইচ্ছে করে করছে না, কিন্তু তার জীবনের অন্ধকার দিকটা লুকিয়ে রাখা তো ছলনা করাই। জয়ন্তর ব্যবহার, কথাবার্তা, তার সম্পর্কে আগ্রহ অদিতিকে প্রবলভাবে আন্দোলিত করেছিল। এই জয়ন্ত তার পাশ থেকে সরে যাক সে কখনই চাইবে না। তাই ভয় হয়েছিল। সত্যি শুনলে যদি ওর বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়? সে বিবাহিতা এবং

ডিভোর্সি জানার পর জয়ন্তর সব আগ্রহ যদি চলে যায়? কয়েকদিন নিজের সঙ্গে লড়াই করেছিল অদিতি। শেষ পর্যন্ত স্থির করল; যা হয় হোক, বলবে। কোন সম্পর্কই মিথ্যার ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। অস্বচ্ছ পর্দা সামনে রাখলে আকাশ দেখা যায় না।

'তোমার সঙ্গে আমার জরুরি কথা আছে, জয়ন্ত।'

'খুব সিরিয়াস ব্যাপার বলে মনে হচ্ছে।'

'হ্যাঁ। সিরিয়াস। আমরা যেভাবে পরস্পরের দিকে এগিয়ে চলেছি তা নিশ্চয়ই হালকা নয়। তাই না?'

'নিশ্চয়ই নয়।'

'এই সম্পর্কের কোন পরিণতি চাও তুমি?'

'নিশ্চয়ই। আমি তোমাকে আমার স্ত্রী হিসেবে পেতে চাই।'

'আমরা যা চাই তা সবসময় পূর্ণ হয় না জয়ন্ত।'

'অসম্ভব। তোমার আপত্তি না থাকলে আমি পৃথিবীর কোন বাধা মানব না।'

'বেশ। এরপর তোমাকে সব জানতে হবে।'

'কি ব্যাপারে?'

'আমার ব্যাপারে। আমার কথা।' অদিতি জয়ন্তর চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'সেটা জানার পর যদি তোমার মন বদলে যায়, তুমি যদি সিদ্ধান্ত পাল্টে ফেলো, ফেলতে পার। আমি তোমাকে দোষী করব না।'

'তুমি আমাকে চিন্তায় ফেলে দিলে। কি এমন কথা যা জানাতে এত সঙ্কোচ বোধ করছ!' জয়ন্ত বলল।

'আমি কৃষ্ণনগরে থাকতাম।' নিঃশ্বাস ফেলল অদিতি।

'জানি। সেখান থেকে সেলসগার্লের চাকরি নিয়ে কলকাতায় এসে একটা মেয়েদের মেসে উঠেছিলে। এইসময়ে একজন ফিল্ম ডিরেক্টার তোমাকে নির্বাচিত করেছেন।'

'এগুলো পরের গল্প। এর আগে আর একটা গল্প আছে।'

'ও, এই কথা!'

'এই কথা মানে? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে একটা কুমারী মেয়ে বলে ভাবো?'

'কি করে ভাবব? কমলেন্দুবাবুর সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত ডিভোর্সও। ডিভোর্সিকে কেউ কুমারী বলে না। অবশ্য—।'

'তুমি, তুমি আমার সম্পর্কে এসব জানো?' চিৎকার করল অদিতি।

দু'হাতে তাকে জড়িয়ে ধরল জয়ন্ত, 'জানি।'

'কি করে জানলে তুমি?'

'আশ্চর্য! এ তো খুব সামান্য ব্যাপার। ওই পার্টিতে তোমাকে প্রথম দেখে আমার মনে হয়েছিল তুমি আমার ভবিষ্যৎ। যে প্রোডিউসার ভদ্রলোকের আমন্ত্রণে ওই পার্টিতে গিয়েছিলাম তার কাছে তোমার সম্পর্কে জানতে চাই। তিনি যতটুকু

জানেন বলেছিলেন। বাকিটা জানতে খুব বেশি কষ্ট করতে হয়নি।'

'আমি ডিভোর্সি জানার পরে তুমি পিছিয়ে গিয়েছিলে?'

'না তো!'

'না। তুমি তারপরে দীর্ঘকাল যোগাযোগ করোনি।'

'করিনি কারণ আমি ভেবেছিলাম আগ্রহী হলে তুমিই যোগাযোগ করবে। আমাদের সোসাইটিতে অনেক সুন্দরী মেয়ে আমার সঙ্গে এইভাবে যোগাযোগ করেছে। কিন্তু তুমি কোন আগ্রহ দেখালে না। ততদিনে আমি মন স্থির করে ফেলেছি। তোমার অতীত নিয়ে আমি আদৌ চিন্তিত নই। তাই তোমার কাছে এলাম খোলা মন নিয়ে। এসে বুঝলাম ভুল করিনি। কি, করেছি?'

জয়ন্তর বুকে মুখ রাখল অদিতি। নীরবে মাথা নেড়ে জানিয়ে দিল জয়ন্ত ভুল করেনি। তার বুক থেকে যেন পাহাড় নেমে গেল।

দিনটা রবিবার। শ্যুটিং নেই। সুলেখা গাড়ি নিয়ে বেরিয়েছে মার্কেটিঙে। সঙ্গে নিয়ে গিয়েছে কাজের মেয়েটিকে। অদিতি একটা নতুন ছবির স্ক্রিপ্ট পড়ছিল। এইসময় কাজের ছেলেটি এসে বলল, 'এক বাবু দেখা করতে চাইছে, খুব জরুরি।'

আলিপুরের এই বাড়িতে ফ্যানেদের উৎপাত হয়নি এখনও। কি খেয়াল হল অদিতি বলল, 'দরজা খুলে বসতে বল, আসছি।'

কয়েক মিনিট বাদে বসার ঘরের দরজায় পা দিতেই চমকে উঠল অদিতি। কমলেন্দু। তাকে দেখে উঠে দাঁড়িয়েছে।

'কি ব্যাপার?' প্রচণ্ড রেগে গিয়েছিল অদিতি।

দুটো হাত জোড় করল কমলেন্দু, 'প্লীজ, খারাপ ব্যবহার করো না। আমি এখন চেঞ্জড ম্যান। তোমাকে বিরক্ত করতে আসিনি।'

'তাহলে?'

'না এসে পারলাম না। যাই ঝামেলা হোক, আফটার অল তুমি আমার এক্স ওয়াইফ। এখন তোমার কত নাম হয়েছে। সারা দেশের লোক তোমাকে এক ডাকে চেনে। যারা জানত তুমি আমার ওয়াইফ ছিলে এককালে তারা বলে, তোর গর্বিত হওয়া উচিত। আমি সত্যি গর্বিত। তোমার কাছে আমি এখন নস্যি।'

'এসব কথা শোনার কোন প্রয়োজন নেই। প্লীজ, গেট আউট্।'

'যাব, নিশ্চয়ই যাব। তোমার বুকে আমার জন্যে একফোঁটা জায়গা নেই তা আমি জানি। কিন্তু আজ আমি তোমার কৃপাপ্রার্থী।'

'বুঝলাম না।'

'আমার মা, তোমার এক্স-শাশুড়ি, খুব অসুস্থ। ক্যানসার হয়েছে। ডাক্তাররা বলছে, ভেলোরে নিয়ে গেলে বাঁচার একটা সম্ভাবনা আছে। কিন্তু ভেলোরে নিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। অথচ মানুষটাকে চোখের সামনে মরতে দেখতে

পারছি না। আজ মা নিজেই বলল, খোকা, তুই একবার বউমার কাছে যা। তাই চলে এলাম।' কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'মাইরি, বিশ্বাস করো, আমার একটুও ইচ্ছে ছিল না আসার।' স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল অদিতি। সেই ভদ্রমহিলা, যিনি একদা তার শাশুড়ি ছিলেন, তার মুখ মনে পড়ল। যতই শত্রুতা করুক আজ তাঁর এই দশা হবে ভাবতে পারেনি সে।

'কত টাকা চাঁদা দিতে হবে?'

'চাঁদা?' হকচকিয়ে গেল কমলেন্দু।

'এরকম কেস হলে অনেকেই চাঁদা চাইতে আসে।'

'এ তুমি কি বললে অদিতি? আফটার অল তোমার এক্স-শাশুড়ি, আমার গর্ভধারিণী। যাকগে! আমি কিছু মনে করিনি। বেশি নয়। আমি খোঁজ-খবর নিয়েছি। ভেলোরে নিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে লাখ দুয়েক দরকার।' গম্ভীর মুখে বলল কমলেন্দু।

'অর্থাৎ আমাকে লাখ দুয়েক দিতে হবে?'

'তার নিচে দিলে বাঁচানো যাবে না।'

'আমি কেন দেব?'

'ভালবেসে দেবে। গুরুজন বলে কথা।'

'যদি এক পয়সাও না দিই?'

'দেবে না? তাহলে আর কি করব! চলে যাব। নিজের মাকে চোখের সামনে একটু একটু করে মরতে দেখব।'

'তাই দ্যাখো।'

'অদিতি!'

'তুমি যে সত্যি কথা বলছ তার কোন প্রমাণ আমার কাছে নেই। মাকে অসুস্থ বানিয়ে ফুর্তি করার জন্যে টাকা চাওয়া তোমার পক্ষে স্বাভাবিক। যে স্ত্রীর ছবি বিক্রি করতে পারে, সে সব পারে। অনেক হয়েছে। এবার বিদায় হও।'

'তাহলে তুমি দিচ্ছ না?' মুখ শক্ত হল কমলেন্দুর।

'না। গেট আউট, গেট আউট ফ্রম হিয়ার।' চিৎকার করে উঠল অদিতি।



[ছত্রিশ]

দুটো হাত মাথার ওপর তুলে অদিতিকে থামাতে চাইল কমলেন্দু, 'তুমি বড় উত্তেজিত হচ্ছ। একটু শান্ত হয়ে শোন। মায়ের অসুখ যদি মিথ্যে হয় তাহলে তুমি আমাকে যে শাস্তি দেবে তাই মেনে নেব।'

'আমি তোমার কোন কথা শুনতে চাই না।'

'কেউ যদি না শুনতে চায় তাহলে তো জোর করে শোনানো যায় না। ঠিক আছে বাবা, আমি যাচ্ছি। কিন্তু একদম খালি হাতে যাব?'

'তার মানে?'

'মায়ের জন্যে ফল কিনতে হবে, ওষুধও।'

'তোমার কি লজ্জা বলে কিছু নেই?

কমলেন্দু হাসলে, 'নাগো। ওই যে বলে না, মান লজ্জা ভয় তিন থাকতে নয়। ওই তিনটেই জলাঞ্জলি দিয়েছি।'

এই সময় বেল বাজল। কমলেন্দু বলল, 'না না, তোমাকে কষ্ট করতে হবে না। আফটার অল সিনেমার হিরোইন। আমিই খুলছি।'

জয়ন্তকে এই সময় আশা করেনি অদিতি। দরজা খুলতেই জয়ন্ত ঘরে ঢুকে কমলেন্দুকে দেখল। কমলেন্দু অনেকটা নিচু হয়ে নমস্কার করে বলল, 'আরে! আপনি। এই অসময়ে?'

'তার মানে?' জয়ন্ত বিরক্ত।

'আপনি স্যার সন্ধ্যাবেলায় এখানে আসার সময় পান বলে আমি জানতাম। তাই কাজের কথা সারতে সকাল বেলায় এসেছিলাম।'

জয়ন্ত অদিতির দিকে তাকাল, 'ইনি?'

অদিতি কিছু বলার আগেই কমলেন্দু বলল, 'আমি স্যার খুব সামান্য মানুষ। অদিতিকে অনেক দিন থেকে চিনি। এক সময় আমাদের বিয়ে হয়েছিল তো। অবশ্য তখনকার অদিতির সঙ্গে এখনকার অদিতির কোন মিল নেই।'

'আ-চ-ছা! আপনি ওর—!'

'এক্স-হাজব্যান্ড।' হাসল কমলেন্দু।

'আমি অনেকক্ষণ বলেছি এ বাড়ি থেকে চলে যেতে।' অদিতি শক্ত গলায় বলতেই জয়ন্ত অবাক হয়ে তাকাল।

কমলেন্দু বলল, 'দেখন স্যার, বিপদে পড়ে মানুষ যদি শত্রুর কাছেও যায় তাহলে শত্রু ফিরিয়ে দেয় না। আর ও হল আমার এক্স-ওয়াইফ। অথচ আমাকে বেরিয়ে যেতে বলছে।'

জয়ন্ত হাসল অদিতির দিকে তাকিয়ে, 'কি ব্যাপার?'

'এই লোকটি একটি মিথ্যেবাদী, ভণ্ড। আমি যখন ছবিতে প্রথম আসি তখন আমাকে ব্ল্যাকমেইল করে রোজগার করতে চেয়েছিল। পারেনি। এতদিন পরে এখানে এসেছে মায়ের চিকিৎসার জন্যে দু-লক্ষ টাকা চাইতে।'

'দু লক্ষ?' জয়ন্ত জিজ্ঞেসা করল।

'হাঁ স্যার। আমার মায়ের ক্যানসার হয়েছে, ভেলোরে নিয়ে যেতে হবে।' দু-হাত কচলালো কমলেন্দু।

'আপনার মায়ের ক্যানসার হয়েছে, খুই দুঃখজনক, কিন্তু ও কেন দেবে?'

'মানবিক কারণে।' কমলেন্দু জবাব দিল।

'তোমার কোন কথা শুনতে চাই না আমি।' অদিতি বলল।

'এখন তো বলবেই। দু-হাতে টাকা কামাচ্ছ, বড় গাছে নৌকো বেঁধেছ।'

'যদি এসব করেই থাকি তো তোমার কি? তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক আমার নেই। এরপরে এখানে এলে আমি পুলিশ ডাকব।'

'পুলিশ?'

'হ্যাঁ। তুমি আমাকে আর কখনও বিরক্ত করবে না বলে পুলিশকে কথা দিয়েছিলে, নিশ্চয়ই ভুলে যাওনি।'

'কেউ কখনও ভোলে? স্যার, আপনি একটু দেখুন।'

'সরি। আপনি চলে যান।'

'তা তো বটেই। আমি চলে যাব আর আপনি থাকবেন।'

'তার মানে?'

'স্যার। পুরুষ মানুষ হল মেয়েছেলেদের কাছে ছাতার মত। একটা গেলে আর একটা দরকার। আমি নেই, আপনি আছেন।' কমলেন্দু হাসল।

খপ্ করে কমলেন্দুর জামার কলার ধরল জয়ন্ত, 'আর একটা কথা বলেছ কি তোমাকে শেষ করে দেব স্কাউন্ড্রেল।'

নিজেকে ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে কমলেন্দু বলল, 'ছি ছি ছি, একি করছেন স্যার। কত বড় মানুষের ছেলে আপনি। মন্ত্রীর বদনাম হয়ে যাবে খবরটা কাগজে বের হলে। ছাড়ুন।'

জয়ন্ত ছেড়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'আমাকে তুমি চেনো?'

'বিলক্ষণ। রোজ সন্ধ্যে বেলায় এখানে আসেন আনন্দ করতে। ওই দুই বুড়োবুড়িকে পুরনো ফ্ল্যাটে ফেলে রেখে অদিতি আপনার ঠিক করে দেওয়া ফ্ল্যাটে এসেছে আনন্দিত হতে। চিনব না?'

'তুমি কি চাও?'

'ওই তো, দু' লক্ষ টাকা। আপনার হাতের নস্যি। আপনার পকেটে টাকা গুঁজে দেওয়ার জন্যে ব্যবসায়ীরা হত্যে দিয়ে পড়ে আছে। দিন স্যার।'

'আপনি নিশ্চয়ই এ খবর জানেন ইচ্ছে করলে আমি আপনাকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে পারি?'

'নিশ্চয়ই জানি।'

'এবং সেটা করলে কোন পুলিশ কারণ খুঁজতে চাইবে না।'

'ক্ষমতা যার হাতে সে সব পারে স্যার।'

'তাহলে নিজের ভাল চাইলে এখানে আর আসবেন না।'

'আসব না।' কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'টাকাটা দেবেন না স্যার?'

জয়ন্ত রাগত ভঙ্গীতে কমলেন্দুর দিকে এগিয়ে যেতে সে ছিটকে দরজার কাছে চলে গেল, 'ঠিক আছে, যাচ্ছি যাচ্ছি। তবে কি জানেন স্যার, এখন আমার অবস্থা হয়েছে ঠিক নদীর মত।'

'মানে?'

'নদীর মুখে বাঁধ দিলে ঠিক পাশ দিয়ে রাস্তা করে নেয়। ও দিল না, আপনিও হাত উপুড় করবেন না কিন্তু আমার তো দরকার। তবে আপনাদের কথা আর কাউকে বললে যদি পাওয়া যায় কিছু—।' কথা শেষ না করেই প্রায় দৌড়ে পালিয়ে গেল কমলেন্দু।

'অদ্ভুত লোক।' দরজা বন্ধ করল জয়ন্ত। করে দেখল অদিতি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে। সে কাছে গেল, 'তুমি কাঁদছ কোন?'

'আমার জন্যে তোমাকে অপমানিত হতে হল।'

'তোমার জন্যে মানে? রাস্তার একটা পাগল কুকুর যদি ঘরে ঢুকে কামড়াতে চায় তো তুমি কি করতে পার?'

'কিন্তু ও তো আমার সূত্রেই এসেছিল।'

'মনে হয় আর আসবে না।' দু'হাতে জড়িয়ে ধরল জয়ন্ত।

হঠাৎ কাঁপুনি এল অদিতির। ভেজা গলায় বলল, 'তুমি আমাকে কখনও ছেড়ে যাবে না তো?'

'কি করে এসব ভাবছ?'

'আমার খুব ভয় করছে।'

'পাগল।'

'ওকে আমি বিশ্বাস করি না। ও তোমার দুর্নাম রটাতে পারে।'

'দুর্নাম মানে? আমি তোমাকে ভালবাসি এটা দুর্নাম যদি হয় তাহলে আমি খুশী হব।'

'কিন্তু তোমার বাবা?'

'বাবাকে যা বলার তা আমি বলব। তাছাড়া আমার বাবার কাছে পৌঁছাতে ওর এক জীবন লেগে যাবে।'

'ওর মত নির্লজ্জ মানুষের পক্ষে সব সম্ভব।'

'দ্যাখো, আমি ছেলেমানুষ নই, তোমাকে ভালবাসি এই সত্যিটা যদি কেউ মেনে নিতে না পারে তাহলে তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে। আচ্ছা লোকটা এখন কোথায় থাকে?'

‘বোধ হয় কৃষ্ণনগরে।’

‘এরকম মানুষের বেঁচে থাকার কোন অধিকার নেই। কিন্তু আমি যদি সেরকম কিছু করাই তাহলে নিজের কাছে ছোট হয়ে যাব।’

‘না। তোমাকে কিছু করতে হবে না। তুমি আমার কাছে আমার হয়ে থাকো।’

এই সময় সুলেখা ফিরল। সুলেখা সচরাচর জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলে না। সমীহ করে মাথা ঝুঁকিয়ে আড়ালে চলে যায়। আজও যাচ্ছিল কিন্তু টেলিফোনটা বাজল।

সুলেখা ফোন ধরল। বোঝা যাচ্ছে ওপাশ থেকে হিন্দীতে কথা বলছে। কিছুটা শোনার পর সুলেখা রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে জিজ্ঞাসা করল, ‘দিদি, বম্বে থেকে ফোন এসেছে, কথা বলতে চাইছে।’

‘কে?’

‘একজন বিখ্যাত ফিল্ম প্রোডিউসার। ওর পরের হিন্দী ছবিতে তোমাকে নায়িকার ভূমিকায় নিতে চায়। কবে কলকাতায় এসে কথা বলবে জানতে চাইছে। কি বলব?’ সুলেখা জিজ্ঞাসা করল।

‘হিন্দী ছবি? আমি তো হিন্দী জানি না। তাছাড়া বোম্বে গিয়ে আমি থাকতে পারব না। বলে দে।’ অদিতি বলল।

সুলেখা রিসিভার রেখে চলে যাওয়ার পর জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল, ‘যদিও তোমার ব্যাপার, তবু, হিন্দী ছবিতে কাজ করলে তুমি অল ইন্ডিয়া এক্সপোজার পেতে। টাকা এবং নাম দুটোই বাড়ত। তাই না?’

‘হত।’

‘তাহলে ফিরিয়ে দিলে কেন?’

‘আমি কলকাতা ছাড়তে পারব না।’

‘কেন?’

‘কলকাতা ছেড়ে গেলে আমি রোজ তোমার দেখা পাব না, তাই।’

‘অদিতি।’ মুগ্ধ চোখে তাকাল জয়ন্ত, ‘তুমি, তুমি—।’

‘না, কোন কথা বলবে না।’

‘বলব।’ জয়ন্ত একটু এগিয়ে এল, ‘অদিতি, তুমি আমাকে বিয়ে করবে?’



[সাঁইত্রিশ]

আচমকা পৃথিবীর সব অন্ধকার মহাশূন্যে হারিয়ে গেল। যা কিছু দ্বিধাদ্বন্দ্ব সব উধাও, সকালটা সকালের চেয়ে সুন্দর হয়ে উঠল।

কাল রাত্রে যাওয়ার সময় জয়ন্ত জানিয়ে গিয়েছিল, ব্যাপারটাকে ঝুলিয়ে রেখে আর লাভ নেই। সম্পর্ক যখন তৈরি হয়েছে তখন তাকে স্বীকৃতি দেবে সে। আর এর জন্যে মায়ের সঙ্গে কথা বলবে আজই।

জয়ন্তর বাবা রাজ্যের মন্ত্রী। তাঁর খ্যাতি বিরাট, প্রতাপ প্রতিপত্তি নিয়ে কোন সন্দেহ নেই। দীর্ঘকাল মন্ত্রিত্বে আছেন তিনি। কাগজে যেহেতু নিয়মিত ছবি ছাপা হয় তাই তাঁর মুখের সঙ্গে অদিতি পরিচিত। জয়ন্তর প্রস্তাব শোনামাত্র তার কেমন যেন ভয় ভয় করতে লাগল। ওরকম রাশভারি মানুষ যদি একমাত্র ছেলের বিয়ে তার মত বিয়ে ভেঙে আসা অভিনেত্রীর সঙ্গে দিতে রাজি না হন?

জয়ন্ত বলেছে ওর বাবা রাজি না হলে সে আলাদা পথ বেছে নেবে। অদিতিকে নিয়ে আলাদা জীবন যাপন করবে। আর এর জন্যে তার কোন আক্ষেপ কখনও হবে না। কিন্তু জয়ন্ত তাকে আশ্বাস দিয়েছে, ওর মায়ের কথা বাবা কখনও ফেলতে পারবেন না।

জয়ন্তর মা সমাজসেবিকা, অনেকগুলো মহিলা প্রতিষ্ঠানের সভানেত্রী। বিশেষ করে নির্যাতিতা মেয়েদের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যে তাঁর উদ্যোগ বিশেষভাবে প্রশংসিত। কিছুদিন আগে সারা বাংলা নারী সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে বিশাল সংবর্ধনা দেওয়া হয়েছে। কাগজে ছবি ছাপা হয়েছিল। একেবারে সন্ধ্যারানীর মত চেহারা, দেখলেই মনে হয় কোমল স্বভাবের মা। তিনি নিশ্চয়ই ছেলের ইচ্ছেকে মেনে নেবেন। জয়ন্ত বলছে, 'আমার মায়ের মত প্রগতিবাদী মহিলা আমি খুব কম দেখেছি। তুমি একটুও চিন্তা করবে না।'

সকালে এক ঝাঁক আলো পড়েছিল ব্যালকনিতে। চায়ের কাপ হাতে নিয়ে এসব ভাবছিল অদিতি। এবার তাকে সিনেমা জগৎ ছাড়তে হবে। সংসার এবং অভিনয় একসঙ্গে কখনই করবে না সে। তাছাড়া একটা শান্তির জীবন পেলে কেন আর অভিনয়ের মায়ায় নিজেকে বেঁধে রাখবে? সকাল বেলায় উঠেই স্টুডিওতে ছোটা, সারাদিন সেখানে কাজে ডুবে থাকা, এসব এই জীবনে মানায়। কিন্তু সংসারের দায়িত্ব নিলে তাতেই মন দেওয়া উচিত।

সুলেখা এল, 'তৈরি হবে না?'

'হ্যাঁ, হতেই হবে। আচ্ছা সুলেখা, এখন পর্যন্ত আমি সাইন করেছি অথচ শ্যুটিং শেষ হয়নি এমন ছবির সংখ্যা কত?'

'বারো। তার মধ্যে চারটে ছবির শ্যুটিং সামনের মাসে শুরু হবে। চারটে ছবির

শ্যুটিং শেষ কিন্তু ডাবিং বাকি। আর বাকি চারটে মাঝপথে।' সুলেখা বলল।

'হুঁ। তুই আর কোন নতুন ছবি এখন নিবি না। সেইসঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দিবি আগামী ছয় মাসের মধ্যে আমি সব ছবির কাজ শেষ করে দিতে চাই।'

'সেকি?'

'হ্যাঁ। যদি চারটে নতুন ছবির প্রযোজক ছয় মাসের মধ্যে ছবি শেষ করতে না পারে তাহলে স্বচ্ছন্দে ওরা অন্য অভিনেত্রী নিতে পারে।'

সুলেখা হতভম্ব, 'তুমি কি ভেবেচিন্তে বলছ দিদি?'

'তোর কি মনে হয় আমি অসংলগ্ন কথা বলি?'

'না, কিন্তু—!'

'কোন কিন্তু নয়।' তারপরেই খেয়াল হল অদিতির, সে অভিনয় ছেড়ে দিলে সুলেখা কি করবে? সুলেখা নিশ্চয়ই নিজের ভবিষ্যতের কথা ভেবে খুব ঘাবড়ে যাচ্ছে। জয়ন্তকে বলে সুলেখার একটা চাকরির ব্যবস্থা সে নিশ্চয়ই করে দিতে পারে। অদিতি হাসল, 'তুই ভয় পাস না, তোর একটা ভাল ব্যবস্থা হবে।'

'তুমি কি অভিনয়-জগৎ থেকে সরে যাবে দিদি?'

'এখনই কথাটা কাউকে বলার দরকার নেই।'

'কিন্তু কেন?'

অদিতি হাসল, কিন্তু কোন কথা না বলে চেয়ার ছেড়ে বাথরুমের দিকে পা বাড়াল। এখনই সুলেখাকে সব কথা বলার কি দরকার। স্টুডিওতে ও খুব আড্ডা মারে যখন সে শ্যুটিং করে। সামন্ত এলে তো কথাই নেই। কখন মুখ ফসকে বলে ফেলবে আর চাউর হয়ে যাবে খবরটা। সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিকরা ঝাঁপিয়ে পড়বে তার ওপর। এ ব্যাপারে কাউকে কিছু বলার সময় এলে জয়ন্ত বলবে। সেটাই স্বাভাবিক। ওর মত বিরাট মনের মানুষ তাকে সম্মান দিতে যাচ্ছে, সে কিছুতেই ওর অসম্মান করতে পারে না।

আজ তিনটে বড় দৃশ্য তোলার পরিকল্পনা ছিল পরিচালকের। তার মধ্যে একটি প্রায় বেডসিন। সই করার আগে যখন চিত্রনাট্য পড়েছিল তখন অদিতির মনে হয়েছিল গল্পের স্বার্থে এর প্রয়োজন আছে।

আজ দৃশ্যটি তোলার আগে তার খুব অস্বস্তি হল। দৃশ্যটি হল, নায়ক অসুস্থ, একা থাকে। তাকে দেখতে এসে সেবা করছে নায়িকা। এবং ওই অবস্থায় নায়ক নায়িকাকে জড়িয়ে ধরে। নায়িকা অসুস্থতার অজুহাতে বাধা দিতে চায়। কিন্তু নায়ক শোনে না। শেষ মুহূর্তে নায়িকার ভাল লাগে ব্যাপারটা। এই দৃশ্যটির প্রয়োজন এই কারণেই যে পরবর্তীকালে নায়িকা গর্ভবতী হবে এবং নায়ক ভুল বুঝে তাকে ছেড়ে চলে যাবে। সন্তানের জন্ম দিয়ে নায়িকা যে সব নাটকীয় সমস্যার সামনে পড়বে তার জন্যে এই দৃশ্যের প্রয়োজন।

কিন্তু আজ অদিতির মনে সংশয় এল। পরিচালককে গ্রীনরুমে ডেকে পাঠাল

সে। একটু ইতস্তত করে বলল, 'আমি জানি, এসময় আপনাকে সমস্যায় ফেলা ঠিক নয়। কিন্তু কোনভাবেই কি বেডসিন এড়ানো যায় না?'

'মানে?' পরিচালক হতভম্ব।

'ধরুন আপনার মেয়ে অভিনেত্রী। তার বিয়ে ঠিক হয়েছে। বিয়ের আগে এই রকম বেডসিনে অভিনয় করতে সে যদি আপত্তি করত তাহলে কি করতেন?'

'বুঝতে পারছি? কিন্তু ম্যাডাম, চিত্রনাট্য আপনাকে দেখানো হয়েছিল ছবি শুরু করার আগেই। আপনি জানেন পুরো গল্পটা এই দৃশ্যটির ওপর দাঁড়িয়ে আছে। এখন আপত্তি করলে—!'

'আপত্তি করিনি। যদি কোন উপায় থাকে তাহলে আমার অস্বস্তি হত না।'

'ঠিক আছে। যতটা কম এক্সপোজ করে দৃশ্যটি তোলা যায় আমি তার চেষ্টা করব। আপনার ইমেজ নষ্ট হবে না।'

'ধন্যবাদ।'

বেরিয়ে যেতে যেতে পরিচালক ঘুরে দাঁড়াল, 'আমি কি এখনই আপনাকে আগাম অভিনন্দন জানাতে পারি?'

'কি কারণে?' অদিতি বুঝতে পারল না।

'আপনার শুভ খবরের জন্যে।'

হঠাৎ মুখে রক্ত জমল। তাড়াতাড়ি বলে উঠল সে, 'না না। সেরকম কিছু নয়। ঠিক আছে আপনি রেডি হলে আমি সেটে যাব।'

ছবির নায়ক কমলেশ। এখন বেশ নাম করেছে। অদিতির সঙ্গে গোটা পাঁচেক ছবি হয়ে গেছে তার। সেটে ঢোকামাত্র এগিয়ে এসে 'বাউ' করে বলল, 'আমার অপরাধ?'

'মানে?'

'আপনি নাকি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছেন না?'

'কি ব্যাপারে?'

'আমার সঙ্গে বেডসিন করার ব্যাপারে—?' হাসল কমলেশ।

'শুনে অপমানিত বোধ করছেন নিশ্চয়ই। ডিরেক্টারকে বলুন না এই অপমানের জন্যে দৃশ্যটায় অভিনয় করবেন না আপনি।'

'পাগল। সঙ্গে সঙ্গে আমি ছাঁটাই হয়ে যাব।' হাসল কমলেশ, 'আপনি যা পারেন আমি তা পারি না। কিন্তু সমস্যাটা কি?'

'কিছু না।'

'শুনলাম নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন?'

'শোনা কথা।' এগিয়ে গেল অদিতি।

যতটা সম্ভব সম্ভ্রম বাঁচিয়ে শয্যাদৃশ্যে অভিনয় করল ওরা। কমলেশ ছেলেটা ভাল। কোন কোন মুহূর্তে স্বচ্ছন্দে সুযোগ নিতে পারত, নেয়নি। পরিচালক প্রচুর সময় নিয়ে এমন কৌশলে ছবি তুললেন যে, দর্শকরা বুঝতেই পারবেন না যে ওরা

আদৌ অত ঘনিষ্ঠ হয়নি।

মেকআপ রুমে এসে মেকআপ তুলতে তুলতে আজ রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল। এটা তার নিয়মের বাইরে। কিন্তু দৃশ্যটি অসমাপ্ত থেকে যেত যদি সে ছটায় শ্যুটিং বন্ধ করে দিত। মেকআপ তোলার পর সুলেখা খামটা এগিয়ে দিল।

'কে দিয়েছে?'

'একটা লোক পৌঁছে দিয়ে গেল।'

'খোল্ না।'

'জয়ন্তদা পাঠিয়েছেন।' সুলেখা জানাল।

দ্রুত খাম খুলল। সাদা কাগজের মাঝখানে কয়েকটা অক্ষর, সুখবর। মাকে জানিয়েছি। ব্যবসার কাজে হঠাৎ দুর্গাপুর যাচ্ছি। কাল দেখা হবে।

কি রকম একটা আরাম হল। সুখবরটার জন্যে যতটা তার চেয়ে অনেক বেশি আজ জয়ন্তর মুখোমুখি হতে হচ্ছে না বলে। ওই দৃশ্যে অভিনয় করার পর জয়ন্তর সামনে দাঁড়াতে তার খুব অস্বস্তি হত। যতই বলা হয়, অভিনয় নকল, জীবন নয়, তবুও।

সুলেখার মুখ খুব গম্ভীর। বাড়ি ফিরে স্নান সারার পর অদিতি তাকে জিজ্ঞাসা করল,

'তোর কি হয়েছে?'

'কিছু না তো?'

'মিথ্যে কথা বলছিস কেন?'

'তুমি অভিনয় করা ছেড়ে দেবে?'

'হ্যাঁ।' অদিতি হাসল, 'সংসার আর অভিনয় একসঙ্গে হয় না।'

'আমি কি করব তখন?'

'তোর চাকরির ব্যবস্থা করব, বলেছি তো?'

'তার চেয়ে' সুলেখা বলল, 'তুমি যদি আর একটা ছবি কর আর ওকে পরিচালনার ভার দাও তাহলে অনেক বেশি উপকার হবে।'

'ওকে মানে? সামন্তকে? সামন্ত নিজে পরিচালনা করবে?'

'ওর খুব ইচ্ছে।'

'কিন্তু আমার হাতে তো সময় নেই। ঠিক আছে, একটু ভেবে দেখি, কিন্তু সামন্ত কি কোন প্রোডিউসার জোগাড় করতে পেরেছে?'

'হ্যাঁ। তোমার প্রথম ছবি যিনি প্রোডিউস করেছিলেন তিনি রাজি হয়েছেন।' সুলেখা বলা মাত্র ফোন বাজল। সে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলে কথা বলে উত্তেজিত হয়ে ঘুরে দাঁড়াল, 'তোমার ফোন। জয়ন্তদার মা।'

[আটত্রিশ]

হতভম্ব হয়ে গেল অদিতি। জয়ন্তর মা তাকে ফোন করছেন কেন? হঠাৎ খুব ভয়-ভয় করতে লাগল। তারপরেই মনে হল জয়ন্তর চিঠির কথা। সুখবর। মাকে জানিয়েছি। অর্থাৎ জয়ন্তই মাকে টেলিফোন নাম্বার দিয়েছে। সে এগিয়ে গিয়ে রিসিভার তুলল। খুব নিচু গলায় বলল, 'হ্যালো!'

'তুমি অদিতি?' একটি পরিষ্কার গলায় প্রশ্ন ভেসে এল।

'হ্যাঁ।'

'খোকা তোমার কথা আমাকে বলেছে।' মহিলা স্বাভাবিকভাবে বলছেন। কি বলবে অদিতি? অত বড় নামী মন্ত্রীর স্ত্রী, নিজেও যিনি অনেক মহিলা সংস্থার সভাপতি, তাঁকে কি বলতে পারে সে!

'তোমার বাড়িতে অভিভাবক হিসেবে কে কে আছেন?'

'আমার বাবা, মা—।'

'ওঁরা তোমার কাছে থাকেন?'

'না। কিন্তু কলকাতাতেই—।'

'তুমি একা থাকো?'

'হ্যাঁ। সঙ্গে আমার সেক্রেটারি, মানে যে মেয়েটি সাহায্য করে সে থাকে।'

'তার মানে তুমি একাই থাকো।'

'হ্যাঁ।'

'খোকা আসানসোলে গিয়েছে। নিশ্চয়ই জানো?'

'জানি।'

'তোমার সঙ্গে কিছু কথা বলা দরকার। কিন্তু আমি খুব ব্যস্ত। তাই আমার ভাইকে তোমার কাছে পাঠিয়েছি। তার সঙ্গে কথা বলো। রাখছি।' লাইন কেটে গেলেও রিসিভার নামাতে পারল না অদিতি। ভদ্রমহিলার ব্যক্তিত্ব তাকে স্তম্ভিত করে ফেলেছে। যেভাবে কথা বললেন তাতে বুঝতে অসুবিধে হল না, ইনি অত্যন্ত রাশভারি। কিন্তু কি কথা বলতে চাইছেন উনি? আর তার জন্যে আজ রাত্রে নিজে আসতে না পেরে ভাইকে পাঠিয়েছেন? অদিতি রিসিভার রাখল। তার মনে হল ভদ্রমহিলা তো কোন খারাপ ব্যবহার তার সঙ্গে করেননি। কোন কোন মানুষের কথা বলার ধরনই এইরকম হয়। যাকে তিনি পুত্রবধূ হিসেবে গ্রহণ করবেন তার সঙ্গে কথা বলবেন না? অদিতি দ্রুত সুলেখাকে ডাকল। সুলেখা ততক্ষণে রাতের পোশাক পরে ফেলেছিল। অদিতি বলল, 'ওটা এক্ষুনি ছাড়। জয়ন্তর মামা আসছেন। শাড়ি পর। উনি এলে ভালভাবে বসতে বলবি। আমি আসছি।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যতটা সম্ভব সহজ স্বাভাবিক সাজ সাজা যায় তাই সাজল অদিতি। নিজের দিকে তাকিয়ে মনে হল বাংলাদেশের লাজুক নম্র মেয়েকে এই রকমই দেখতে হওয়া উচিত। এই সময় বেল বাজল। ঢক্ করে উঠল অদিতির বুক। সুলেখার গলা কানে আসছে। তারপরেই সুলেখা এল ঘরে, 'ওঁরা এসেছেন।'

'ওঁরা মানে?' ফিসফিসিয়ে জিজ্ঞাসা করল অদিতি।

'দুজন এসেছেন।'

'তুই কফি মিষ্টি রেডি কর। বললেই সার্ভ করবি।'

সুলেখা মাথা নেড়ে চলে গেল।

দুজন মানুষ বসেছিলেন। একজনের বয়স হয়েছে, অন্যজন মধ্যবয়সী। অদিতি ঢোকা মাত্র যেভাবে তাকাল তাতে দ্বিতীয়জনকে পছন্দ হল না তার।

মধ্যবয়সী বললেন, 'আমাদের আসার কথা কেউ ফোনে বলেছে?'

মাথা নেড়ে নীরবে হ্যাঁ বলল অদিতি।

'আমি জয়ন্তর মামা।'

অদিতি নিচু হয়ে প্রণাম করতে যাচ্ছিল ভদ্রলোক প্রবলভাবে বাধা দিলেন, 'এসব করার কোন দরকার নেই। বেশি সময় নষ্ট না করে আসল কথায় আসি। আমার জামাইবাবু খুব রাগী মানুষ। তার কানে এখনও খবরটা পৌঁছায়নি। দিদি খুব ব্যস্ত বলে আসতে পারল না। ব্যাপারটা হচ্ছে, আপনার একবার বিয়ে হয়েছিল এবং সেই বিয়ে ভেঙে গেছে বলে দিদির কোন আপত্তি নেই। নির্যাতিতা মেয়েদের পাশে দিদি সবসময় আছেন। কিন্তু একমাত্র পুত্রবধূ যদি অভিনেত্রী হন তাহলে সেটা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।'

'আমি স্থির করেছি অভিনয় আর করব না।' স্পষ্ট বলল অদিতি।

ভদ্রলোক হাসলেন, 'একি স্নান করে গা মুছে ফেলার মত ব্যাপার? যা হওয়ার তা হয়ে গেছে। আপনি আপনার মত ভাল থাকুন। জয়ন্তকে বিয়ে করার ইচ্ছে মন থেকে সরিয়ে ফেলুন।'

অদিতি তাকাল, 'আপনি এই কথা বলতে এসেছেন?'

'হ্যাঁ। আমি খুব ভদ্রভাবে কথাটা বললাম।'

'দেখুন, বিয়ের প্রস্তাব জয়ন্তবাবু আমাকে দিয়েছেন। আপনারা তাঁর সঙ্গে কি কথা বলেছেন?' সরাসরি প্রশ্ন করল অদিতি।

'না। মহিলা, সুন্দরী মহিলা দেখলেই জয়ন্তর মত ছেলেরা হুট্ করে তাদের প্রেমে পড়ে যায়। সেই সুযোগ নিয়ে কোন মহিলা যদি তাকে এক্সপ্লয়েট করতে চায় তাহলে আমাদের বাধা না দিয়ে উপায় থাকে না।'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন!'

'আমি কিছুই করিনি। তা ছাড়া আমি দিদির প্রতিনিধি মাত্র।'

'আপনারা এসব কথা বলতে আসবেন তা জয়ন্ত জানেন?'

'আমি জানি না। সে এখন কলকাতায় নেই, দিদির সঙ্গে তার কি কথা হয়েছে তা আমার জানার কথা নয়। আমি শুধু বলতে এসেছি, জয়ন্তর সঙ্গে যদি সম্পর্ক না রাখেন তাহলে আপনারই উপকার হবে।'

'কি রকম?'

'আপনি একা থাকেন, সিনেমায় অভিনয় করেন। চারপাশ থেকে বিপদ যদি আপনার উপর এসে পড়ে আপনি সামলাতে পারবেন না।'

'আপনি এবার আমাকে ভয় দেখাচ্ছেন। শুনুন, আমি জয়ন্তকে ভালবাসি আর যতক্ষণ জয়ন্ত ভালবাসাকে স্বীকৃতি দেবে ততক্ষণ আমি আমার জায়গা থেকে এক চুলও সরে যাব না। আপনারা এখন আসতে পারেন।'

ভদ্রলোক হাসলেন। তারপর সঙ্গীর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এভাবেই মানুষ নিজের মরণ ডেকে আনে। বুঝলে।'

এবার ছেলেটি মুখ খুলল, 'আপনি এতটা ধুর আমি ভাবিনি। এসব খবর মেসোমশায়ের কানে গেলে আপনি কলকাতা থেকে হাপিস হয়ে যাবেন, বুঝলেন। জয়ন্ত আপনাকে বাঁচাতে পারবে না।'

অদিতি চেঁচিয়ে ডাকল, 'সুলেখা। এদিকে আয়। এদের চলে যেতে বল্ আর দরজাটা বন্ধ করে দে।'

কথাগুলো বলে সে দ্রুত পায়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

দু'ঘণ্টা ঠায় বসেছিল অদিতি। লোক দুটোকে বিদায় করার পর সুলেখা বার চারেক দেখে গেছে তাকে, ডাকেনি। শেষ পর্যন্ত ডাক এল। সুলেখা সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

অদিতি বলল, 'ড্রাইভারকে বল্ গাড়ি বের করতে।'

'এত রাত্রে?'

'যত রাত হোক আমাকে যেতে হবে।' অদিতি কেটে কেটে বলল, 'আমি দুর্গাপুর যাব। জয়ন্তর সঙ্গে আজ রাত্রেই আমি দেখা করতে চাই।'

'এত রাত্রে দুর্গাপুরে যাবে। সে তো অনেক দূরে।'

'মুখের উপর কথা বলিস না সুলেখা।'

'তুমি একটু ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো। জয়ন্তদা নিশ্চয়ই আগামীকাল ফিরে আসবেন। একটা রাত তো। তাছাড়া জয়ন্তদা দুর্গাপুরে কোথায় আছেন তা কি তুমি জানো? ভোর রাতে পৌঁছে কোথায় খুঁজবে?'

'এর আগে যখন গিয়েছিল তখন ডি পি এল-এর গেস্ট হাউসে উঠেছিল। সেখানে গেলেই জানা যাবে।'

'কিন্তু আগামীকাল সকাল দশটায় তোমার শ্যুটিং আছে।'

'আমি দশটার মধ্যেই ফিরে আসব।'

অগত্যা গাড়ি বের হল। সুলেখার উপায় ছিল না, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সে সঙ্গে

গেল। ট্যাঙ্ক ভর্তি করে তেল নিয়ে গাড়ি ছুটল রাতের অন্ধকারে। পেছনের সিটে বসে জানলায় মাথা রেখে চুপচাপ পড়েছিল অদিতি।

আজ রাত্রে বাড়ি ফিরে খাওয়া হয়নি। পরিস্থিতি সহজ করার জন্যে সেই প্রসঙ্গ তুলল সুলেখা। অদিতি মাথা নাড়ল, 'তোর খিদে পেলে কোন একটা ধাবার সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে বল। আমার খিদে নেই।' অতএব খাওয়ার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। সুলেখা ঘড়ি দেখল। এখন রাত দশটা চল্লিশ। ড্রাইভার বলেছে দুর্গাপুরে পৌঁছাতে সাড়ে চার ঘণ্টা লাগবে। অর্থাৎ রাত আড়াইটা থেকে তিনটা। চলন্ত গাড়ির জানলা থেকে অন্ধকার দেখল সুলেখা। ওপাশ থেকে হাইওয়ে বেয়ে ছুটন্ত ট্রাকগুলোকে দৈত্যের মত দেখাচ্ছে। অদিতির দিকে আড়চোখে তাকাল। গাড়ির অন্ধকারে আবছায়ায় অদিতিকে পাথরের মূর্তি বলে মনে হচ্ছে। ভালবাসলে মানুষ এমন জেদী হয়?

রাত আড়াইটে দুর্গাপুরে নিষুতি রাত। রাস্তায় মানুষ নেই, দোকানপাট বন্ধ। এমন কি পেট্রোলপাম্পগুলোও অন্ধকার। ড্রাইভার জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাব মেমসাব?'

'থানায় চল।'

কিন্তু থানা খুঁজে বের করার আগে একটি টহলদারী পুলিশের জিপ ওদের পথ আটকালো। জয়ন্তর নাম শুনে সসম্মানে তারা গাড়িটাকে এসকর্ট করে নিয়ে গেল ডিপিএল-এর গেস্ট হাউসে। গেস্ট হাউস অন্ধকার। চৌকিদারকে ঘুম থেকে তুলল পুলিশ। সে জানাল, 'জয়ন্তসাব এখানে উঠেছিলেন। কিন্তু রাত নটার সময় তার এক বন্ধু এসে নিয়ে গেছেন। কোথায় গেছেন বলে যাননি। ওর জিনিসপত্রও সঙ্গে নিয়ে গেছেন।'

অদিতি বলল, 'ফিরে চল।'

কলকাতায় ফিরতে সকাল সাড়ে আটটা। দশটায় স্যুটিং। অদিতি সোজা বাথরুমে ঢুকে যাচ্ছিল এইসময় ফোন বাজল। সুলেখাকে কোন সুযোগ না দিয়ে দৌড়ে গেল সে রিসিভার তুলতে।

'ম্যাডাম!'

'বলছি।'

'আমি সুদীপ, প্রোডাকশন ম্যানেজার। হঠাৎ একটা কারণে বাধ্য হয়ে ছবির শ্যুটিং বন্ধ রাখতে হচ্ছে। আপনাকে আজ স্টুডিওতে আসতে হবে না। ডিরেক্টর তাই জানিয়ে দিতে বললেন।'

'কি হয়েছে?' শ্যুটিং-এ আজ যেতে হবে না বলে আরাম হচ্ছিল।

'আমি ঠিক জানি না।' লাইনটা কেটে দিল ছেলেটা।

[ঊনচল্লিশ]

সেই বিকেলের মধ্যে অদিতি খবর পেল আগামী দশ দিন তার কোন কাজ নেই। যেসব ছবি অর্ধেকের বেশি শেষ হয়ে গেছে তারা আপাতত শ্যুটিং স্থগিত রাখছে। যারা শুরু করতে যাচ্ছিল তারা একদম চুপচাপ। এক সঙ্গে সব ছবির পরিচালক একই রকম সমস্যায় পড়বে এটা বিশ্বাসযোগ্য নয়।

সন্ধ্যের মুখে সত্যপ্রকাশ বাবু এলেন। প্রবীণ পরিচালক। ওর ছবি প্রায় শেষ। হিসেব মত আর একদিন অদিতি স্যুটিং করলেই তার অংশ শেষ হয়ে যায়।

তাঁকে দেখে অদিতি বিরক্ত গলায় জিজ্ঞাসা করল, 'কি ব্যাপার বলুন তো?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন, 'আমি জানি না। কিন্তু আর একদিন শ্যুটিং না করলে আমার ছবি কমপ্লিট হবে না। আমি মারা পড়ে যাব।'

'আমি তখন আপনাকে ডেট দিতে পারছিলাম না, এখন আমি যে কোন দিন শ্যুটিং করতে রাজী আছি।'

'তুমি তো রাজী আছ কিন্তু আমার প্রযোজক খুব ভয় পেয়ে গেছেন। তাঁকে বলা হয়েছে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ যেন তোমাকে নিয়ে শ্যুটিং করা না হয়। তাহলে ছবির রিলিজ বন্ধ করে দেওয়া হবে।'

'কে বলেছে?'

'সেইটে জানি না।'

'আশ্চর্য! কেউ উড়ো ফোনে শাসালো আর আপনারা ভয় পেয়ে গেলেন? আমার কোন শত্রু তো এই কাজ করতে পারে।'

'শত্রু তো বটেই। তবে শক্তিশালী শত্রু। শ্যুটিং-এ যারা লাইট সাপ্লাই করে, ক্যামেরা ভাড়া দেয় তাদের পর্যন্ত শাসানো হয়েছে যেন তোমার শ্যুটিং-এ তারা কিছু না দেয়। এ তুমি কি করলে অদিতি। এখন তুমি বাংলা ছবির এক নম্বর নায়িকা। নিজের ক্যারিয়ার আরও উজ্জ্বল করার এই তো সময়। এখন কারও সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করে নিজের ক্ষতি করার বোকামিটা করলে?'

'আমি জেনেশুনে কারও সঙ্গে শত্রুতা তৈরি করিনি।'

ভদ্রলোক নিচু গলায় বললেন, 'কানঘুষায় শুনছি তুমি নাকি খুব প্রতাপশালী রাজনৈতিক নেতাকে চটিয়েছ।'

'আমার সঙ্গে তো রাজনীতির কোন সম্পর্ক নেই।'

'তা জানি। কিন্তু মাননীয় এক মন্ত্রীর ছেলের সঙ্গে তোমার বন্ধুত্ব আছে এ কথা তো ইন্ডাস্ট্রিতে সবাই জানে।'

'তো?' চমকে তাকাল অদিতি।

'দ্যাখো ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের জন্যে নিজের ক্যারিয়ার নষ্ট করা কি উচিত?

তাছাড়া এই কারণে এতগুলো ছবির কাজ আটকে গেল। কত টাকা ব্লক হয়ে গেল। টেকনিশিয়ানরা মাইনে পাবে না, প্রযোজকদের ক্ষতি হবে।'

'কিন্তু আপনারা ভয় পাচ্ছেন কেন? যারা শাসাচ্ছে তারা কি ক্ষতি করতে পারে? স্টুডিওতে ঢুকে জোর করে শ্যুটিং বন্ধ করতে নিশ্চয়ই পারে না! ছবি যখন হল্এ দেখানো হবে তখন পাবলিককে জোর করে আটকাতে নিশ্চয়ই পারে না। বলুন, পারে?'

মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ পরিচালক, 'অন্যায়ের শক্তি আর আইনের চাবি যার হাতে আছে সে কি করতে পারে তা তুমি ধারণা করতে পারবে না। যাক গে, তুমি যা ভাল মনে করবে তাই করো। কিন্তু আমাকে বাঁচাও। এই বয়সে যদি ছবি রিলিজ না করে তাহলে কোথায় দাঁড়াবো বল। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, মাত্র দু'ঘণ্টা যদি শ্যুটিং করো তাহলে কোন মতে ছবিটা শেষ করে ফেলতে পারি।

'এই যে বললেন—।'

'হ্যাঁ। কলকাতায় শ্যুটিং করা যাবে না। তুমি সকালের প্লেনে ভুবনেশ্বর চলে যাবে। আমাদের কেউ তোমাকে এয়ারপোর্ট থেকে সেখানকার স্টুডিওতে নিয়ে যাবে। দু'ঘণ্টার শ্যুটিং। আবার দুপুরের ফ্লাইট ধরে কলকাতায় ফিরে আসবে। আর এই খবরটা কাউকে জানাবে না। তোমার সহ-অভিনেতাও খবরটা গোপন রাখবে।'

'যাদের ভয় পাচ্ছেন তারা তো জানতে চাইবে?'

'না। তাদের জানিয়ে দেওয়া হয়েছে তোমার অংশের শ্যুটিং আগেই শেষ হয়ে গিয়েছে। এতে ওদের আপত্তি নেই, শুধু নতুন শ্যুটিং করতে দেবে না।' অদিতি চোখ বন্ধ করল। 'বেশ। এতে যদি আপনাদের উপকার হয় আমি রাজী।'

কথা শেষ হওয়া মাত্র বেল বাজল। অদিতি নিজেই দরজা খুলতেই দেখতে পেল জয়ন্ত দাঁড়িয়ে আছে। নিজের সমস্ত আবেগ চেপে অদিতি বলল, 'এস।'

বৃদ্ধ পরিচালক উঠে দাঁড়িয়েছিলেন। জয়ন্তকে দেখে বললেন, 'আচ্ছা, আমি চলি। পরে ফোনে কথা বলব।'

ভদ্রলোক চলে গেলে জয়ন্ত হেসে বলল, 'কি ব্যাপার? বৃদ্ধকে দেখে মনে হল উনি ভূত দেখছেন!'

'স্বাভাবিক।'

'সেকি? আমি ভূত?' জয়ন্ত হাসল।

'তুমি কখন ফিরলে?'

'একটু আগে।'

'গেস্ট হাউস থেকে রাত নটায় বন্ধুর সঙ্গে বেরিয়েছিলে, কোথায় যাচ্ছ খবরটা দিয়ে যাওনি কেন?'

চমকে উঠল জয়ন্ত, 'আরে! তুমি জানলে কি করে?'

'তোমার সঙ্গে দেখা করতে কাল রাত্রে দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম।'

'মাই গড! হঠাৎ?'

'তুমি কিছু জানো না?'

'না। সোফায় বসে পড়ল জয়ন্ত, 'কি হয়েছে?'

'তুমি স্টুডিওতে চিঠি পাঠিয়ে জানিয়েছিলে, সুখবর। কি সেটা?'

'আমি মাকে তোমার কথা বলেছি। জানিয়েছি তোমাকে ভালবাসি। মা শুনে বলেছেন, আমি সুখী হই এটাই তিনি সবসময় চান।'

'অর্থাৎ তোমার প্রস্তাব তিনি মেনে নিয়েছেন।'

'অবশ্যই। আমি ঠিক করেছি তোমার সঙ্গে মায়ের আলাপ করিয়ে দেব। ওঁকে তোমার ভাল লাগবে অদিতি।'

'তার দরকার নেই। আলাপ হয়ে গেছে।'

'আলাপ হয়ে গেছে? কখন? কি করে?' হতভম্ব জয়ন্ত।

'কাল সন্ধ্যের পরে উনি আমাকে ফোন করেছিলেন। খুব ব্যস্ত বলে কথা বলতে পারছেন না তাই ভাইকে পাঠিয়েছেন। তোমার মামা এল একটা মাস্তান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। ওরা আমাকে শাসালেন। তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে বললেন। ছেলেটি ভয় দেখালো যদি তা না করি তাহলে তোমার বাবা আমাকে কলকাতা থেকে হাপিস করে দেবেন।' কথাগুলো বলে জয়ন্তর দিকে তাকাল অদিতি।

'তারপর?' জয়ন্তর চোয়াল শক্ত।

'আমার মানসিক অবস্থা এমন পর্যায় চলে গিয়েছিল যে মনে হচ্ছিল তোমার সঙ্গে কথা না বলে থাকতে পারব না। স্রেফ আন্দাজ করে কাল রাত্রে দুর্গাপুরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে আরও চমৎকার খবর পেলাম।'

'কি খবর?'

'আমার সমস্ত শ্যুটিং ক্যানসেল হয়ে গেছে। আমার প্রযোজকদের শাসানো হয়েছে যদি আমাকে নিয়ে শ্যুটিং করা হয় তাহলে সেই ছবি রিলিজ করতে দেওয়া হবে না।' ঠোঁট কামড়ালো অদিতি।

'কে শাসিয়েছে?'

'আমি জানি না।'

'তুমি কি সন্দেহ করছ আমার মা এইসব কাণ্ড করেছেন?'

'তুমি কি ছেলেমানুষ, জয়ন্ত?'

'অসম্ভব। আমি বিশ্বাস করি না। আমার মাকে আমি চিনি। ওঁর মত প্রগতিশীল মহিলা এমন ভয়ঙ্কর কাজ করতে পারে না। মামার সঙ্গে যে এসেছিল তার নাম কি?' জয়ন্ত উত্তেজিত।

'নাম বলেনি।'

'কি রকম দেখতে?'

অদিতি যতটা সম্ভব কাছাকাছি বর্ণনা দিল। জয়ন্ত বলল, 'বুঝতে পারছি। কিন্তু

মামা তোমাকে শাসিয়েছে?'

'হ্যাঁ। তোমার মায়ের হয়ে উনি যা বলার বলেছেন।'

'ঠিক আছে, আমি আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলছি। আমি আবার বলছি, মা এমন কাজ করতে পারেন বলে আমি বিশ্বাস করি না। হ্যাঁ, বাবা করতে পারে। নিজের সম্মানের জন্যে বাবা সব কিছু করতে পারে।'

'কিন্তু জয়ন্ত, তুমি আমাকে শুধু একটা কথা বল!'

জয়ন্ত তাকাল।

'তুমি সত্যি আমাকে ভালবাস?'

'ইয়েস। আই লাভ ইউ। তার জন্যে আমি যে কোন কথা দিতে রাজী।'

একটা বড় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল অদিতি, 'আর আমার কোন কষ্ট নেই। নাই বা করলাম অভিনয়। যা রোজগার করেছি তাতে হয়তো এই ফ্ল্যাটে থাকা যাবে না, কিন্তু বেঁচে থাকতে পারব।'

'কি যা-তা বলছ তুমি?'

'আমি স্থির করেছিলাম তোমাকে বিয়ে করার পর আর অভিনয় করব না। সুলেখাকে বলে দিয়েছিলাম নতুন ছবি আর না নিতে। যেগুলো করছি তাদের তাগাদা দিচ্ছিলাম তাড়াতাড়ি শেষ করে দিতে। আমি শুধু তোমার স্ত্রী হিসেবে থাকতে চাই।'

'তাই হবে। আমরা এক সপ্তাহের মধ্যে রেজিস্ট্রি করব অদিতি।'

এগিয়ে এসে অদিতিকে জড়িয়ে ধরল জয়ন্ত। অনেকটা আদর করল। তারপর বলল, 'তুমি তোমার প্রযোজকদের সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দাও। আমি তাদের বলব ছবির শ্যুটিং আবার শুরু করতে।'

'বলবে?' খুশি হল অদিতি।

'হ্যাঁ।'

জয়ন্তর বুকে মাথা রেখে অদিতির সব কষ্ট এক মুহূর্তে উধাও হয়ে গেল। হঠাৎ সে আদুরে গলায় বলল, 'আমার একটা কথা রাখবে?'

'বল।'

'আজ রাত্রে এখানে থাকো না।' আবদার ঝরে পড়ল অদিতির গলায়।

'না। প্লীজ। আজ থাকতে বলো না। আজ আমাকে মায়ের সঙ্গে কথা বলতেই হবে। আমি এই যুদ্ধটা থামিয়ে দিতে চাই।' জয়ন্ত অদিতির কপালে চুমু খেল।



[চল্লিশ]

সকালবেলায় সেই ছেলেটি এল যে জয়ন্তর মামার সঙ্গে এসেছিল। সুলেখা তাকে প্রথমে ঢুকতে দিচ্ছিল না, কিন্তু অদিতি বেরিয়ে এল, 'কি চান?'

ঘরে ঢুকে আরাম করে সোফায় বসে ছেলেটি বলল, 'আমাকে নিশ্চয়ই চেনা যাচ্ছে! মেসোমশাই আমাকে বিশ্বাস করেন। তাই এই শহরের পুলিশ কমিশনারও আমার সঙ্গে সমীহ করে কথা বলে। যাকগে, আমি জানতে এসেছি আপনাকে যেসব রিকোয়েস্ট করা হয়েছে তা মানছেন কিনা?'

'না।' দৃঢ়গলায় বলল অদিতি।

'কি ন্যাকামি করছেন। এটা না মানা মানে আকাশে ওড়া প্লেন থেকে লাফ মারা, বুঝতে পারছেন?'

'হয়তো তাই।'

'ব্যাস্, এটাই আপনার লাস্ট কথা?'

'হ্যাঁ। আর এসব আমাকে না বলে জয়ন্তকে বলছেন না কেন?'

'কাকে কি বলতে হবে সেই জ্ঞান আপনি আমাদের দিচ্ছেন? শুনুন, আপনার নায়িকা থাকার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছি। যে শুড্ডাটা কাল রাত্রে আপনার কাছে শ্যুটিং-এর প্রস্তাব নিয়ে এসেছিল সে এখন বাঙ্গুর হাসপাতালে হাত-পা-মাথা ভেঙে পড়ে আছে। এরপর কোন শালা আর আপনাকে নিয়ে শ্যুটিং করার সাহস দেখাবে না। হারামিটা কলকাতায় না করতে পেরে ভুবনেশ্বরে গিয়ে শ্যুটিং করার প্লান করেছিল। যেন ভুবনেশ্বর ইন্ডিয়ার বাইরে।'

'আপনারা ওকে মেরেছেন?' চিৎকার করে উঠল অদিতি।

'মারব না তো কি দুধ খাওয়াব। তবু তো জানে মারিনি। আর হ্যাঁ, এখনও আপনাকে টাচ করিনি আমরা, সেটা করতে বাধ্য করবেন না।'

'আপনি এখানে থেকে বেরিয়ে যান।'

'আপনি তো আমাকে ঢুকতে বলেননি, ঢুকেছি নিজের ইচ্ছায় যাবও তাই। কটা বাজে? হ্যাঁ, আর কয়েকমিনিটের মধ্যে আপনার একটা ফোন আসবে। সেটা আসা পর্যন্ত আমাকে এখানে থাকতেই হবে।'

'কার ফোন?' অদিতি চোখ ছোট করল।

'নিজের কানেই শুনবেন। দেখুন, আপনি ফালতু ঝামেলা ডেকে আনছেন। আপনার জীবনে পুরুষমানুষ এর আগেও এসেছে। জয়ন্ত তো প্রথম নয়। আর একজন মনের মত কাউকে খুঁজে নিন, জয়ন্তকে কাটিয়ে দিন। ব্যাস। আবার সব কিছু নর্মাল হয়ে যাবে। হিরোইন হয়ে মাল কামাতে পারবেন।' ছেলেটি হাসল আর তখনই টেলিফোন বেজে উঠল।

ছেলেটি বলল, 'ধরুন।'

অদিতি দেখল সুলেখা এগিয়ে আসছে। তাকে ইশারায় নিষেধ করে সে রিসিভার তুলে জবাব দিল। ওপাশে একটু ইতস্তত ভাব, তারপর কমলেন্দুর গলা, 'আমি বলছি। শোন, সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে।'

কমলেন্দুই যে ফোনটা করবে ভাবতেই পারেনি অদিতি। সে কথাই বলতে পারল না। কমলেন্দু বলল, 'শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো?'

'হ্যালো।' কোনমতে বলল অদিতি।

'গতরাত্রে কয়েকজন গুণ্ডা জোর করে আমার কাছ থেকে ছবিগুলো কেড়ে নিয়ে গেছে। আমি দিতে চাইনি বলে খুব মেরেছে আমাকে।'

'ছবিগুলো?'

'হ্যাঁ।'

'ওগুলো নষ্ট করা হয়নি?'

'হ্যাঁ, মানে, তাই হয়েছিল, কিন্তু নিজে দেখব বলে একটা করে প্রিন্ট রেখে দিয়েছিলাম। মাইরি বলছি, ওরা কি করে খবর পেল আমি বুঝতেই পারছি না। তুমি আবার ভেবো না যে আমি টাকার লোভে ছবিগুলো বিক্রি করেছি।'

লাইন কেটে দিল অদিতি। ছেলেটি হাসল, 'ওই ছবিগুলো আমি দেখেছি। একটু রোগা ছিলেন, তবু কী ফিগার! আহা! কিন্তু ওই ছবি মেসোমশাই দেখলে আপনাকে ছেলের বউ করে কি করে নিতে পারেন, বলুন?'

'আপনারা কি চান?'

'সিম্পল্ ব্যাপার। জয়ন্তর সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে দিন।'

অদিতি মাথা নাড়ল, 'আপনাদের মেসোমশাই যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন, কিন্তু আমার পক্ষে এই অনুরোধ রাখা অসম্ভব।'

ছেলেটি উঠে দাঁড়াল, 'আপনি কি অদ্ভুত জিনিস। নিজের ভাল বোঝেন না? প্রথমে আপনার কাজের বারোটা বাজানো হল। এরপর ওই ছবিগুলো বাজারে ছড়িয়ে দেওয়া হবে। তার ওপর আপনার ঠিকানা ফোননাম্বার ছেপে দিলে আর দেখতে হবে না। দিনরাত লোক আসবে আপনার কাছে। পাগল হয়ে যাবেন। আর তাতেও যদি রাজী না হন তাহলে অ্যাকসিডেন্ট একটা হতে কতক্ষণ?'

অদিতি আর কথা বলতে পারল না। ছেলেটি বলল, 'আপনি ভেবে দেখুন, যেসব ছবি আটকে গেল তাদের সব প্রোডিউসারের তো ফেলে রাখার মত টাকা নেই। আপনার কাজের জন্যে তাদের কি দুরবস্থা। আপনার মনে ওদের জন্যে কোন দয়ামায়া ভালবাসা নেই?'

'কি করতে হবে?' ক্লান্ত গলায় বলল অদিতি।

'শুধু জয়ন্ত এলে ঢুকতে দেবেন না, ও ফোন করলে রিসিভ করবেন না।'

কয়েক মুহূর্ত ভাবল অদিতি, তারপর বলল, 'চেষ্টা করব।'

চলে যাওয়ার আগে ছেলেটি বলে গেল, 'ছবিতে আপনার যা বডি দেখেছি

তাকে লাশ বলে যদি দেখতে হয় তাহলে খুব কষ্ট হবে।'

একটা কথাও বলল না অদিতি। প্রতিবাদ করার ক্ষমতা যেন হঠাৎ শরীর থেকে চলে গিয়েছেল। স্বাভাবিক। কমলেন্দু শেষ পর্যন্ত ছবিগুলো বিক্রি করতে পারল। ও ইচ্ছে করেই করেছে। সেদিন এই ফ্ল্যাটে জয়ন্তকে দেখার পর ওর মাথায় মতলবটা এসেছে। একটা পুরুষ একই মেয়ের সর্বনাশ আর কতবার করবে?

সুলেখা পাশে এসে দাঁড়াল, 'দিদি!'

অদিতি তাকাল না। সুলেখা জিজ্ঞাসা করল, 'একটা কথা বলব?'

অদিতি তাকাল। সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে সুলেখা কিরকম কুঁকড়ে গেল। সুলেখা বলল, 'জয়ন্তবাবু তোমার পাশে না দাঁড়ালে ওদের কথা মেনে নেওয়াই ভাল।'

অদিতি কোন কথা বলছে না দেখে সুলেখা সরে গেল।

দুপুরে ফোন এল। জয়ন্ত হেসে বলল, 'তুমি মিছিমিছি ভয় পাচ্ছ। আজ আমার সঙ্গে মায়ের খোলাখুলি কথা হয়ে গিয়েছে। মায়ের আপত্তি নেই কিন্তু তোমার অভিনয় করা নিয়ে অস্বস্তি আছে। আমি বলেছি তুমি নিজেও আর অভিনয় করতে চাও না। যাহোক, মা বাবাকে বোঝাবার জন্যে সাতদিন সময় চেয়েছেন। অবশ্য বলেছেন, এই সাতদিন যেন আমরা কেউ পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ না করি।'

'তুমি কি বললে?'

'ঠিক আছে বাবা। সাতটা দিন তো। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। এটা করলে যদি বাবা-মা খুশী হয় তাহলে করতে আপত্তি কি! অবশ্য আমাকে কাল এমনিতেই দিল্লী যেতে হত। বৈদেশিক বাণিজ্য মন্ত্রীর সঙ্গে মিটিং আছে।'

'তাহলে তোমার দেখা আমি সাতদিনের আগে পাচ্ছি না?'

'তুমি খামোকা এই সাতদিনের ওপর জোর দিচ্ছ কেন?'

'না, ঠিক আছে।'

'ওইভাবে কথা বললে আমি কোথাও যেতে পারব না তা তুমি জানো।'

'তুমি হয়তো জানো না, কমলেন্দু, আমার আগের স্বামী, সেই ছবিগুলো তোমার মায়ের লোকের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে।'

'কোন ছবিগুলো? ওঃ। মনে পড়েছে। কিন্তু সেই ছবিগুলো এত কি খারাপ ছিল যে তুমি ভয় পাচ্ছ? তাছাড়া ওগুলো তোমার বিবাহিত জীবনের ছবি। বিবাহ-বিচ্ছেদের পর নিশ্চই তোলনি?'

'কি বলছ তুমি?'

'ব্যাস! হয়ে গেল। ওসব ছবি নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করো না। আমি তোমাকে যেখানেই থাকি না কেন, ফোন করব। ওহো, তোমার পাসপোর্ট এসে গিয়েছে?' জয়ন্ত জিজ্ঞাসা করল।'

'পাসপোর্ট?'

'বাঃ। মাস ছয়েক আগে তোমাকে দিয়ে একটা ফর্ম ফিলআপ করিয়ে ছিলাম

মনে নেই? বিয়ের পর সুইজারল্যান্ডে যাব হনিমুন করতে।'

'না। আসেনি।'

'দেখেছ! দেশটার কি অবস্থা। আমি এখনই ফোন করছি।' তড়িঘড়ি রেখে দিল জয়ন্ত। মন কিরকম বিষণ্ণ হয়ে গেল অদিতির। সবই ভাল, জয়ন্তর গলায় এখনও উদ্দীপনা, এখনও আশা কিন্তু তবু কিরকম একটা কেটে যাওয়া সুর অদিতির কানে যেন বেজে উঠল।

আশ্চর্য ব্যাপার, সেই বিকেলেই পাসপোর্ট পৌঁছে গেল তার কাছে। দু'মাস আগে যে ফর্মে সই করেছিল সে তা জয়ন্তর একটা ফোনেই পাসপোর্ট হয়ে ফিরে এল? পাতাগুলো এখন ফাঁকা। প্রথমে তার নাম ঠিকানা ও ছবি। ছবিতেও সে সুন্দরী। পাসপোর্ট সাইজ ছবিতেও!

সাত-সাতটা দিন এখন অপেক্ষা করা ছাড়া কোন উপায় নেই। ক্যালেন্ডারে দাগ দিল অদিতি। কিন্তু ভদ্রমহিলা ছেলের কাছে সময় নিচ্ছেন আবার লোক লাগিয়ে তাকে শাসাচ্ছেন। কেন?

সেদিন আর কোন লোক এল না। রাত নটার সময় খেতে দিতে বলল অদিতি। সুলেখা রান্নাঘরে খাবার বাড়তে গেলে বেল বাজল। অদিতি নিজেই এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলতে অবাক হয়ে গেল। একজন সম্ভ্রান্ত চেহারার ভদ্রমহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। তাঁর পেছনে আছে দুজন পুরুষ। ভদ্রমহিলা লম্বা, একদা সুন্দরী ছিলেন বোঝা যায়, মাথার সামনে এক গোছা চুল ইন্দিরা গান্ধীর মত সাদা। ভদ্রমহিলা জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি অদিতি?'

'হ্যাঁ।' কোনমতে বলল সে।

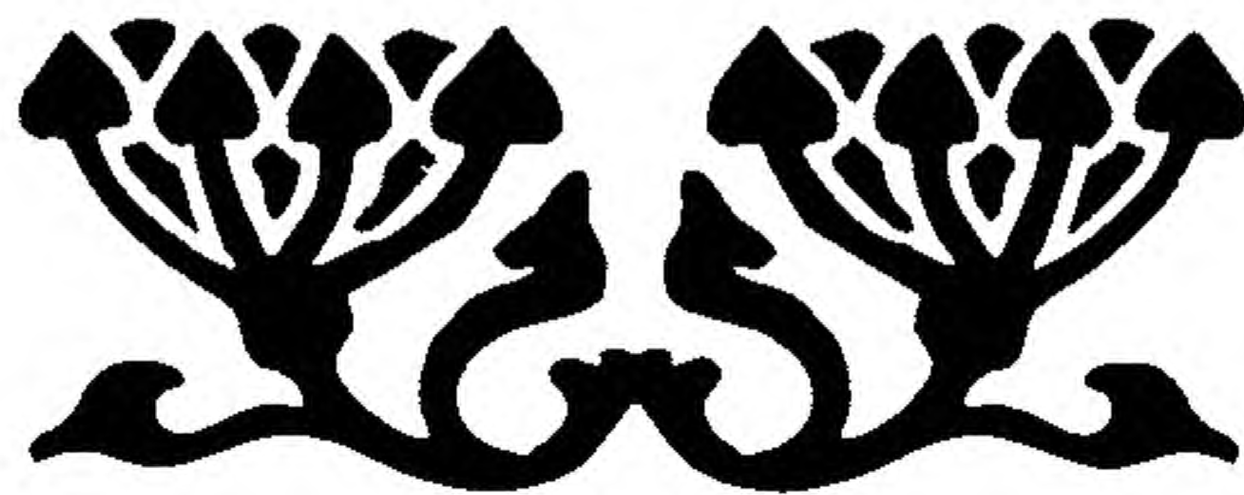
ভদ্রমহিলা তার সঙ্গীদের দিকে তাকাল, 'তোমরা এখানেই অপেক্ষা কর। কেউ আমাদের এখানে আসতে দ্যাখেনি তো?'

একজন জবাব দিল, 'না ম্যাডাম।'

ভদ্রমহিলা ভেতরে ঢুকে দরজা ভেজিয়ে দিল, 'তুমি তো একাই আছ?'

'হ্যাঁ। আপনি—!'

'আমি জয়ন্তর মা।' ভদ্রমহিলা অদিতির পা থেকে মাথা পর্যন্ত দেখলেন, 'তুমি বামন হয়ে চাঁদ ধরতে চাইছ কোন্ সাহসে?'



[একচল্লিশ]

অদিতির মুখ হাঁ হয়ে গেল।

'বোকার মত তাকিয়ে থেকো না। তোমার মত মেয়ের সঙ্গে কথা বলতে এই রাত্রে আমি নিতান্ত বাধ্য না হলে আসতাম না। তুমি আগে বিয়ে করেছিলে, শ্বশুরবাড়িতে থাকতে পারোনি, ডিভোর্স করেছ। এসব নিয়ে আমার মাথা ঘামানোর কোন দরকার নেই। অনেক মেয়েই এরকম করে। নিম্নবিত্ত বাড়ির মেয়ে তুমি। বেশ তো সেলস গার্লের চাকরি করতে, মেসে থাকতে। প্রেম করতে ইচ্ছে হলে সেই স্ট্যান্ডার্ডের একটা ছেলেকে জুটিয়ে নিতে পারতে। কেন করোনি?' ভদ্রমহিলা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন।

'ইচ্ছে হয়নি।'

'তাই নাকি? তুমি তখন জেনে গিয়েছিলে যে নায়িকা হয়ে প্রচুর টাকা রোজগার করবে, আরও বড় গাছে নৌকা বাঁধতে পারবে?'

'সেলসের চাকরি করার সময়ে একথা কি করে জানব?'

'তাহলে তখন আর একটা প্রেম করোনি কেন?'

'বললাম তো ইচ্ছে হয়নি।'

'ন্যাংটো শরীরের ছবি তুলিয়েছ তুমি। এই ব্যবসা কতদিন চালিয়েছ?'

'আপনি আমাকে অপমান করছেন।'

'বেশ করেছি। তুমি করতে পার আর আমি বললেই দোষ। আমার ছেলের বউ-এর ন্যাংটো শরীর দশটা মানুষ চোখ দিয়ে চাটবে, এরপরে আমি তাকে মেনে নেব, একথা কেন মনে হল তোমার?'

'ওগুলো আমার বিয়ের সময় তোলা। তখন যিনি আমার স্বামী ছিলেন তিনি বাধ্য করেছিলেন বলে আমি—! আগে ভাবিনি আজ ওই ছবিগুলো আমায় কাঠাগোড়ায় দাঁড় করাবে।'

'তা তো করাবেই। পুলিশ ওই ছবিগুলো তোলবার জন্যে অশ্লীলতার দায়ে তোমাকে জেলে পুরতে পারে।' ব্যাগ খুলে কয়েকটা ছবির প্রিন্ট টেবিলের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'তোমার যদি ছেলে থাকত তাহলে তুমি পারতে ওইরকম উদোম মেয়েকে ঘরের বউ করে নিয়ে যেতে?'

হঠাৎ শরীর কাঁপিয়ে কান্না এল। সোফায় বসে পড়ল অদিতি কাঁদতে কাঁদতে। ভদ্রমহিলা উল্টোদিকের সোফায় বসলেন। ওঁর গলার স্বর একটু নরম হল, 'আমি বুঝতে পারছি অদিতি, কিন্তু তুমি নিশ্চয়ই বোঝ তেল আর জলে কখনও মিশ খায় না। দুটোর জাত আলাদা।'

অদিতি নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করল।

ভদ্রমহিলা বললেন, 'তুমি জয়ন্তর কথা ভুলে যাও।'

অদিতি প্রবলভাবে মাথা নাড়ল, 'পারব না।'

'পারতে তোমাকে হবেই।'

'অসম্ভব!'

'অসম্ভব শব্দটা শুধু মূর্খদের অভিধানে থাকে। তুমি ওকে ভুলে যাও তাহলেই তোমার জীবন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। আবার তুমি ছবির কাজ শুরু করতে পারবে। কোন সমস্যা থাকবে না।'

'আপনার পায়ে পড়ি একথা বলবেন না।'

'আমার পায়ে পড়ে তোমার কোন লাভ হবে না। জয়ন্ত নরম মনের ছেলে। তোমাকে ভাল লেগেছে বলে ও এই পাগলামি করছে। কিন্তু ওই ছবিগুলো সে এখনও দ্যাখেনি। দেখলে ধাক্কা খাবে। আর, তোমার সব ছবির কাজ বন্ধ, রোজগার নেই। জমানো টাকায় তোমার কদিন চলবে?'

'যদ্দিন চলে।'

'এই ফ্ল্যাটের ভাড়া কি করে দেবে?'

'ফ্ল্যাট?'

'হ্যাঁ, কথায় আছে কলসির জল শেষ হয়। তোমার জমানো টাকা যতই থাক একটা ইনকামট্যাক্স রেড হলে সামলাতে পারবে? তোমার উকিল তো প্রচুর কমিয়ে রোজগার দেখায়। তাই না? আরে সেটাই স্বাভাবিক, সবাই করে। কিন্তু ইনকামট্যাক্স রেড হলে সব ফাঁস হয়ে যাবে। তাছাড়া এই যে ফ্ল্যাটটা দেখছ তার মালিক কে জানো?'

'একটা ট্রাস্টি বোর্ড। তাদের লোক এসে ভাড়া নিয়ে যায়।'

'ঠিক। ওটা আমার স্বামীর, বেনামে আছে এই সম্পত্তি। জয়ন্ত ব্যবস্থা করে দিয়েছে এবং নিয়মিত ভাড়া পাওয়া যাচ্ছে বলে আমার স্বামী এটা নিয়ে মাথা ঘামায়নি। তোমার ব্যাপার জানতে পারলে—।'

'আমি জানতাম না, বিশ্বাস করুন, জয়ন্ত বলেনি।'

'ও ভদ্রতা করে বলেনি।'

'আমি ওকে ছেড়ে থাকতে পারব না।'

বাঃ। কথাটা ভাল বললে তো। তুমি কলকাতায় থাকলে জয়ন্তকে সবসময় আগলে রাখা যাবে না। ঠিকই। ছেলেরা প্রেমে পড়লে বাস্তবজ্ঞান হারিয়ে ফেলে। না হলে তোমাকে নিয়ে সুইজারল্যান্ডে হনিমুন করতে যাওয়ার স্বপ্ন দ্যাখে?' হাসলেন মহিলা।

অবাক হয়ে গেল অদিতি। সে তাকিয়ে আছে দেখে ভদ্রমহিলা বললেন, 'ছেলে আমার কাছে সব কথা বলে। ছেলেবেলা থেকেই ওর এই অভ্যাস। সতেরো বছর বয়সে একটা মেয়েকে চুমু খেয়েছিল, এসে আমাকে বলেছিল। কিন্তু সেই মেয়ের প্রেমে পড়েনি ও। আমাকেও ভাবতে হয়নি।'

'আমি একবার ওর সঙ্গে কথা বলতে চাই।'

'কি লাভ হবে তাতে? ওর বাবার ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে তোমাকে বিয়ে করে আলাদা থাকতে পারবে ও? এই যে এত ব্যবসা করছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের সঙ্গে এত ওঠাবসা, এসবই ওর বাবার জন্যে। তাছাড়া—।' ভদ্রমহিলা ঠোঁট কামড়ালেন, 'অদিতি, এখনও পরিস্থিতি আমার হাতে আছে। তুমি আমার কথা শোন।'

'যদি না শুনি? তাহলে কর্মহীন হয়ে না খেয়ে মরব? তাই হবে। আপনাদের এই ফ্ল্যাট আমি ছেড়ে দেব। অল্প ভাড়ার ফ্ল্যাট নিয়ে থাকব।'

'তা তুমি চেষ্টা করতে পার। কিন্তু আমার স্বামী যদি তোমার কথা জানতে পারেন তাহলে কলকাতার কোন পাড়ার ছেলেরা তোমাকে থাকতে দেবে না। নিজের বংশমর্যাদা সম্পর্কে ও এত সজাগ যে তোমার মত মেয়ের সঙ্গে ওর ছেলের প্রেম হয়েছে এটা ও কিছুতেই বরদাস্ত করবে না। কাগজে বেরুবে অভিনেত্রী নিখোঁজ। তারপর দীঘা অথবা বকখালির সমুদ্রের ধারে তোমার ও অপর একটি লোকের মৃতদেহ পাবে পুলিশ। বুঝতেই পারছ কোন এক নিরাপরাধ মানুষকে বেছে নেওয়া হবে তোমার প্রেমিক সাজানোর জন্যে। কাগজে বের হবে, প্রেমিকসহ অভিনেত্রীর আত্মহত্যা। আমি এই দৃশ্যটি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি। তাই ভয় হয়, কে কোথা থেকে ওর কাছে তোমার খবরটা তুলে দেবে কে জানে!'

অদিতি দু-হাতে মুখ ঢেকে বসেছিল। ভদ্রমহিলা আর দাঁড়ালেন না।

সুলেখা খাবার নিয়ে এসেছিল কিন্তু অদিতি খেলো না। বিছানায় উপুড় হয়ে শুয়ে রইল অনেকক্ষণ। সুলেখা বলল, 'তুমি এখনও বুঝতে পারছ না কেন দিদি? এরা ইচ্ছে করলে যে কোন সর্বনাশ করতে পারে।'

অদিতি কোন কথা বলল না।

সুলেখা বলল, 'জয়ন্তবাবু তোমাকে যেমন ভালবাসে তেমনি নিজের মাকেও ভালবাসে। নইলে সব কথা মাকে বলত না।'

অদিতি তাকাল। তারপর ফোনের কাছে গেল। ঘণ্টাখানেক ধরে সে জয়ন্তর নম্বরগুলো ঘুরিয়ে গেল। কোথাও জয়ন্ত নেই। যে ফোন ধরছে সে বলছে, 'উনি এখানে নেই, কোথায় গিয়েছেন বলে যাননি।'

রাতটা নির্ঘুম কাটল অদিতির।

সকালে দুই ভদ্রলোক এলেন। স্পষ্ট বললেন, 'আমরা ট্রাস্টি বোর্ড থেকে আসছি। আপনাকে এই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে হবে।'

'অসম্ভব।' অদিতি খেপে গেল, 'আমি নিয়মিত ভাড়া দিয়ে আসছি। আপনারা আমাকে নোটিস দিন তারপর ভেবে দেখব।'

'কিন্তু চেয়ারম্যান চান না আপনি এখানে বাহাত্তর ঘণ্টার বেশি থাকুন। তাঁর ইচ্ছের কথা আপনাকে জানাতে এসেছি।'

'চেয়ারম্যান?'

'হ্যাঁ।'

'কিন্তু জয়ন্ত আমাকে এখানে এনেছে। তাকে বলুন আপনারা।'

'জয়ন্তবাবু গতরাত্রে বোম্বে গিয়েছেন। চেয়ারম্যান পাঠিয়েছেন, অতএব তার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ আমরা পাচ্ছি না।'

লোকদুটো চলে যাওয়ার পর সুলেখা শব্দ করে কেঁদে উঠল। অদিতি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'তুই কাঁদছিস কেন? তোর কি হয়েছে?'

'এভাবে চোখের সামনে তোমার সর্বনাশ হওয়া আমি দেখতে পারছি না।' কাঁদতে কাঁদতে বলল সুলেখা।

'দেখতে না পারলে দেখিস না।'

'তুমি কি নিজের ভবিষ্যৎ বুঝতে পারছ না?'

'পারছি। আমি শুধু জয়ন্তর সঙ্গে একবার কথা বলতে চাই।'



জয়ন্তর সঙ্গে কথা বলতে চাইলেই যে বলার সুযোগ পাওয়া যাবে এমন নয়। ইদানিং জয়ন্ত টেলিফোন করতেই ওদের যোগাযোগ হয়, সে এলে সামনাসামনি কথা হয়। তারওপর কোন এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে জয়ন্ত দিল্লী যাবে বলে গিয়েছিল। অদিতির খেয়াল হল, জয়ন্ত যখন কলকাতায় না থাকে তখনই বিপদগুলো একসঙ্গে ফণা তোলে।

এই ফ্ল্যাট যদি ছেড়ে দিতে হয় সে দেবে। তার প্রথম ছবির প্রযোজক যে ফ্ল্যাটে থাকতে দিয়েছিলেন, নিয়মিত ভাড়া পেয়ে যাওয়ায় তিনি আর ওই ফ্ল্যাট ছেড়ে দিতে বলেননি। বাবা-মা সেখানেই আছেন।

সুলেখাকে বাড়িতে রেখে অদিতি পুরোন ফ্ল্যাটে এল। মা দরজা খুলতেই সে প্রায় পাথর হয়ে গেল। সোফায় হেলান দিয়ে কমলেন্দু চা খাচ্ছে। মা ওর মুখের দিকে তাকিয়ে আমতা আমতা করে বলল, 'রাগ করিস না। হাজার হোক সম্পর্কে জামাই। এলে তো চা না দিয়ে পারি না। আর সত্যি বলতে কি, ও এখন অনেক বদলে গেছে।'

'এ্যাই, হক কথা।' কমলেন্দু চায়ের কাপ নামাল, 'এই কথাটা আপনি আপনার মেয়েকে একটু বোঝান। ডিভোর্স হোক আর যাই হোক, আমি হলাম আফটার অল প্রথম স্বামী। আমি কি ওর ক্ষতি করতে পারি?'

'তুমি এখানে কেন এসেছ?' সরাসরি প্রশ্ন করল অদিতি।

'বুড়োবুড়ি একা থাকেন, দেখাশোনার কেউ নেই। তাই—।'

'এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাও। আর কখনও এখানে আসবে না।'

'তুমি বললে চলে যাব। মা, আমাকে ক্ষমা করবেন।'

মা বলল, 'মাথা ঠাণ্ডা কর অদিতি।'

'যথেষ্ট ঠাণ্ডা আমার মাথা। ক' হাজার টাকায় ছবিগুলো বিক্রি করেছ?'

'কোন্ ছবিগুলো?' শাশুড়ির দিকে আড়চোখে তাকাল কমলেন্দু।

'ন্যাকামি করো না।'

সোজা হয়ে বসল কমলেন্দু। তার মুখ এখন সিরিয়াস, 'শোন অদিতি। তুমি হাওয়ায় ভাসছ। জয়ন্তর বাবা মারাত্মক মানুষ। আমার কাছ থেকে টাকা দিয়ে ছবি কেনার প্রয়োজন তার পড়ে না। ছবি না দিলে আমি এতক্ষণে ছাই হয়ে যেতাম। এই ভদ্রলোক তোমাকে যে-কোন মুহূর্তে শেষ করে দেবেন। তুমি কার জোরে ওর সঙ্গে লড়ছ? ওই জয়ন্তর কোন ক্ষমতা আছে? দেখা হয়েছে তার সঙ্গে?'

'সে এখন দিল্লীতে।'

'দিল্লীতে? সেই আনন্দেই আছ! দিল্লী থেকে সে ফিরে এসেছিল কাজ না হওয়ায়। সে এখন তার প্রমোটার বন্ধুর বাড়িতে রয়েছে।'

'কোথায়?' নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে গেল অদিতির।

'ডায়মণ্ডহারবারে।'

'তুমি জানলে কি করে?'

'আমাকে যখন শাসাতে এসেছিল তখন ওর মামা একটা মস্তানকে কথাটা বলছিল। আমাকে ভিখিরী মনে করে পাত্তা দেয়নি।'

'আমি বিশ্বাস করি না।' মাথা নাড়ল অদিতি।

'বিশ্বাস না করলে মরবে।' কমলেন্দু মাথা নাড়ল, 'আর যাই হোক, আমি তোমাকে মরে যেতে দেখতে চাই না।'

ছিটকে বেরিয়ে এল অদিতি। গাড়িতে বসে তার মনে হল পৃথিবীতে সে একা। কোথাও তার যাওয়ার জায়গা নেই। জয়ন্ত যদি এখন দিল্লীতে না থেকে ডায়মণ্ডহারবারে থাকে তাহলে বিশ্বাসের এক ইঞ্চি জমিও পায়ের নিচে থাকছে না। কি করবে সে এখন?

বাড়ি ফিরে এল সে। সুলেখা দরজা খুলল।

'কি হয়েছে দিদি?'

'সুলেখা, চল কোথাও চলে যাই।'

'কোথায় যাবে?'

'কোথাও। যেখানে আমাদের কেউ খুঁজে পাবে না।'

'কিন্তু—।'

'কিন্তু কি?'

'ও তো জানতে চাইবে!'

শক্ত হল অদিতি। ও মানে সামন্ত? তার মানে সুলেখার এখনও কেউ একজন আছে যা তার নেই।



বেল বাজল। অদিতি দরজা খুলে দেখল জয়ন্তর সেই মামা দাঁড়িয়ে যিনি প্রথমদিন কথা বলতে এসেছিলেন।

'বিরক্ত করতে এলাম। দিদিই পাঠাল। বসতে পারি।'

'বসুন।'

'দিদি আপনার ভাল চান। আসলে নির্যাতিতা মেয়েদের উপকার করার ব্রত নিয়েছেন তিনি, নিশ্চয়ই জানেন। আপনার পাসপোর্ট পেয়েছেন?'

'হ্যাঁ। কেন?'

'গুড। এই ফর্মে সই করে দিন। মোটামুটি সব লেখা আছে।'

'কিসের ফর্ম?'

'বাইরে যাওয়ার!'

'বাইরে?'

'কথা বলার মত সময় নেই। পাসপোর্ট সাইজ ছবি আছে?'

সুলেখা শুনছিল দূরে দাঁড়িয়ে। বলল, 'আছে।'

'ঈশ্বর সহায়। দিন, ছবি দিন দুটো আর সই করুন।'

সই করা ফর্ম পাসপোর্ট আর ছবি নিয়ে ভদ্রলোক চলে গেলেন।

জয়ন্তর মায়ের ফোন এল সন্ধ্যেবেলায় 'তোমার উপকার করতে চাই মেয়ে। যা বলছি তা মন দিয়ে শোন। একটা স্যুটকেসে প্রয়োজনীয় জামাকাপড় ভরে ট্যাক্সি নিয়ে চলে এস বাইপাসের স্টেডিয়ামের সামনে। ওখানে তোমার সঙ্গে কথা বলব। তাড়াতাড়ি।'

'কেন?'

'কারণ আজ রাত্রে ওই ফ্ল্যাটে থাকলে তুমি খুন হয়ে যাবে। তোমার কাজের মেয়েটাকেও কোথাও চলে যেতে বল। অবাধ্য হলে ভুল করবে।'

ভদ্রমহিলার গলায় এমন কিছু ছিল যে অদিতি অস্বীকার করতে পারল না।

সুলেখার এক পিসি থাকে দমদমে। তাকে সেখানে কিছুদিনের জন্যে থাকতে বলল সে। বাবা মাকে ফোন করে বলল, 'আমি কয়েকদিনের জন্যে বাইরে যাচ্ছি। চিন্তা করো না।'

সুলেখা জিজ্ঞাসা করল, কোথায় যাচ্ছ?'

অদিতি বলল, 'জানি না।'

স্টেডিয়াম নির্জন। অন্ধকার অন্ধকার। সাদা গাড়ি থেকে নেমে এলেন জয়ন্তর মা। ট্যাক্সি থেকে নামল অদিতি।

'শোন, তোমার মেসোমশাই জেনে গেছেন। তোমাকে বাঁচাতে এ ছাড়া অন্য কোন পথ ছিল না। তুমি কিছুদিন নিউইয়র্ক থেকে ঘুরে এসো।'

'নিউইয়র্ক?'

'হ্যাঁ। এই নাও টিকিট, পাসপোর্ট ভিসা করানো আছে। আর শ'খানেক ডলার রাখো। কেনেডি এয়ারপোর্টে যে তোমাকে রিসিভ করতে আসবে সে আমার আত্মীয়, নাম সাহেব। বেচারার এর আগে দুবার বিয়ে হয়েছিল, টেঁকেনি। ও তোমার দেখাশোনা করবে।'

'আমি কেন যাব?'

'নিজেকে বাঁচাতে। এ ছাড়া কোন পথ নেই। আমি আমার স্বামীকে লুকিয়ে এখানে তোমার সঙ্গে দেখা করছি। কেন করছি জানো? তুমি খুন হয়েছ শুনলে জয়ন্ত সহ্য করতে পারবে না, তাই আর দু'ঘণ্টা পরে তোমার ফ্লাইট। আমার একজন লোক সঙ্গে গিয়ে তোমাকে প্লেনে তুলে দিয়ে আসবে।' ভদ্রমহিলার ইঙ্গিতে সাদা গাড়ি থেকে নেমে একজন ট্যাক্সিতে উঠে বসল।

দু'ঘণ্টা বাদে কলকাতার মাটি ছেড়ে প্লেন আকাশে উড়লে অদিতি আবিষ্কার করল সে কাঁদছে না। তার চোখে জল নেই। চোখে গ্লিসারিন দেওয়ার দরকার নেই। এই বিশ্বের এক নম্বর সিনেমাওয়ালা যে চিত্রনাট্য তার জীবন নিয়ে লিখেছেন তাতে কান্না নেই।

৪০ সমাপ্ত ৫০